ভারতের পণ্য

[illegible]

ভারতের পণ্য

তাহার উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কিউরেটর, কমার্শিয়াল মিউজিয়াম, কলিকাতা কর্পোরেশন

দুই টাকা বারো আনা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ
৬বি, এ্যাসটন রোড
এলগিন রোড পোঃ আঃ
ভবানীপুর

প্রাপ্তিস্থান
সরস্বতী লাইব্রেরী—১।১।১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর—
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

নিবেদন

নানা অসুবিধার মধ্যে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধগুলি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই খণ্ডে 'তন্তু' ও 'আবাদী ফসল' আলোচিত হইয়াছে। এই কয়টী পণ্য ভারতের, এমন কি জগতের বাজারে, অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যতদূর সম্ভব সন্নিবেশিত করিয়াছি। বিশেষভাবে, গত প্রায় এক শত বৎসরের বাণিজ্য—রপ্তানী ও আমদানী, এবং প্রায় প্রতি পণ্যের গত আশী বৎসরের বাজার দর উল্লেখ করিয়াছি। এই শত বৎসরের মধ্যে কোন্ সালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণের মাল রপ্তানী বা আমদানী হইয়াছে, উহার মোট মাপ বা ওজন ও মূল্য; এবং কোন্ সালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের মাল বিক্রীত বা ক্রীত হইয়াছে, ঐ টাকার মোট পরিমাণ ও পণ্যের ওজন বা মাপ দিয়াছি। এই সকল সংখ্যা হইতে বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমানে কি হইয়াছে সমস্তই বুঝিতে পারা যাইবে। তাহা ছাড়া ঐ সকল পণ্যের আধুনিক ব্যবহার এবং তাহা হইতে প্রধান উপোৎপাদ্য বস্তু বা "উপসত্ব" (by-product) গুলি উদ্ধার করিবার প্রণালী, বাণিজ্যের হ্রাসের কারণ এবং তাহার উন্নতি বিধানের ইঙ্গিত সমস্তই সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। উপরন্তু পুস্তকের প্রথম খণ্ডে যাহা যাহা আছে, তাহাও দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্ত্তী খণ্ডে খনিজ (minerals) ও জীবজ বা প্রাণীজ পণ্য (animal produots) সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

পুস্তকখানি সুধী সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। যাঁহারা পুস্তকের প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্থিতধী প্রধান

কর্ম্মসচিব, পরম হিতকামী, পূজনীয় শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। তিনি এবং শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজপ্রতিম শ্রীশরৎচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রণয়ন ও মুদ্রণের জন্য যে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই আমার এ যাত্রার মহামূল্য পাথেয়। স্বনামধন্য প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় পুস্তকের পরিকল্পনা হইতেই সাধারণের অজ্ঞাত নানা তথ্যের সন্ধান দিয়া আমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং বন্ধুবর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল পুস্তকের বহুলাংশের প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সেই কারণে উভয়েই আমার ধন্যবাদার্হ।

ভারতসরকার পরিচালিত Commercial Libraryর কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং একজন সাধারণ কর্ম্মচারী (দপ্তরী) আমাকে পুস্তক পত্রিকাদি ব্যবহারের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছেন; তাঁহাদের সহৃদয়তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

পুস্তকে নূতন তথ্য সন্নিবেশিত করিতে গিয়া ক্রমশঃ ভার বৃদ্ধি করিয়াছি। "স্বখাত সলিলে" ডুবিয়াছি, কূল পাইবার আশা অতি ক্ষীণ। পুস্তকে সার বস্তু যদি কিছু থাকে সুধীজন তাহা গ্রহণ করিয়া সমস্ত ক্রটীর দায়িত্ব আমাকে দিবেন এই অনুরোধ।

নির্ভুল করিবার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তকে সামান্য সামান্য মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গেল, সেজন্য অশেষ ক্রটী স্বীকার করিতেছি।

৬বি, রাজা বসন্ত রায় রোড,
কালীঘাট
১লা বৈশাখ, ১৩৪৭

বিনীত
গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

ভারতের পণ্য

৩

তন্তু বা আঁশ

(Fibres)

জগতের বাজারে ভারতীয় তন্তুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এক বিষয়ে ভারতের তন্তুর সহিত অপরের তুলনা করা চলে না; কারণ দেশবিদেশের বাণিজ্যের জন্য পাটের থ'লে এবং চট অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এবং সেই পাট ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায়ও হয় না। এখনও তুলার বিষয়ে, ভারতের দ্বিতীয় স্থানই আছে, কিন্তু রুশ গণতন্ত্র তাহাকে পিছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। এক সময় ভারতের রেশম এবং রেশমজাত দ্রব্যাদির বিশেষ সমাদর ছিল; কিন্তু আজ আর তাহা নাই। কিন্তু পশম সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না। যদিও গুণে বিশেষ ভাল নহে, তথাপি রপ্তানী বাণিজ্যে তাহার স্থান নিতান্ত নগণ্য নহে। সকল তন্তুরই সবিশেষ আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

•

ভারতের আমদানী রপ্তানী ব্যাপারে তন্তুই সর্ব্বপ্রধান। অর্থাৎ ইহাদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতি বৎসরে একশত কোটী টাকারও উপর। মোটামুটী (১৯৩৮-৩৯) সাল সম্বন্ধে বলা চলে, আমদানী ত্রিশ কোটী টাকা; আমদানী মালের পুনঃ রপ্তানী (re-exports) প্রায় দুই কোটী এবং কেবল রপ্তানী ছিয়াত্তর কোটী টাকা।

সকল রকম মিলিয়া যত বে-সরকারী মাল (private merchandise) এক বৎসরে ভারতে আমদানী হয়, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত (manufactured and raw) তন্তু তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ (২০'৪%); আর রপ্তানীর বেলায় আধা আধি (৪৯'৯%)। বলা বাহুল্য, আমদানীর সময় কার্পাস এবং কার্পাস দ্রব্য তন্তুর হিসাবে মোট টাকার চার ভাগের তিন ভাগ (৭৩%)। পরেই পশম এবং পশমজাত দ্রব্যের স্থান। কৃত্রিম রেশম (rayon), রেশম ইত্যাদি কিছু কিছু আছে।

রপ্তানীর বেলা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের স্থান প্রথম (৫১'০%), পরে তুলা এবং পশম। কিন্তু অন্য বৎসরে তুলা কাঁচা এবং প্রস্তুত দ্রব্যাদি মিলিয়া, প্রথম স্থান অধিকার করে। পরিশিষ্টে (ক) প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অংশ দেখানো হইল।

প্রধানতঃ বস্ত্রাদি, রজ্জু বা দড়ি দড়া এবং মাটিতে পাতিয়া ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্যাদি, কাগজ, বুরুষ এবং অন্যান্য নানা বস্তু তৈয়ার করিবার জন্য তন্তুর প্রয়োজন। বস্ত্রাদি বয়নের উপযুক্ত তন্তু ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। সাধারণতঃ জৈবজগৎ অর্থাৎ উদ্ভিদ, পতঙ্গ ও পশু হইতে প্রাপ্ত তন্তুই প্রধান। রাসায়নিক কর্তৃক বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে তন্তু প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সহিত বর্তমান প্রবন্ধের কোনও সম্পর্ক নাই; প্রকৃত পক্ষে তাহা ভারতের রপ্তানী পণ্যের কোনও অংশই নহে।

বস্ত্রাদির জন্য ভারতের তুলা, পশম ও রেশম প্রধান। পাট, শণ প্রভৃতি হইতে যে সকল বস্ত্রাদি হয়, তাহা সাধারণতঃ পরিধানের জন্য ব্যবহৃত হয় না। রজ্জু বা দড়ি প্রভৃতির জন্য পাট, শণ, শিশল, নারিকেল, তিসি তন্তু এবং আরও বহু প্রকারের তন্তু আছে। পশু-

লোমের মধ্যে মেষ লোম প্রধান হইলেও ছাগ, আলপাকা, শশক, উষ্ট্রলোম প্রভৃতিও কাজে লাগে। যে সকল জীবের লোম বয়নের উপযোগী দীর্ঘ, তাহাই মানুষে কাজে লাগাইয়াছে। ঘোড়ার ঘাড়ের ও লেজের লোম, শূকর, ভল্লুক, গন্ধগোকুল, প্রভৃতি জীব হইতেও প্রাপ্ত লোম বুরুষের জন্য কাজে লাগে। কঠিন বুরুষ করিবার জন্য নানা প্রকার উদ্ভিদ তন্তুর সাহায্য লওয়া হয়।

তন্তুর নানারূপ ব্যবহার যে প্রচলিত আছে, তাহার বহু প্রকার বিপর্য্যয় অনিবার্য্য। ভারতের যে সকল তন্তু গিয়া জগতে ছড়াইয়া পড়িত, সে বাজার ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। আজকাল আর কোনও জাতি পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে প্রস্তুত নহে। যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে কাঁচামাল পাইতে অসুবিধা হয়, দরও বেশী পড়ে বলিয়া সকলেই চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে নিজের প্রয়োজনের সমস্ত দ্রব্যই নিজের দেশে বা অধীন কোনও রাজ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে। ভারতের তুলার আজ সে কারণে ঘোর দুর্দ্দিন আসিয়াছে। এককালে বৎসরে ৯৮ কোটী টাকা মূল্যের যে পণ্য বাহিরে গিয়াছে, (১৯২৩-২৪) তাহা আজ পঁচিশ কোটী টাকারও কম দাঁড়াইয়াছে। সকল দেশকেই অল্প বিস্তর পাট বা পাটজাত বস্তু ভারতবর্ষ হইতে লইতে হয়। এখন ক্রমশঃ বিরাট চেষ্টা চলিতেছে, যাহাতে পাট আর না লাগে।

ভারতীয় তন্তুর বিপদ

এই সকল বস্তুর যাহাতে প্রয়োজন কম হয় তাহার জন্য অপর উদ্ভিজ্জ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত নানা বস্তু নিত্য আবিষ্কার করা হইতেছে। কে জানে, ভারতের পণ্য জগতের হাট হইতে একেবারে বিতাড়িত হইবে না! নীল এখন লোপ পাইয়াছে, রেশমের এখন "সসেমিরা" অবস্থা। সুতরাং ভারতের সকল প্রকার

তন্তুর বাণিজ্যের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এ পর্য্যন্ত কত প্রকার নূতন 'তন্তুর' আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আবশ্যক।

সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান, নকল সিল্ক বা Rayon. এই "রেয়ন" ইংলণ্ডে Rayolanda, জার্ম্মাণীতে Artilana ও Vistralin প্রভৃতি নামে যে ভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে তূলা বা রেশমের প্রয়োজনীয়তা যে অত্যন্ত হ্রাস পাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহা তূলা বা তূলাজাতীয় বস্তু, বৃক্ষ ত্বক বা কাষ্ঠ ও অন্যান্য নানাপ্রকার বস্তু হইতে প্রাপ্ত "সার" বা সেলুলোজ (cellulose) হইতে প্রস্তুত হয়।

এই তন্তু এখন জগৎ ছাইয়া ফেলিতেছে এবং কার্পাসবস্ত্রের বা রেশমীবস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইয়া অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষে বৎসরে পাঁচ কোটী টাকার নকল রেশম তন্তু ও বস্ত্রাদি আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

তৎপরে দুগ্ধজাত বা আমিষজাত তন্তু। ইতালী ইহার পথি-প্রদর্শক। দুধের সার যথারীতি কাজে লাগাইবার পর যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা হইতে বৈজ্ঞানিকগণ পশম প্রস্তুত করিতেছে। ইতালীতে ল্যানিটাল (Lanital), হল্যাণ্ডে Lactofil, ইংলণ্ডে Casein fibre ও জার্ম্মাণীতে Tiolan প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা চলিতেছে। তাহার পর "আমিষ" ও উদ্ভিজ্জসার (সেলুলোস) মিলিত পদার্থ ইটালীতে Cisalpha ও Lacisana এবং ব্রসেল্‌সে Fibramine নামে প্রস্তুত হইতেছে।

যৌগিক আঠা-(synthetic resin)ও তন্তুতে পরিণত হইয়াছে; আমেরিকায় Nylon, Vinyarn বা Vinyon নামে পরিচিত।

কাহারাও বা coal gas-কে তন্তুতে পরিণত করিতে প্রয়াসী; তাহারা সফলকাম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কাচ হইতে যে সকল বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা যে একদিন স্বভাবজাত তন্তুর বিষম শত্রু হইবে তাহাও একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখনও পরিধেয় বা ব্যবহারের বস্ত্র তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই, কিন্তু থিয়েটার ও ঘরের পর্দ্দা, বৈদ্যুতিক শক্তিরোধক বস্ত্র এবং ফিতা, তৈয়ারী হইতেছে। ঘরের দেওয়ালে যেখানে প্রায়ই জল লাগে, সেখানে এবং ঘরে বেশী মাত্রায় আলো প্রতিফলিত হওয়ার প্রয়োজনে, লোকে কাচবস্ত্র ব্যবহার করিতেছে। আমেরিকার ওয়েন্স-ইলিয়নিস্ গ্লাস কোম্পানী আশা করেন, কোনও দিন তাঁহারা পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে কাচবস্ত্র দ্বারা উৎকট অম্ল (acid) ছাঁকিয়া লওয়া হয়। তূলা বা অন্য বস্ত্র এ কাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

কানাডায় পাথর হইতে 'পশম' প্রস্তুত করা হইতেছে। কতকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতিদিন ৫০ টন করিয়া 'পশমের' তন্তু পাওয়া যাইতেছে। ইহা অত্যন্ত নরম, লঘু এবং আঁশযুক্ত, সুতরাং 'বস্ত্র' বয়নে আর কোনও অসুবিধা নাই। ইহা যে কেবল মাত্র বৈদ্যুতিকশক্তি-রোধক তাহা নহে, ইহা শব্দনিবারকও বটে।

বার্লিন সহরে এক কারখানায় সাধারণ খড় হইতে নকল সিল্ক ও যৌগিক-পশম প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করা যায়, প্রতি বৎসর অন্তত ২০,০০০ টন সেলুলোজ পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেক হইতে মোজা জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাকী অংশ হইতে পশম করা যাইবে। বৎসরে অন্তত ৫০ হাজার টন খড় প্রয়োজন হইবে

এবং ইহা সহরের নিকটবর্ত্তী নানা পল্লী হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে।

ধাতু এবং অন্যান্য বস্তু হইতেও 'তন্তু' প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার প্রত্যেকটিই যে সফল হইবে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ইতোমধ্যে আরও যে সকল রেশম জাতীয় পদার্থ আবিষ্কৃত হইবে না, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। সুতরাং ভারতের তন্তু-সম্পদ বর্ত্তমানে খুব বেশী হইলেও ইহার বিপদ যে অতর্কিতে আসিয়া বিহ্বল করিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক কোন্ তন্তুর কিরূপ অবস্থা তাহা পরিশিষ্টে (খ) দেখানো হইল।

পরিশিষ্ট

(ক)

(১৯৩৮-৩৯)

আমদানী

	হাজার টাকা
কাঁচা বা অসংস্কৃত তন্তু—	৯,৮০,৬৮
প্রস্তুত দ্রব্যাদি—	২১,২৩,৫৯
মোট—	৩১,০১,২৭

তন্মধ্যে	হাজার টাকা	%
তুলা—	১২,৬৭,১০	৭৩
পশম—	২,৮১,০০	৯
কৃত্রিম রেশম—	২,২৩,৬৩	৭·৪
রেশম—	১,৯৪,১৪	৬·২
শণ—	১৭,৯৬	·৬
অন্যান্য—	—	—

উপরোক্ত প্রতি তন্তু সম্বন্ধে কাঁচা এবং সংস্কৃত মালের সম্মিলিত পরিমাণ দেওয়া হইল। রপ্তানীর হিসাবে এই নিয়ম পালন করা হইয়াছে।

রপ্তানী—

	হাজার টাকা
কাঁচা বা অসংস্কৃত তন্তু—	৪১,৭৫,৮৪
প্রস্তুত দ্রব্যাদি—	৩৪,৩৯,১১
মোট—	৭৬,১৪,৯৫

তন্মধ্যে	হাজার টাকা	%
পাট—	৩৯,৫৭,১১	৫১·৯
তুলা—	৩১,৭৮,৪৪	৪১·৭
পশম—	৩,৮৪,৯৫	৫·০
অন্যান্য	—	—

(খ)

১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে প্রধান কয়েকটী তন্তুর হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ এবং ১৯৩০-৩১ সালের উৎপন্ন তন্তুর পরিমাণ ১০০ ধরিয়া প্রতি তন্তুর হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাত দেখানো হইল। Imperial Economic Committeeর বিবরণী হইতে গৃহীত অঙ্ক :—

১৯০০	কার্পাস		কৃত্রিম রেশম		পশম		শণ		রেশম		মোট	
	কোটী পাউণ্ড	হিসাব ১৯৩০-৩১ =১০০	কোটী পাউণ্ড	হিসাব ১৯৩০-৩১ =১০০	কোটী পাউণ্ড	হিসাব ১৯৩০-৩১ =১০০	কোটী পাউণ্ড	হিসাব ১৯৩০-৩১ =১০০	কোটী পাউণ্ড	হিসাব ১৯৩০-৩১ =১০০	কোটী পাউণ্ড	হিসাব ১৯৩০-৩১ =১০০
৩০-৩১	১,২৪২	১০০	৪৫˙৯	১০০	১৭৩˙৮	১০০	১৪১˙৬	১০০	১৩˙০	১০০	১,৬১৬˙১	১০০
৩১-৩২	১,৩১৮	১০৬	৫৯˙৮	১১১	১৭৪˙৯	১০১	১৫২˙১	১০৭	১২˙৬	৯৭	১,৭০৮˙৪	১০৬
৩২-৩৩	১,১৪৩˙৪	৯২	৫৪˙০	১১৮	১৭৬˙৬	১০২	১৩৩˙৩	৯৪	১১˙৬	৮৯	১,৫১৮˙৯	৯৪
৩৩-৩৪	১,২৭৪˙২	১০৩	৬৯˙৫	১৫১	১৭১˙১	৯৮	১৫১˙০	১০০	১২˙২	৯৪	১,৬৭৮˙০	১০৪
৩৪-৩৫	১,১৩৪˙৫	৯১	৮৩˙৫	১৮৩	১৬৬˙৭	৯৬	১৫১˙৯	১০৭	১২˙৫	৯৬	১,৫৪৯˙১	৯৬
৩৫-৩৬	১,২৫৮˙৯	১০২	১০৭˙৯	২৩৬	১৬৮˙৫	৯৭	১৬৯˙১	১১৯	১২˙১	৯৩	১,৭১৬˙৫	১০৬
৩৬-৩৭	১,৫১০	১২২	১৩২˙৩	২৮৯	১৭৩˙২	১০০	১৬৯˙৩	১২০	১১˙৯	৯২	১,৯৯৬˙৭	১২৪
৩৭-৩৮	১,৮৯৮˙৬	১৫৩	১৪২˙২	৩০৯	১৭৬˙৮	১০২	১৮০˙৫	১২৭	১২˙০	৯২	২,৪৫০˙১	১৫২
৩৮-৩৯	১,৩৮৪˙৭	১১১	১৯৭˙৪	৪৩২	১৫৬˙০	৯০	১৭৬˙৫	১২৫	১০˙৭	৮২	১,৯২৫˙৩	১১৯

পাট (Jute)

পাট ভারতের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। জগতের অন্য স্থানে হয় না, অথচ ব্যবসা-বণিজ্য ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য বলিয়া পাটের বিশেষ প্রয়োজন আছে। চীন ও জাপানের কোনও কোনও অংশে পাট হইতে দেখা গেলেও, পাট যে ভারতের উদ্ভিদ তাহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, চীন দেশে পাটের পরিচয় অতি পুরাতন। ভারতবর্ষে পাটজাত বস্ত্রের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা যে শণ বা অন্য কোনও প্রকার তন্তুজাত বস্ত্র নহে, তাহা কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। পুরাতন গ্রন্থে পাটের উল্লেখ পাওয়া গেলেও পাটের বর্ত্তমান প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত বাণিজ্যের ফল। রুশ দেশের শণের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য কোনও তন্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতে পাটের উপর ব্যবসায়ীরা মনোযোগ দেন এবং তাহাতে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন ইউরোপে কারখানা শিল্পের উন্নতি ঘটিল এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে কৃষিজাত দ্রব্যাদি বহনের জন্য সুলভ অথচ শক্ত কোনও তন্তুর প্রয়োজন হইল, তখন পাট সেই অভাব দূর করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত দিলেন। চীনদেশে যে পাট পাওয়া যায় তাহা অতি দৃঢ় এবং দেখিতেও সুন্দর। এমন কি তাহাকে শণতন্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাহা পরিমাণে এত কম জন্মে যে, তাহাতে স্থানীয় লোকেরই অভাব মোচন হয় না। সুতরাং সারা পৃথিবীর সকল জাতিকেই ভারতের পাটের উপর নির্ভর করিতে হয়।

পুরাতন কথা

সাধারণতঃ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কয় মাসে বীজ রোপণ করা হয়

চাষ

এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে কাটিয়া লওয়া হয়। ৪।৫ দিন একস্থানে জমা করিয়া রাখিবার পর, গাছগুলি জলে ডুবাইয়া দেয়। ১৫।১৬ দিন বাদে ঐ আঁশ ছাড়াইয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ জলে ধুইয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার উপযোগী করে।

প্রদেশে চাষ

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই পাট অধিক মাত্রায় জন্মিয়া থাকে অর্থাৎ সমস্ত ভারতের শতকরা ৮৫.৩ ভাগ বাঙ্গলা দেশেই জন্মে। বাঙ্গলার পরই বিহারের স্থান; তারপর আসাম। যে দুইটি করদ রাজ্যে পাট জন্মে তাহারা বাঙ্গলার মধ্যে অবস্থিত। জমির শতকরা ৯৮.৪ এবং ফসলের শতকরা ৯৮.৯ ভাগ ব্রিটিশ ভারতের অংশে পড়ে। পরিশিষ্ট (ক)।

নেপালে আন্দাজ ৫৫ হাজার গাঁইট পাট প্রতি বৎসর জন্মে, কিন্তু এই হিসাবও ঠিক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পৃথিবীর মধ্যে জাপান ও ফরমোজায় সামান্য পাট চাষ হয় এবং সারা পৃথিবীর মোট ফলনের অনুপাত যথাক্রমে (শতকরা) .৩৪ ও .০৮।

জেলার চাষ ও ফলন

বাঙ্গলা দেশের মধ্যে জমি হিসাবে ময়মনসিংহের স্থান প্রথম, অর্থাৎ সমস্ত চাষের জমির সিকিরও উপর এই জেলায় চাষ হয়। পরে ঢাকা, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, যশোহর, ২৪ পরগণা, দিনাজপুর, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার স্থান, জমির হিসাবে, পরে পরে। ফসলের হিসাবে পাবনার স্থান সর্ব্বোচ্চে, অর্থাৎ প্রতি একরে ১৫২১ পাউণ্ড পর্য্যন্ত পাট পাওয়া যায়। যশোহর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলাতেও ফসলের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে, অর্থাৎ প্রত্যেকটীতে ১৪৫০ পাউণ্ডের উপরে। প্রবন্ধ শেষে (খ) প্রতি জেলার স্বতন্ত্র হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

আসামের মধ্যে নওগাঁ, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, ডারাং; বিহারের

মধ্যে পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর, চম্পারণ ও উড়িষ্যার মধ্যে কটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রদেশ হিসাবে বাঙ্গলায় প্রতি একরে ১২৯১, আসামে ১১৯৭, উড়িষ্যায় ৮৫৩, বিহারে ৮০৫ এবং করদ রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরায় ৯০৬ ও কোচবিহারে ৯১৭ পাউণ্ড করিয়া পড়ে।

প্রধানতঃ পাট দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা তাহাদের মূলগত পার্থক্য। ইহাদের বীজের আকার হইতে এই বিভিন্নতা স্থির হয়। এক জাতীয় বৃক্ষে গোলাকৃতি এবং অপরটিতে দীর্ঘাকৃতি শুঁটি ধরে। মিঃ এন, সি, চৌধুরী ইহাদের যথাক্রমে গুটী পাট ও শুঁটী পাট আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জাতিগত অন্যান্য প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে তাহার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পার্থক্য

বাজারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলা হিসাবে পাটের নানা নাম আছে। ইহার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; সুতরাং সকলগুলি এস্থলে দেওয়া সম্ভব নহে। প্রচলিত কয়েকটী যথা, উত্তরীয়, দেশোয়াল, দেওরা, কাঁথিয়া বোম্বাই, নারাণগঞ্জী, সিরাজগঞ্জী। তন্মধ্যে আবার বড়ন, বড়পাট, ছোটন, ছোট পাট, কামারজানি, কুচমর্দ্দন, নলপাট, অগ্নিশ্বর, বেলগাছি, বিদ্যাসুন্দর, দেশী, ধলেশ্বরী, ধলসুন্দর, কাজলা, ঘাঘরী, লালী, রাঙ্গাপাট, সুতপাট, উদ্ধব, দেওধানী, মেঘনাল, ফুলেশ্বরী, ইত্যাদি।

চলিত নাম

পাটের বাজার বলিতে বাঙ্গলার এই কয়েকটি প্রধান:—

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে আরও বিশেষ পরিচয় দিতে গেলে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, এলাসিন, কেদারপুর, গৌরীপুর, জামালপুর, সেরপুর,

সরিষাবাড়ী, নাগরপুর, পিঙ্গনা, পোড়াবাড়ী, উলাকাণ্ডি, গুভনখালি, শম্ভুগঞ্জ, ভৈরববাজার (ময়মনসিংহ); সুকনপুকুর, সোণাতলা, সান্তাহার, বগুড়া, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট, আক্কেলপুর, হিলি, গাবতলী (বগুড়া); গাইবান্ধা, কামারজানি, নীলফামারি, হলদিবাড়ী, মহিমাগঞ্জ, চিলমারি, নলডাঙ্গা, ফুলছড়ি, চিলাহাটী, সৈয়দপুর (রঙ্গপুর); পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বেড়া, উল্লাপাড়া, সারা, ভাঙ্গুরা, নাকালিয়া (পাবনা); রাজসাহী, আত্রাই, নওগাঁ, চারঘাট, বাগাটীপাড়া, তাহেরপুর, কলম, আড়ানী, নাটোর, গুরুদাসপুর (রাজসাহী); দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট (দিনাজপুর); জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি, আলিপুর (জলপাইগুড়ি); পাটমারি (গোয়ালপাড়া); চাঁদপুর, আখাউড়া, আশুগঞ্জ (ত্রিপুরা); নারায়ণগঞ্জ, কালিগঞ্জ, লোহাজঙ্গ, (ঢাকা); মাদারিপুর, পালঙ, জপসা, চরমুগুরিয়া, নড়িয়া, পাটগাতি, ডামোড়িয়া, বরহমগঞ্জ, রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ (ফরিদপুর); নদীয়া, কুষ্টিয়া, মিরপুর (নদীয়া); মাথাভাঙ্গা, হলদিবাড়ী (কোচবিহার); আজিমগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ); বৈদ্যবাটী শেওড়াফুলী (হুগলী); কিশেনগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ (পুর্ণিয়া); মগরা (২৪ পরগণা); যশোহর, প্রভৃতি স্থানের নাম করা প্রয়োজন।

বাজার

সাধারণতঃ পাটের কাপড় বা চল্‌তি কথায় "চট," বস্তা বা থ'লে এবং সুতা সুতালী প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহাকে হেসিয়ান (Hessian) বলে। ডাণ্ডি হইতে জার্ম্মাণীর হেস্ (Hesse) প্রদেশে চট রপ্তানী হইত। সেখানে খুব ভাল জিনিষই কেবল রপ্তানী হইতে পাইত; তাহা হইতে হেসিয়ান নাম চলিত আছে। আবার সাধারণ যে সকল বস্তু, তাহারা স্যাকিং (Sacking) নামে পরিচিত।

উৎপন্ন বস্তুর নাম ও পরিমাণ

ভারতবর্ষে এখন বহু পরিমাণ পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমানে ইহা ১২ লক্ষ টন বা ২০০ কোটী গজ। ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ স্বতন্ত্র দেওয়া প্রয়োজন। ইহার মধ্যে Sacking-এর (চলতি পাটের) থ'লে এবং ভাল পাট (Hessian) এর চটই বেশী। পরিশিষ্টে (গ) সমস্ত বিশদভাবে দেখানো হইল। ঐ স্থানে গত কয়েক বৎসরের উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া হইল; পরিশিষ্ট (ঙ)। ভারতীয় পাটকল সমিতি (Indian Jute Mills Association)র কলে কত পাট ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও দেখানো হইল; পরিশিষ্ট (ঘ)। পৃথিবীতে কমবেশ ১ কোটী ২২ লক্ষ গাঁইট পাট সমস্ত কলে প্রতি বৎসরে লাগে; বিশদ হিসাব পরিশিষ্টে (চ) দিলাম।

প্রয়োজনের অনুপাতে নানা দেশ পাট আমদানী করিয়া থাকে; অর্থাৎ ভারতের পাটের রপ্তানীর হিসাব দেখিলে বোঝা যায় যে, কোন দেশ শিল্প বিষয়ে কত প্রসার লাভ করিয়াছে।

বাণিজ্য—পাটের ক্রেতা

পাট—কাঁচা ও পাটজাত দ্রব্যাদি—হিসাবে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইংরাজ ও জার্ম্মাণী কাঁচা পাট বেশী লয়, এমন কি জার্ম্মাণীতে পাটজাত দ্রব্যাদি—মোটেই যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাঁচা পাট মোট রপ্তানীর এক পঞ্চমাংশ জার্ম্মাণীতে গিয়া থাকে। আমেরিকা, ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ব্রেজিল, রুশিয়া প্রভৃতি সকল দেশেই কাঁচা পাট রপ্তানী হয়; পরিশিষ্ট (ছ)।

পাটজাত দ্রব্যের প্রধান খরিদ্দার আমেরিকা, পরেই ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মাঞ্চুরিয়া, যব, পশ্চিম আফ্রিকা, মিসর, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের স্থান। পরিশিষ্ট (জ) হইতে প্রত্যেকের অংশ বুঝিতে পারা যাইবে।

পাটজাত দ্রব্যের ক্রেতা

কাঁচা এবং তৈয়ারী বস্তুর সম্মিলিত ব্যবসায় ধরিলে আমেরিকার

স্থান প্রথম; অর্থাৎ মোট রপ্তানীর সিকি। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রেলিয়া, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্থান পরে পরে। অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ কাঁচা পাট লয় নাই বলিলেই হয়; হয়ত সে সকল দেশে এখনও চটকল স্থাপিত হয় নাই।

ভারত হইতে পাট রপ্তানীর শতকরা ৬৬·২% (২৬ কোটী ২২ লক্ষ টাকা) তৈয়ারী করা মাল; বাকী কাঁচা পাট (১৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা)। তৈয়ারী করা মালের মধ্যে, (১) বস্তা, থ'লে বা ছালা, (২) পাটের কাপড় বা চট, আর (৩) সামান্ত মাত্র দড়ি, সুতালী প্রভৃতি। পরিশিষ্টে (ঋ) ইহাদের রপ্তানীর পরিমাণ ও সংখ্যা দেওয়া হইল।

পাট যে আজ এত সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ ইংরাজের দায়। ক্রিমিয়ান (Crimean) যুদ্ধের সময় রুশ হইতে শণ পাওয়ার অসুবিধা হইবে বুঝিয়া ভারতের পাটের দিকে মন দেয়। তাহারা আসিয়া পাটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সজাগ না করিলে পাটের যে সামান্ত ব্যবহার ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার পর এত দ্রুত উন্নতি না হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল সমধিক। ১৮২৮ সালে ৩৬৪ হন্দর পাট ৬২০৲ টাকা মূল্যে প্রথম রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯২৫-২৬ সালে তাহা কমবেশ ১০০ কোটী টাকায় পৌঁছিয়াছিল।

নূতন শিক্ষা

১৮২৮ সালের পরের কয় বৎসরের হিসাব না পাইলেও বুঝিতে পারা যায় যে পাটের এবং পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৫০ সালে কাঁচা পাট ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা এবং প্রস্তুত দ্রব্যাদি ৩০ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, মোট ৪৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকায় পৌঁছে।

এই স্থলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। এই সময় পর্য্যন্ত

ভারতীয় হস্তচালিত তাঁত বিদেশী কলের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছে। ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত কোনও কোনও বৎসরে চট ও বস্তা, কাঁচা পাট অপেক্ষা বেশীই রপ্তানী হইয়াছে; প্রবন্ধ শেষে (এ) দ্রষ্টব্য।

বিলাতী মিল বনাম দেশী তাঁত

তাহার পর আবার ভারতের চটকল পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাঁচা পাটের রপ্তানী বেশীই হইয়াছে। ১৯১৪-১৫ সাল হইতে মহাসমরের সুযোগে ভারতের প্রস্তুত দ্রব্যাদি কাঁচা পাটকে সম্পূর্ণরূপে হটাইয়াছে এবং তদবধি প্রস্তুত দ্রব্যাদি মোট-পাট রপ্তানীর তিন ভাগের দুই ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ডাণ্ডি প্রদেশের বণিক প্রথম কল স্থাপিত করে। পাটের আঁশ অত্যন্ত শক্ত বিধায় তাহাকে কলে কাজ করিবার উপযুক্ত করিতে তেলের দরকার এবং এই বিষয়ে তিমির তেল সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাণ্ডির নিকট তিমির তেল সুলভ হওয়ায় ডাণ্ডিতেই প্রথম পাটকল স্থাপিত হইয়াছিল। এই পাটের ব্যবসায় ইংরাজ জাতিকে ধনী করিয়াছে; ইহার সহিত তূলার যোগ দিলে, ইংরাজের বৈভবের সন্ধান পাইতে পারি।

বিলাতে প্রথম কল

১৮৫৪ সালে বাঙ্গলায় শ্রীরামপুরে প্রথম মিল হয় Auckland সাহেবের Ishra Yarn Mills Co. পরে ১৮৫৭ সালে Baranagore Jute Mill. কয়েক বৎসর নিবৃত্ত থাকিবার পর ১৮৬৩-৬৪ সালে Gourepore Jute Factory স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ এবং মূলধনের পরিমাণ ৪,৩৫,৯৮,০০০ এবং ১,৭৪১,০০০ পাউণ্ড।

ভারতে প্রথম কল

বর্ত্তমানে মিলের সংখ্যা শতাধিক; তন্মধ্যে বাঙ্গলাতেই ৯৬। মাদ্রাজ,

বিহার ও যুক্তপ্রদেশেও কল আছে। পাটকে গাঁইট করিবার জন্ম Jute Press'ও আছে শতাধিক। বাঙ্গলাতেই ১০২টীর হিসাব পাওয়া যায়। আন্দাজ ৩,০৮,০০০ লোক পাটকলে এবং ৩০,০০০ লোক জুট প্রেসে কাজ করে। ইহা ছাড়া চাষী ও নানা ব্যবসায়ী লইয়া কত লোক যে পাটের উপর নির্ভর করে তাহার হিসাব রাখা কঠিন। পাটকলের বিস্তার ও ১৯৩৭ সালের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে (ট ও ঠ) দেখানো হইল।

বর্ত্তমান মিল

পাট উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলার চাষী বহু টাকা সাধারণ কোষাগারে জমা দিয়া থাকে। পাটের রপ্তানীর উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে। সাধারণতঃ সামান্য দুই একটী (পাট ও ধান চাল) ব্যতীত কোনও কাঁচা মালের রপ্তানীর উপর শুল্ক নাই। পাটের এ শুল্ক না থাকিলে, চাষী ক্রেতার নিকট এই টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিত। বর্ত্তমানে এই রপ্তানী শুল্কের পরিমাণ চার কোটী টাকার উপর। বাঙ্গলার এই নিজস্ব সম্পত্তি ভারত সরকার বরাবরই আত্মসাৎ করিয়াছে; বর্ত্তমানে বহু আন্দোলনের পর এই টাকা মোটামুটী প্রায় সবই বাঙ্গলার সরকার ফিরিয়া পায়। পরিশিষ্ট (ড) হইতে এই শুল্কের হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যাইবে।

চাষীর দান

পাটের পরিমাণ হিসাবে ১৯২৮-২৯ সালে, (অর্থাৎ ৮,৭৯,৮৬৩ টন) এবং মূল্য ধরিয়া ১৯২৫-২৬ সালে (অর্থাৎ ৩৭ কোটী ৯৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা) এবং প্রস্তুত দ্রব্যাদি পরিমাণ হিসাবে ১৯২৯-৩০ সালে (১৬৫ কোটী গজ চট ও ৫২ কোটী ২৩ লক্ষ থ'লে) এবং মূল্য হিসাবে ১৯২৫-২৬ সালে (অর্থাৎ ৫৮ কোটী ৯৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা), সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাণিজ্য হইয়াছে;

চূড়ান্ত রপ্তানী

পরিশিষ্ট (চ) দ্রষ্টব্য। ১৯২৫-২৬ সালের অত্যধিক রপ্তানীতে ভারতের যে লাভ হইয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া পরের কয়েক বৎসরে লক্ষিত হয়; অর্থাৎ পাটের দাম অত্যধিক রকম পড়িয়া যায়।

আমদানী

পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাটজাত দ্রব্যাদির আমদানী আছে, তাহা পরিমাণে খুব বেশী নয়, এবং গুণেও তাহা শ্রেষ্ঠ; ইহার মধ্যে ভাল ক্যাম্বিস একটী বস্তু। পূর্ব্বে এই আমদানী খুব বেশী ছিল। ১৯১৬-১৭ সালে ৪৯ লক্ষ টাকার এবং ১৯২৫-২৬ সালে ৫০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বর্ত্তমানে (১৯৩৮-৩৯) ইহা মাত্র ছয় লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

দরের তুলনা

কিন্তু যে বস্তুকে লইয়া জগতের বাজারে প্রতি বৎসরই কয়েক কোটি টাকার খেলা চলিতেছে, যাহারা সেই পাট উৎপন্ন করে, সেই বাঙ্গলার চাষী আজ নিরন্ন। নগদ টাকার লোভে, লাভের আশায়, ধানের ক্ষেত নষ্ট করিয়া চাষী পাট বুনিতে আরম্ভ করে। যত পাট প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার অধিক চাষ করার ফলে পাটের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাইতে থাকে, ফলে চাষের খরচ উঠান কঠিন হইয়া পড়ে। ১৯২৪-২৫ সাল হইতে ১৯২৮-২৯ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ৭,২৮,০০০ টন কাঁচা পাট রপ্তানী হইয়াছে এবং সরকারী খাতায় তাহার দাম ধরা হইয়াছে ৩১ কেটী ৩৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। আর ১৯৩৭-৩৮ সালে অর্থাৎ গত মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে ৭,৪৭,০০০ টন পাট রপ্তানী হইয়াছে, অর্থাৎ ১৯২৮-২৯ হইতেও ১৯ টন বেশী। কিন্তু দরের বেলায় দেখা যাইতেছে যে, মাত্র ১৪ কোটী ৭১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা অর্থাৎ একই ওজনের পাট, এমন কি ১৯ টন পাট বেশী দিয়াও, ১৬ কোটী ৬৪ লক্ষ

৭০ হাজার টাকা কম পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রতি একশত টাকার স্থলে ৪৬'৯ টাকা পাওয়া গিয়াছে বা ৫৩'১ টাকা দাম নামিয়াছে। শতকরা ৫৩'১ ভাগ দাম পড়িয়া যাওয়া শুভ লক্ষণ নয়; পরিশিষ্ট (ণ) দ্রষ্টব্য।

অত্যধিক দর কমার ফলে চাষীর ভীষণ ক্ষতি হইতে থাকে এবং দরের কোনও স্থিরতা না থাকায় চাষী পাট লইয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় থাকে। এই সব নিবারণ করিবার জন্য ২১ আগষ্ট (১৯৩৯) তারিখে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য গাঁইট প্রতি ৩৬৲ টাকা বাঁধিয়া দিয়া বাঙ্গলা সরকার এক অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন।

ব্যবহার

পাটগাছের নানা অংশের ব্যবহার আছে। পাতাগুলি কাহারা ভাজিয়া বা ভাতের সহিত সিদ্ধ করিয়া খায়, কোথাও বা পিত্তরোগে ভিজাইয়া জল খাওয়ার রীতি আছে। শুষ্ক পাট কাঠি বা পাকাটী গৃহস্থের বড় উপকারী বন্ধু। সহজদাহ্য বলিয়া অপর কাঠে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্য ইহার সাহায্য প্রয়োজন। ঐ উদ্দেশ্যেই হিন্দুর দাহ কার্য্যে মুখাগ্নি করিতে "পাকাটি" লাগে। হবিষ্যান্ন পাক করিতে পাকাটিকে শুচি বলা হয় এবং নারিকেল পাতার পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করে। পশুর উপদ্রব এবং সূর্য্যের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পান গাছ বা ক্ষেত ঘিরিয়া এবং ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য প্রচুর পাকাটি লাগে।

দড়ি, দড়া, সুতালি, চট, থলে, কার্পেট, ক্যাম্বিস প্রভৃতি করিতে পাটের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, কাগজ, নাইট্রো সেলুলোস (nitro-cellulose), নকল সিল্ক, কাঁচকড়ের বস্তু (celluloid articles) প্রভৃতি করিতেও পাটের ব্যবহার আছে। আধুনিক রাস্তা ও অট্টালিকা নির্ম্মাণে পাটের প্রয়োজন হইতেছে। আর সাধারণ ভাবে মালপত্র আঁট

করিয়া পাঠাইতে, রেল বা অন্য কোনও যানের চাকা প্রভৃতি তৈলাক্ত রাখিবার জন্য তৈলে ভিজান পাটের পরিত্যক্ত অংশের দরকার। আর্জ্জেণ্টাইনায় "alpargatas" নামে পাটের চটিজুতা প্রচুর ব্যবহৃত হয়; তাহা চট হইতে তৈয়ারী করে।

ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া এখন সকল দেশই নিজেরা পাট চাষ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথাও বা তাহার পরিবর্ত্তে নানা বস্তুর ব্যবহার আরম্ভ করিতেছে। নানা গাছের সহজপ্রাপ্য ও সুলভ ছাল হইতে বা কোনও শক্ত কাগজ দিয়া থ'লে তৈয়ারী হইতেছে; নরওয়ে এই বিষয়ে অগ্রণী। সে সকল বস্তা একবার ব্যবহার করিবার পর ফেলিয়া দেওয়া চলে। যাঁহারা Indian Trade Journal পড়েন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে সিমেণ্টের কতকটা আমদানীতে ১-মণ ওজনের "paper bags" ব্যবহৃত হইতেছে।

পক্ষে ও বিপক্ষে —বিপক্ষে

আমেরিকা চটের পরিবর্ত্তে তূলা এবং পশমকে গাঁইট বাঁধিবার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যে কার্পাস "চট" অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কোচিন চায়নায় শিমল এবং নারিকেল তন্তু মিলাইয়া বস্তা তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার তন্তু অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় অনাবৃতদেহ মজুররা পৃষ্ঠে লইতে চায় না। স্থানীয় Polompom তন্তু ব্যবহারে সুফল আশা করা যায়। জাভায় রোসেলা শণ এবং ফিলিপাইনে ম্যানিলা শণ হইতে বস্তা প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পাট অপেক্ষা সমধিক দৃঢ় এবং স্থানীয় বস্তু বিধায় দামেও সস্তা পড়িতেছে। বর্ত্তমানে ২০ হইতে ৩০ লক্ষ বস্তা তৈয়ারী হইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে সকল মিলগুলি পূরাদমে কাজ করিলে জাভায় আর ভারতীয় পাটের বস্তা প্রয়োজন

হইবে না। কফি, কোকো, চাউল প্রভৃতি নাড়াচাড়া করিতে ইকোয়েডরে (Ecuador) বহু পাটের বস্তা লাগে এবং তাহা পুরাপুরি ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ হইত। এখন সেখানে কাবুয়া (Cabuya) বা শিশলতন্তু হইতে বস্তা বা ছালা তৈয়ারী হইতেছে। তাহারা আশা করে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর ভারতের বস্তা প্রয়োজন হইবে না। ব্রেজিল হইতে জাপানীদের আমন্ত্রণ আসিয়াছে, যাহাতে জাপানীরা ব্রেজিল-বাসীকে পাট চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারে। আমাজন শিল্পানুসন্ধান সমিতি (Amazonian Industry Research Institute)র ক্ষেত্রে পাট উৎপন্ন করা সম্ভব হওয়ায় এখন ব্রেজিল ও পাট চাষ করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্যারা (Para) প্রদেশের এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এতদুদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। জার্ম্মাণীতে "Zelle Jute" নামে খড় হইতে এক তন্তু প্রস্তুত হইতেছে। ইহার সহিত শতকরা ১০ ভাগ পাট মিশাইলে তাহা পাট অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মাঞ্চুকুয়োতে কেনাফ (Kenaf) নামে তন্তু প্রভূত উৎপাদিত হইতেছে। ইষ্ট আফ্রিকার শিশলের বস্তা বা চট ইংলণ্ডে ভারতীয় পাট বা চট হইতে সস্তায় পড়িতেছে। পাটের দর বেশী থাকিলে ঐ ব্যবসায়ে সুবিধা হইতে পারে।

চারিদিক হইতে পাটের সহিত শত্রুতা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে, আশার ক্ষীণ আলোক রশ্মিও দেখা যাইতেছে। পাটের তন্তু

পক্ষে

আর্দ্রতায় শীঘ্র নষ্ট হয়, ইহাই পাটের বিপদ। সস্তার রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগে ইহার দ্রুত পচনশীলতা নিবারণ করিবার জন্য ইংলণ্ডে চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহারা আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে। কিউবাতে পাটকে (bitumen proofed) খনিজ পিচ্, অ্যাসফ্যাল্ট (asphalt), ন্যাপ্থা (naphtha),

পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি যোগে দৃঢ় এবং স্থায়ী করিয়া চাষ আবাদের কাজে, বিশেষতঃ আনারসের চারা ঢাকা দিবার জন্য লাগাইতেছে। এই জাতীয় পাটের কাপড় দ্বারা রুশে নদীতে বাঁধ দিবার কাজে বা গাঁথুনিতে লাগাইতেছে। জলের সংযোগে যাহাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া লয়। জার্ম্মাণীতে পাটকে কতক পরিমাণে কষ্টদাহ্য (fire proofed) করিয়া ছোট বাড়ীর ছাদ, মেজ এবং দেয়ালের আবরণরূপে ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়াতে এক কোম্পানী "জুটেক্স" (Jutex) নামে এক পদার্থ, পাট ও যৌগিক আঠার (artificial resin) সহযোগে প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা হইতে বড় বড় পাত্র বা আধার প্রস্তুত হইতেছে। রেল ইঞ্জিনের, মোটর গাড়ীর কোনও কোনও অংশাবলী প্রস্তুত করিবার জন্য "জুটেক্স" পাত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা কোনও কোনও বিষয়ে ধাতব পদার্থ অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী। এ্যালুমিনিয়ম হইতে ভারে লঘু এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) মাত্র ১'৪। হাল্কা, কঠিন এবং টেঁকসই বলিয়া জুটেক্স হইতে আরও বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। এই সংবাদটী পাট সংক্রান্ত সরকারী ৮ নম্বর বুলেটিন হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আরও জানা যায় যে সূক্ষ্ম ও সুপরিষ্কৃত পাট আজকাল সংবাদবাহী স্থূল তার নির্ম্মাণ কার্য্যে লাগিতেছে। এই সকল "দড়ার" (Cable) অন্তস্থলের ধাতব তার গুলিকে বিদ্যুৎশক্তিরোধক কাঁচকড় (gutta percha) দিয়া মোড়া থাকে এবং উপরিভাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন লৌহ বা অন্য তারের সমষ্টি দ্বারা বর্ম্ম করিয়া দেওয়া হয়। কাঁচকড়ের আবরণটী উপরের তার হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রচুর পাট লাগে। এক সামুদ্রিক মাইল (৬,০৮০ ফিট) এই জাতীয় "দড়া" তৈয়ারী করিতে আন্দাজ ৮০০ পাউণ্ড পাট

লাগে। Western Union Telegraph Companyর সমুদ্রতলস্থিত ৩২,০০০ মাইল পরিমাণ পাতা "তারে" ১৩,০০০ টন পাটের সূতা লাগে।

সুতরাং এক দিক দিয়া যেমন পাটের শত্রু জুটিয়াছে, অপর দিকে পাট লইয়া বহু অনুসন্ধান চলিয়াছে। পাটের স্বল্প দাম, ইহার স্বপক্ষে। আপাততঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত পাটের হয়ত কোনও গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সমবেত ভাবে পাটের যেরূপ শত্রুতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকার উপায় নাই, উচিত ও নয়। যতদুর সম্ভব সুচারুরূপে গবেষণার দ্বারা প্রতিনিয়ত যাহাতে পাটের ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্বন্ধে সুফল লাভ করা যায়, তাহার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা সরকারের পক্ষে বিধেয়।

পরিশিষ্ট

(ক)

(১৯৩৮)

জমি, ফলন ও প্রতি প্রদেশের অংশ

মোট জমি	৩০,৭৪,০০০	একর	
ব্রিটিশ ভারত	৩০,২৭,০০০	,,	৯৮·৪%
করদ রাজ্য	৪৭,০০০	,,	১·৬%
মোট ফলন	৬৬,৭১,০০০	গাঁইট (১)	
ব্রিটিশ ভারত	৬৬,০৫,০০০	,,	৯৮·৯%
করদ রাজ্য	৬৬,০০০	,,	·৯%

প্রদেশ—

	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার গাঁইট	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	২৪,৭৫	৮০·৮	৫৬,৯০	৮৫·৩
বিহার	৩,১৫	১০·২	৪,৩৬	৬·৫
আসাম	২,২৫	৭·৩	৪,৫১	৬·৭
উড়িষ্যা	১২	·৪	২৮	·৪

করদ রাজ্য—

কোচবিহার	৩৯	১·২		·৭
ত্রিপুরা	৮	·৩		·২

(১) প্রতি গাইট ৪০০ পাউণ্ড

(খ)

(১৯৩৫-৩৬)

বাজলার জেলা হিসাবে জমি, প্রত্যেকের শতকরা অংশ এবং প্রতি একরে ফলনের হিসাব

জেলা	হাজার একর	শতকরা অংশ	প্রতি একরে ফলন-পাউণ্ড
ময়মনসিংহ	৬,০০	২৯.২	১,৫২৬
ঢাকা	২,৯০	১৪.১	১,৪৪৪
রঙ্গপুর	২,৫২	১২.২	১,৪২৫
ত্রিপুরা	২,৩৪	১১.৩	১,৪৫১
ফরিদপুর	১,৪০	৬.৮	১,৪৪৮
রাজসাহী	৮৬	৪.২	১,৪৯২
বগুড়া	৮৫	৪.১	১,৩৯৩
পাবনা	৮২	৩.৯	১,৫২১
যশোহর	৬৬	৩.২	১,৫১৭
২৪-পরগণা	৫৭	২.৭	১,৩৭৩
দিনাজপুর	৫৫	২.৬	১,৪৩০
নোয়াখালি	৫০	২.৪	১,৪৫৯

ইত্যাদি—

(গ)

(১৯৩৭-৩৮)

ভারতে প্রস্তুত পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও অংশ

	টন	মোট টন	শতকরা অংশ
সুতা, সুতালী	...	৫৩,৯৩৩	৪.০
ক্যান্‌ভাস	...	৩,০৮৫০	.২

	টন	মোট টন	শতকরা অংশ
থ'লে	...	৭,২৮,৮৬৪	৫৫'১
হেসিয়ান	৬০,৩৮৮		
স্যাকিং	৬৬৮,৪৭৬		
চট (কাপড়)		৫,২০,৩৯৪	৩৯'৩
হেসিয়ান	৪৮৮,৬৫১		
স্যাকিং	৩১,৭৪৩		
অন্যান্য (দড়ি প্রভৃতি)		৫,৩৮৬	'৪
মোট		১৩,১১,৬৫৮	

(ঘ)

কলে ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ

প্রতি ৪০০ পাউণ্ড গাঁইট

	মোট হাজার	চটকল সমিতির কলে হাজার
১৯১৪-১৫	৪৯,৪৪	
১৯১৯-২০	৫২,২৭	
১৯২৪-২৫	৫৬,৭৬	
১৯২৯-৩০	৬৪,২৪	৬৩,৮৪
১৯৩৪-৩৫	৫৩,৫৬	৪৫,৮১
১৯৩৫-৩৬	৬০,২২	৫০,১২
১৯৩৬-৩৭	৭১,৯১	৬৬,৮৫

(ঙ)

(১৯৩৭-৩৮)

মিলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির পরিমাণ

	হাজার টন
১৯৩২-৩৩	৯০২˙৬
১৯৩৩-৩৪	৯০৬˙০
১৯৩৪-৩৫	৯৪৯˙৮
১৯৩৫-৩৬	১০,১১˙২
১৯৩৬-৩৭	১২,৫৩˙১
১৯৩৭-৩৮	১৩,১১˙৬
১৯৩৮-৩৯	১২,১১˙৫

(চ)

পৃথিবীতে সমস্ত পাটকলে ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ (গাঁইট)

(J. Barie & Co.র হিসাবমতে ১৯৩৭)

কলিকাতা মিল	৭২,০০,০০০	ভারতীয় অন্য মিল	৪,৫০,০০০
ইউরোপ	২৫,০০,০০০	বৃটেন	১০,০০,০০০
আমেরিকা প্রভৃতি	১০,০০,০০০	মোট	১,২১,৫০,০০০

(ছ)

(১৯৩৮-৩৯)

রপ্তানী—কাঁচা পাট—ক্রেতার নাম ও অংশ

মোট—৬,৯০,৩৫০ টন—১৩,৩৫,১৪,৬৮০ টাকা

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ইংলণ্ড	১,৮৩,০১৯	৩,৫১,০১	২৬˙৩
জার্ম্মাণী	১,৩৮,১০২	২,৭০,১৪	২০˙২

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ফ্রান্স	৭৫,৯৯৪	১,৫০,৪৭	১১·২
ইটালী	৪৬,১২৯	৯১,৬৯	৬·৮
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩১,১০৪	৬৭,০৭	৫·০২
ব্রেজিল	২৪,৪৪২	৫১,৫৭	৩·৮
রুশ	১৩,১৬৮	২৪,০৪	১·৮

(জ)

(১৯৩৮-৩৯)

রপ্তানী—পাটজাত দ্রব্যাদি—ক্রেতার নাম ও অংশ

মোট—২৬,২১,৯৬,৭৩৭ টাকা

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৬,৮২,২৮	২৬·০
ইংলণ্ড	২,৬৮,৪৫	১০·২
আর্জ্জেণ্টাইন গণতন্ত্র	২,৬১,৮১	৯·৯৮
অষ্ট্রেলিয়া	১,৯৯,১১	৭·৫
মাঞ্চুরিয়া	১,২০,৮৮	৪·৬
ব্রহ্ম	১,১৯,৬০	৪·৩

দক্ষিণ-আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, জাভা, মিসর, কিউবা, ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন প্রভৃতি।

(ঝ)

(১৯৩৮-৩৯)

রপ্তানী—প্রস্তুত দ্রব্যাদির পরিমাণ ও অংশ

মোট	৩৯,৫৭,১১,৪১৭	টাকা	
প্রস্তুত দ্রব্যাদি	২৬,২১,৯৬,৭৩৭	,,	৬৬·২ %
কাঁচা পাট	১৩,৩৫,১৪,৬৮০	,,	৩৩·৮ ,,

			পাটজাত বস্তুর শতকরা অংশ
চল্‌তি পাটের থ'লে	১০,৪৫,১৭,৮০৩	টাকা	
মিহি " "	২,০০,৩৯,৮৮১	"	
মোট	১২,৪৫,৫৭,৬৮৪	"	৪৭·৪%
চল্‌তি পাটের চট	৫১,২৬,৪৩৫	"	
মিহি " "	১২,৭৯,০০,৭৪১	"	
মোট	১৩,৩০,২৭,১৭৬	"	৫০·৭%
দড়ি, সুতালী প্রভৃতি	৪০,৬৭,৩৩০	"	১·৫

(এও)

১৮৪৮-৪৯ হইতে ১৮৬০-১ সাল পর্য্যন্ত রপ্তানীকৃত পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির মূল্য

	পাট (jute) পাউণ্ড (£)	চট ও থ'লে (gunny & gunny bags) পাউণ্ড (£)
১৮৪৮-৪৯	৬৮,৭১৭	১০৫,৭৭৭
১৮৪৯-৫০	৮৮,৯৮৯	২০২,২৩৫
১৮৫০-৫১	১৯৬,৯৩৬	১৬৬,৩৯৫
১৮৫১-৫২	১৮০,৯৭৬	২৮৭,৪১১
১৮৫২-৫৩	১১২,৬১৭	২৩১,১৫৯
১৮৫৩-৫৪	২১৪,৭৬৮	১৭৪,৭৯০
১৮৫৪-৫৫	২২৯,২৪১	২১৫,৩৩৫
১৮৫৫-৫৬	৩২৯,৪৭৬	৩০২,৩৩৮
১৮৫৬-৫৭	২৭৪,৯৫৭	৩৭০,২৫২
১৮৫৭-৫৮	৩০৩,২৯২	২১৭,১৯৪
১৮৫৮-৫৯	৫২৫,০৯৯	৩৯২,৪২৪
১৮৫৯-৬০	২৯০,০১৮	৩৩৩,৯৭৭
১৮৬০-৬১	৪০৯,৩৭২	৩৫৯,৩৬৩

(ট)

পাটকলের বিস্তার

১৮৫৪ প্রথম মিল (রিষড়া)

১৮৫৭ দ্বিতীয় মিল (বরাহনগর)

	মিল	মূলধন (লক্ষ টাকা)	মজুর হাজার	তাঁত হাজার	টাকু হাজার
১৮৯৯-১৯০০ —০৩-০৪	৩৬	৬,৮০	১১৪˙২	১৬˙২	৩,৩৪˙৬
১৯০৯-১০— ১৯১৩-১৪	৬০	১২,০০	২০৮˙৪	৩৩˙৫	৬,৯১˙৮
১৯১৯-২০— ১৯২৩-২৪	৮২	২৩,৪২˙৫	৩০১˙৮	৪৪˙৬	৯,৩৬˙২
১৯৩০-৩১	১০০	২৩,৬০˙৭	৩০৭˙৭	৬১˙৮	১২,২৫˙০
১৯৩৭	১০৫	২০,২১˙৫	৩০৮˙৭	৬৫˙০	১৩,০০˙০

(ঠ)

১৯৩৭

প্রদেশ হিসাবে মিল ও মজুর সংখ্যা

	মিল	লোক সংখ্যা
বাঙ্গলা	৯৬	২,৮৭,৭৪৩
বিহার	৩	৬,২৬৫
যুক্তপ্রদেশ	৩	৬,৬০১
মদ্র	২	৫,১৭৬
ফরাসী উপনিবেশ	১	২,৯৩০
মোট	১০৫	৩,০৮,৭১৫

(ঙ)

পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানী শুল্কের পরিমাণ

	কাঁচা	প্রস্তুত দ্রব্য	মোট
১৯৩৪-৩৫	১,৮৩,৬৬,৩৯২	১,৭৫,৪০,৬৯৬	৩,৫৯,০৭,০৮৮
১৯৩৫-৩৬	১,৮৫,৮৩,৯৬৪	১,৯১,৭৮,৬৩২	৩,৮৭,৬২,৫৯৬
১৯৩৬-৩৭	১,৮৪,৭৭,৮৫৩	২,৪৫,৮২,৯০১	৪,৩০,৬০,৭৫৪
১৯৩৭-৩৮	১,৭৯,৮৮,৯২৪	২,৫৩,১৩,৩৪৯	৪,৩৩,০২,২৭৩
১৯৩৮-৩৯	১,৬৪,৬৩,৬৩৬	২,৩৪,১৮,১৮১	৩,৯৮,৮১,৮১৭

(চ)

পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী

	পাট হাজার টাকা	পাট ওজন টন	পাটজাত দ্রব্য হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০	১৩,৩৫		৩০,৭৯
১৮৫৪-৫৫	৩৪,৩৯		৩২,৩০
১৮৫৯-৬০	৪৩,৫০		৫০,১০
১৮৬৪-৬৫	১,৯৭,৬৮	১,০৫,০৫০	১৫,৪৩
১৮৬৯-৭০	২,৯৭,৬৭	১,৬৮,১০০	৩০,৮৯
১৮৭৪-৭৫	৪,৮৭,০৩	২,৭৪,৭০০	৩৫,৮০
১৮৭৯-৮০	৪,৩৭,০০	৩,৩৪,০০০	১,১৯,৫৫
১৮৮৪-৮৫	৪,৬৬,১৪	৪,১৮,৪৫০	১,৫৪,৩৮
১৮৮৯-৯০	৮,৬৩,৯৯	৫,১২,৮০০	২,৭৯,১৩
১৮৯৪-৯৫	১০,৫৭,৬০	৬,৪৮,৮৫০	৪,২১,১০

পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী (অনুসৃত)

	পাট হাজার টাকা	পাট ওজন টন	পাটজাত দ্রব্য হাজার টাকা
১৮৯৯-১৯০০	৮,০৭,১৬	৪,৮৬,২৫০	৬,২৬,৪৩
১৯০৪-০৫	১১,৯৬,৫৬	৬,৪৩,৭৫০	৯,৯৩,৮৯
১৯০৯-১০	১৫,০৮,৮৩	৭,৩০,৪৪৮	১৭,০৯,৬৫
১৯১৪-১৫	১২,৯১,০২	৫,০৫,০৯৫	২৫,৮২,০২
১৯১৮-১৯	১২,৭২,০১	৩,৯৮,১৪৬	৫২,৬৫,২৩
১৯১৯-২০	২৪,৬৯,০৫	৫,৯১,৮১৪	৫০,০১,৫৫
১৯২০-২১	১৬,৩৬,০৯	৪,৭২,৪১৪	৫২,৯৯,৪৭
১৯২৪-২৫	২৯,০৯,৩০	৬,৯৬,০০০	৫১,৭৬,৬৬
১৯২৫-২৬	৩৭,৯৪,৫৭	৬,৭৪,১৫৪	৫৮,৮৩,৯৮
১৯২৮-২৯	৩২,৩৪,৯২	৮,৯৭,৮৬৩	৫৬,৯০,৪৯
১৯২৯-৩০	২৭,১৭,৩৮	৮,০৬,৮৮৪	৫১,৯২,৬৮
১৯৩৪-৩৫	১০,৮৭,১১	৭,৫২,৪৭৪	২১,৪৬,৮৩
১৯৩৫-৩৬	১৩,৭০,৭৬	৭,৭১,৩২৪	২৩,৪৮,৯৫
১৯৩৬-৩৭	১৪,৭৭,১০	৮,২০,৫৯১	২৭,৯৪,৭৫
১৯৩৭-৩৮	১৪,৭১,৯০	৭,৪৭,২৫৮	২৯,০৭,৭৬
১৯৩৮-৩৯	১৩,৩৫,১৫	৬,৯০,৩৫০	২৬,২১,৯৭

১৮৬৩ সালের পূর্ব্বের পাট রপ্তানীর ওজন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

পাটজাত দ্রব্যের ওজন বা মাপ দুই রকমের আছে—(১) চটের মাপ, গজ হিসাবে; (২) বস্তার পরিমাণ, সংখ্যা হিসাবে; সুতরাং এই স্থানে তাহা দেওয়া সম্ভব হইল না।

(ণ)

পাটের দাম

(প্রতি ৪০০ পাউণ্ড ওজনের গাঁইট)

	টাকা	আনা		টাকা	আনা
১৮৫১	১৪	৮	১৯১০	৩৪	২
১৮৬১	১৪	১০	১৯১৪	৮০	১০
১৮৬৫	১৫	০	১৯১৫	৪৯	৮
১৮৭০	২৩	৩	১৯২০	৭৮	৮
১৮৭৫	১৯	৩	১৯২৫	৮৯	৪
১৮৮০	২৯	৮	১৯২৬	১১০	১২
১৮৮৫	১৯	৮	১৯৩০	৫২	১৪
১৮৯০	৩৩	০	১৯৩১	৩২	১২
১৮৯৫	৩৩	০	১৯৩২	৩৬	৬
১৯০০	৩৪	১৪	১৯৩৩	২৮	১৪
১৯০৫	৪১	১২	১৯৩৪	২৬	১২
১৯০৬	৫৯	১৪	১৯৩৫	৩৬	৩
১৯০৭	৬১	৬	১৯৩৬	৩৬	৫

• ১৯৩৭ ৩৬ টাকা ১৫ আনা

১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে পাটের দর ১২৩৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল ; এ পর্য্যন্ত এরূপ দর আর কখনও হয় নাই।

১৯৩৯ সালের ২১ আগষ্ট পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্ডিনান্স জারি করিয়া সর্ব্ব নিম্ন মূল্য ৩৬৲ টাকা বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

কার্পাস বা তুলা (Cotton)

কার্পাসের কথা কিছু বলিতে গেলে একসঙ্গে এত বিষয় মনের মধ্যে আসিয়া জমা হয়, যে সে সম্বন্ধে পর পর সাজাইয়া বলা কষ্টকর হইয়া পড়ে। কার্পাস চাষ, কার্পাস শিল্প * ও কার্পাস বীজ † এই তিনটী বিষয় একই প্রবন্ধের অঙ্গীভূত, অথচ তাহা একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব নয় ; সেই কারণে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা হইল।

সে আজ বেশী দিনের কথা নয়, ভারতের কার্পাস জগতকে সভ্যতা দিয়া নূতন জাতির হাতে মৃত্যু লাভ করিয়াছে। আবার হয়ত নূতন জীবনের সন্ধান আসিয়াছে তাই অনেক কথা বলা প্রয়োজন।

আজ কার্পাস বা তুলা ভারতের এক প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় তুলার তুলনা নাই। তাহা ছাড়া ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, তুলা ভারতবর্ষকে শিল্প সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছে।

যতদূর হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে তুলার চাষ এবং তুলাজাত দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতের গৌরবের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। যখন ভারতবর্ষে তুলার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তখন পৃথিবীর কোনও স্থানে তাহার নাম জানা ছিল কি না তাহাই সন্দেহের বিষয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি যেমন মানবজাতির সভ্যতার প্রতীক, কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ তেমনই উহার ভিত্তি এবং মানবের আদিম কালের ইতিহাসে কৃষির উন্নতিই মানবের কৃষ্টির প্রথম নিদর্শন। যাহারা তুলা-শিল্পে জগৎকে

ইতিহাসের কথা

---

* ৫৪ পাতা

† প্রথম খণ্ড ১২৭ পাতা।

চমৎকৃত করিয়া পৃথিবীর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইয়াছে, সেই ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে, তুলার নাম শুনিলেও, ব্যবহার উহার ও শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। মণীষী Watt এই সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"It would not be far from correct to describe cotton as the central feature of the world's modern commerce. Certainly no more remarkable example of a sudden development exists in the history of economic products than in the case with cotton. The enormous importance of the textile today, in the agricultural, commercial, industrial and social life of the world, renders it difficult to believe that little more than two hundred years ago cotton was practically unknown to the civilised nations of the West.

মোট কথা এই, তুলা আজ জগতের বাণিজ্যের মধ্যমণি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে সকল বস্তু অবলম্বন করিয়া স্বল্পকালের মধ্যে বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে তূলাই সর্ব্বপ্রধান। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও সামাজিক জীবনে বস্ত্র যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও পাশ্চাত্যে তুলা যে প্রায় অজ্ঞাত বস্তু ছিল, ইহা আজ বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু ইহাই হইল খাঁটী সত্য কথা কোন আদিম কাল হইতে ভারত তুলার সন্ধান পাইয়াছে এবং তাহার বস্ত্রশিল্প জগতের সৌখীন বস্ত্র জোগাইয়া আসিতেছে কে আজ তাহার হিসাব রাখে? ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করার মধ্যবর্ত্তী কালেই ইংরাজ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহার ফলে সাধারণ লোকে মনে করিতে পারে

ভারতে তূলার কোনও ব্যবহার ছিল না বা তূলা শিল্প সম্বন্ধে তাহার অধিবাসীর কোনও জ্ঞান ছিল না।

তূলা হইতে উৎপন্ন সূতার উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। তৎপরে অশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ও লাট্টায়ন শ্রৌতসূত্র এই দুই স্থলেও বিশেষ উল্লেখ আছে।

পুরাতন কথা—ঋগ্বেদ প্রভৃতি

সায়ন ভাষ্য ও মন্বাদি সংহিতায় কার্পাস বস্ত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষে তূলার এবং তূলার বস্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের পরিচয় জগতে ছড়াইয়া পড়ে। খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বেও ভারতের বস্ত্র নানা দেশে গিয়াছে এবং অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছে। ৬৩ খৃষ্টাব্দে যে পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও ভারতের তূলার এবং বস্ত্রের বাণিজ্যের বিশেষ উল্লেখ আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—আর যে কোনও দেশের হিসাব লওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে তাহারা ভারতবর্ষ হইতে অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পিছনে পড়িয়া আছে। চীন এবং মিসর—ইহারাই ভারতের

চীন

সহিত অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ে প্রাচীনত্বে সমকক্ষতা লাভ করিয়া থাকে। ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চীন দেশে কার্পাসের চাষ হইত বলিয়া কোনও উল্লেখ নাই। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তন্তুর জন্য মহাচীনে তূলার চাষ হয়। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে কোনও সম্রাট একখণ্ড তূলাজাত বস্ত্র বহুমূল্য বলিয়া পরম সমাদরে রক্ষা করিতেন।

মিসরেরও সেই অবস্থা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মিসরেও তূলার

মিসর

চাষ ছিল না। কার্পাস বৃক্ষ হয়ত স্থানে স্থানে ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ যেমন তাহার ব্যবহার বুঝিয়া লইয়া সভ্যতার পরিচয় দিয়াছে, চীন বা মিসর সে গৌরবের অধিকারী নহে।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যে সকল গ্রীসীয় সেনা ও সেনাপতি আসিয়াছিল, তাহারাই গ্রীসে কার্পাসবৃক্ষের জ্ঞান লইয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত লিভাণ্ট হইতে ইংলণ্ডে তূলা আমদানী করা হইত। ইংলণ্ডে তূলা নাই, কিন্তু এই আমদানী করা তূলা দিয়াই ইংলণ্ড পৃথিবীর নানা দেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়াছে। অবশ্য ইহাতে ভারতের সহিত যে ব্যবহার ইংরাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাতে তাহার যথেষ্ট কলঙ্ক আছে।

ইউরোপ যাত্রা

সাধারণতঃ দুই জাতীয় কার্পাস বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের আদিম কার্পাসবৃক্ষ বহুকাল স্থায়ী বলিয়া পরিচিত; ইহারা কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া ফলদান করে (প্রচলিত ভাষায় ইহা "গাছ-কাপাস")। আর এখন যাহা অধিক প্রচলিত, তাহা প্রতি বৎসরই চাষ করিতে হয় (ইহাকে 'চাষ-কাপাস' বলে)। স্থান ভেদে চাষের কাল বিভিন্ন; তবে ভারতবর্ষে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অধিক মাত্রায় তূলা বীজ রোপণ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর তূলার চাষ করিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। চাষ-কাপাস সম্ভবতঃ আরবে সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান রাজত্ব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চাষ-কাপাসের বীজও নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। খুব সম্ভব তুরস্ক, আসিয়া-মাইনর, মেসোপোটেমিয়া এবং পারস্য হইয়া 'চাষ-কাপাসের" বীজ ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

বৃক্ষের বিভিন্নতা ও চাষ

এই প্রধান দুই শ্রেণীর মধ্যে গুণাগুণ এবং স্থানভেদে তূলার বহু প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ আছে। এস্থলে তাহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্যে তাহার কয়েকটী প্রচলিত নাম আছে—তাহা হইতে মাত্র

ভারতীয় তূলার বিভিন্নতা

কয়েক রকম তূলার আভাস দেওয়া হইল যথা:—ওমরা বা উমরা, তন্মধ্যে বিরার, খান্দেশ, মধ্যভারত (Central India) মালভি, বর্ষী ও নগর; বাঙ্গাল, তন্মধ্যে পঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ; আমেরিকান তন্ম'ধ্য পঞ্জাব (unspecified—4—F) সিন্ধু, ধারবাড়, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি; সাদার্ণস্ (Southerns), তন্মধ্যে ওয়েষ্টার্ণ্ স্ (Jowari and Mungari), নরদার্ণ্ স্, কারুণগণ্যি, তিনেভেলী, সালেম, কুম্প্ তা প্রভৃতি; ধল্লেরা, তন্মধ্যে মাথেয়ো, ধল্লেরা (unspecified) প্রভৃতি; ব্রোচ, তন্মধ্যে স্থরাট নওসরী (Surti), ব্রোচ (unspecified) প্রভৃতি; কুমিল্লা, বর্ম্মা, হায়দ্রাবাদ গাওরাণী প্রভৃতি।

ভারতে যেমন নানা রকম ভাগ করা আছে, অন্যান্য দেশেও গুণানুসারে নানা নামে তূলা পরিচিত। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তূলার নাম দ্বীপজ কার্পাস বা দ্বীপ কাপাস (Sea Island Cotton)। ইহার আঁশ খুব মিহি, লম্বা, রেশমের ন্যায় নরম ও চক্‌চকে। মূল তন্তু বা আঁশের দৈর্ঘ্য ১$\frac{5}{8}$ হইতে ২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ইহা প্রধানতঃ আমেরিকার তীরভাগে, ক্যারোলিনা দ্বীপে, জর্জ্জিয়া ও ফ্লোরিডার অন্তর্ভাগে এবং পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে জন্মিয়া থাকে। ফসলের পরিমাণ বেশী নয় বলিয়া অত্যুৎকৃষ্ট সূতার কাজে ব্যবহৃত হয়। (২) উচ্চ ভূমিজ বা আপলাণ্ড্ স্ (Uplands) —ইহাই আমেরিকার সাধারণ তূলা; ফলনের পরিমাণ খুবই বেশী। তন্তুর দৈর্ঘ্য ·০৭ হইতে ১·১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। ইহারই অপর এক জাতি (৩) দীর্ঘতন্তু (Long-stapled Uplands) নামে প্রচলিত। লুসিয়ানা ও টেক্সাস প্রদেশে বেশী জন্মে; তন্তু ১$\frac{1}{8}$ হইতে ১$\frac{3}{8}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ। আরিজোনা ও দক্ষিণপূর্ব্ব কালিফোর্ণিয়াতে মিসরী কাপাস (Egyptian) আনিয়া উৎপন্ন করা হইয়াছে। এই জাতীয় তূলা, কিছু

বিদেশে তূলার নাম

কালো রঙের হইলেও নরম, চক্‌চকে, রেশমের সহিত শীঘ্র মেশে, শীঘ্র রঞ্জিত হয় এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগে রেশমের মত দেখিতে হয় (mercerise) বলিয়া মিসরী কাপাসের খুব আদর আছে।

ভারতীয় তূলার আঁশ বা তন্তু মোটেই দীর্ঘ নয়। সিন্ধ্‌ সুধার ও পাঞ্জাব আমেরিকানে তূলার তন্তু ১″ উপর, সুর্ত্তি, কাম্বোডিয়া, ধারোয়াড় গাওরাণী প্রভৃতিতে ৭/৮″ হইতে ১″ ইঞ্চি পর্য্যন্ত এবং বাঙ্গাল, সালেম ব্রোচ, ধল্লেরা, ওমরা প্রভৃতি তূলায় ৭/৮″ ইঞ্চির অনূর্দ্ধ দৈর্ঘ্যের এবং আরও বহু তূলায় ইহা অপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যেরও তন্তু হয়।

ইংরাজ আসিবার অনেক পরেও এমন দিন ছিল, যখন ভারতবর্ষ নিজের সমস্ত তূলা যোগাইয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্রাদি রপ্তানী করিয়া টাকা আনিয়াছে। ১৮১৬-১৭ সালে সমস্ত ভারতবাসীর বস্ত্রই দেশে প্রস্তুত হইয়া বিদেশে কার্পাস বস্ত্রাদি আড়াই কোটী টাকার উপর রপ্তানী হইয়াছিল।

যখন ইংরাজ দেশে কলকারখানা স্থাপন করিল, তখন তাহার কাঁচা তূলার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই কারণে ভারতীয়দের উৎসাহ

চাষ বৃদ্ধি

দিয়া টাকা ছড়াইয়া, নিজ দেশ হইতে কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ লোক পাঠাইয়া এ দেশে তূলা চাষের উন্নতি সাধন করিতে "উঠিয়া পড়িয়া" লাগিয়া গেল।

তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। যে জাতীয় তূলা হইতে মসলিন প্রভৃতি প্রস্তুত হইত, তাহা তাহারা উপেক্ষা করে, এবং অন্য তূলা জন্মাইতে যত্নবান হয়। ফলে এক সময় ভারতবাসী একেবারে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে; "হইয়া পড়ে" বলিলে ভাবতীয় শিল্পীর অবমাননা করা হয়। বাধ্য হইয়া সকল শিল্পী কৃষিতে মনোনিবেশ করে। এ কথা কেবল বস্ত্রশিল্পী সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে; যাহা এখানে

ইংরাজ বিক্রয় করিতে পারিয়াছে, তৎসক্রান্ত সকল শিল্পই লোপ পাইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ২ কোটী ৫৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে তূলা চাষ হইয়া ৪০০ পাউণ্ডের গাঁইট (আন্দাজ ৫ মণ) পাওয়া যায় ৫৭ লক্ষ ৭৯ হাজার। ব্রিটিশ ভারতে জমির অংশ পড়ে শতকরা ৬০ ভাগ আর ফসল ৬৫.৫ অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার গাঁইট। বাকী জমি ও তূলা জন্মে করদরাজ্যে; পরিশিষ্ট (ক)।

ভারতের চাষ

তূলার জমি হিসাবে পঞ্চনদের স্থানে সর্ব্বোচ্চে; সমস্ত জমির মাত্র ১২.১% দখল করিয়া ফসল দেয় ২০.১%। জমির পরিমাণ হিসাবে মধ্যপ্রদেশ ও বিরারের স্থান প্রধান। তাহার পর যথাক্রমে বোম্বাই, পঞ্চনদ, মদ্র, সিন্ধু যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি। বাঙ্গলার নাম মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ জমি মাত্র .২%।

করদরাজ্যের মধ্যে হায়দ্রাবাদ প্রধান; ভারতের সমস্ত তূলার জমির ১৩.৮%; জমির পরিমাণও প্রায় ৩৬ লক্ষ একর। তাহার পরই বোম্বাই প্রদেশের করদ রাজ্য সকল, মধ্যপ্রদেশের করদ রাজ্য সকল, বরোদা, পঞ্চনদের করদরাজ্য সকল, গোয়ালিয়র, রাজপুতানা করদ রাজ্য ইত্যাদি।

ফসলের হিসাবে হায়দ্রাবাদ ও পরে পরে উপরোক্ত করদ রাজ্য সকলের স্থান। এখানেও পঞ্চনদের করদ রাজ্য গুলিতে ফসল খুব বেশী হয়। জমি হিসাবে মাত্র ৩.৩% পড়ে কিন্তু ফলনের বেলায় ৬.৭%। মধ্যপ্রদেশে ফলনের পরিমাণ খুবই কম; পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

প্রতি প্রদেশেই আবার কতকগুলি জেলা আছে যেখানে অপর স্থান

অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাষ হয়। সাধারণের মধ্যে এই সকল জেলার নাম জানিবার কৌতূহল মাত্র থাকিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্য বিষয়ক ছাত্র, তুলা ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিকদের এই সকল স্থানের নাম জানা প্রয়োজন।

জেলা পরিচয়

মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে—আকোলা (৮,২০,০০০ একর), অমরাবতী, যোৎমল, বুলদানা, নিমার, নাগপুর, চিন্দবারা ও হোসাঙ্গাবাদ ;

বোম্বায়ে—আহম্মদাবাদ (৫,১৭,০০০ একর), দক্ষিণ খান্দেশ, ধারবাড়, বিজাপুর, বেলগাঁ, সুরাট ;

মদ্রে—বেলারী (৬,৫০,০০০ একর), কোইম্বাটুর, মাদুরা, ত্রিনবল্লী বা তিনেভেলী, রামনাদ ;

পঞ্চনদে—মণ্টগোমেরী (৩,৪৫,০০০ একর), লায়ালপুর, মুলতান, লাহোর, ফিরোজপুর, সাহাপুর ;

বিহারে—সারণ (৯,০০০ একর), রাঁচি ; উড়িষ্যায় অঙ্গুল ; আসামে গারো পাহাড় ; এবং যুক্তপ্রদেশে আলিগড় (৮৭,০০০ একর) জেলা তুলা চাষের জন্য বিশেষ সমাদৃত।

বাঙ্গলায় তুলা চাষ হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে ৫২,০০০ একর এবং ময়মনসিংহ এবং বাঁকুড়ায় খুব সামান্য চাষ হয়। ঢাকার তুলায় প্রস্তুত মসলিন জগতকে এক সময় চমৎকৃত করিয়াছিল। সাধারণ লোকে মনে করেন, ঐ তুলার আঁশ (fibre) বা তন্তু দীর্ঘ এবং দৃঢ় ছিল। অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ছিল কি না, এখন বলা বড় কঠিন, তবে দীর্ঘ ছিল না এ কথা বিশেষজ্ঞরা বলেন। ঐ তুলা অত্যন্ত কোমল এবং উহার তন্তু সূক্ষ্ম ছিল। সুনিপুণ শিল্পীর হাতে পড়িয়া তাহাই এত সূক্ষ্ম সূতায় পরিণত হইত যে আজও তাহার অনুরূপ সূতা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় নাই।

বাঙ্গলার তুলা

ভারতের তূলা এককালে ইউরোপের বহুস্থানে রপ্তানী হইত ; কিন্তু জগতের বাজারে অপর প্রতিদ্বন্দী আসিয়া পড়াতে ভারতীয় তূলার সে সমাদর আর নাই। এখন অনেক দেশেই তূলা উৎপন্ন হইতেছে এবং বর্ত্তমানে যাহাদের নাই তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তূলা সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছে। যাহারা জমি ও আবহাওয়ার দোষে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতেছে না, তাহারা নানাপ্রকারে যৌগিক তন্তুদ্বারা অভাব মিটাইতেছে।

প্রতিপক্ষ

এই সকল চেষ্টার ফলে এখন পৃথিবীতে প্রচুর তূলা জন্মিতেছে। অনেকে মনে করেন, চা, রবার, চিনি প্রভৃতির ন্যায় জগতে তূলার উৎপাদন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

জগতে তূলা বিষয়ে আমেরিকা সকলের অগ্রণী এবং তাহার পরেই ভারতবর্ষের স্থান। বিশেষ চেষ্টার ফলে রুষ গণতন্ত্র তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। চীন রাজ্যে নানা গোলমালে আর সমস্ত উৎপন্ন পণ্যের হিসাব রাখা সম্ভব নয় ; তাহা হইলেও লোকে চীনকে ভারতের পরেই স্থান দিয়া থাকে। ব্রেজিল, মিসর, উগাণ্ডা প্রভৃতি দেশে প্রচুর তূলা জন্মিতেছে। পরিশিষ্ট (খ) হইতে সমস্ত পাওয়া যাইবে।

পৃথিবীর সমস্ত তূলার ৭০ ভাগ বা ততোধিক আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও রুষে জন্মে। তন্মধ্যে আমেরিকায় ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ। আমেরিকার জমিতে ভারতবর্ষ অপেক্ষা ঢের বেশী ফলে। প্রধান কয়েকটী দেশের প্রতি-একরে ফলন পরিশিষ্টে (গ) দেওয়া হইল।

জমি ও ফলন

তূলার বাণিজ্যের বিষয় বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে।

পূর্ব্বে তূলার পরিবর্ত্তে বস্ত্রাদি রপ্তানী হইত। পরে ইংরাজের কারখানায় তূলার প্রয়োজনে ভারতবর্ষে তূলা চাষের উৎসাহ দেওয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৪৮ সালে জন ব্রাইট (John Bright) এর সভাপতিত্বে এক বিশেষ কমিটী (Select Committee) নিযুক্ত হয়। ভারতবর্ষে পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজনের তূলা উৎপন্ন করা যাইতে পারে, সাক্ষ্যদানকালে বিশেষজ্ঞরা এই কথা বলেন। কিন্তু জমির রাজস্ব বা কর এবং ক্ষেত্র হইতে বন্দর পর্য্যন্ত তূলা লইয়া যাইবার অসুবিধাই ইহার প্রধান অন্তরায়। এই সময় ইংলণ্ডকে প্রধানতঃ আমেরিকার উপর তাহার প্রয়োজনের তূলার জন্য নির্ভর করিতে হইত। নিজ সাম্রাজ্যের নানা অংশে তূলা উৎপাদন করিয়া লওয়া তাহাদের প্রযোজন হইয়া পড়ে। কতক তূলা, (১৮৫৬) ১৫,৩০০ টন, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইত সে স্থলে আমেরিকা হইতে যাইত ১,৭০,৭৭০ টন। ভারতীয় তূলা দামে সস্তা কিন্তু গুণে হীন। তাহাতেই ভারতীয় তূলার উন্নতির জন্য ইংরাজ রাজসরকারের "কৃপাদৃষ্টি" পড়ে।

ভারতে তূলা চাষের প্রবর্ত্তন

এই চেষ্টা একেবারে ফলবতী হয় নাই, একথা কেহ বলিবে না। তূলা যথেষ্ট জন্মিয়াছে এবং রপ্তানীও হইয়াছে; কিন্তু জমিদারের খাজনা, রাজার রাজস্ব, দালালের পারিশ্রমিক, কুঠিয়ালের খুসীমত দামে বিক্রয় করিয়া চাষীর কি রহিল, তাহা বলা বড় কঠিন। এই সকল কৃষকের জীবিকার্জ্জনের প্রায়ই অন্য পন্থা ছিল, সে সকল বন্ধ হওয়ায় অপর দিক দিয়া নিঃস্ব হইতেছিল, তাহার উপর রপ্তানীর পরিমাণের এবং মূল্যের অনিশ্চয়তা হেতু, তাহারা কোনও রকমে লাভবান্ হইতে পারে নাই।

চাষীর দুঃখ

১৮১৫-১৬ সালেও কার্পাস শিল্পজাত বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে গিয়াছে দুই

কোটী টাকার উপর; ১৮৩২ সালে তাহা ১৫ লক্ষ টাকায় আসে।

পুরাতন বাণিজ্য

১৮৩৭ সালের হিসাবে দেখিতে পাই ১৫,৩০০ টন তূলা ভারত হইতে যায়। ১৮৪১ সালে উহা ৮৭,০০০ টনে পৌছে। সিলেক্ট কমিটী কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালে (১৮৪৬) আবার কিছু কমে। ইহা কেবলমাত্র ইংরাজের অংশ। ইতোমধ্যে অন্য জাতিরা ও ভারতীয় কার্পাস অধিক পরিমাণে লইতে আরম্ভ করে।

যখন হইতে নিযমিত হিসাব পাওযা গিযাছে, তাহাতে দেখা যায় ১৮৪৯-৫০ সালে ভারতের মোট কাঁচা তূলার রপ্তানী প্রায় সাড়ে চার কোটী টাকায় পৌছিয়াছে। তাহার পর হইতে কিছু কিছু বাড়িয়া

১৮৬৩-৬৪ সালে ৫৩ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা

১৮৬৪-৬৫ ,, ৫৬ ,, ৩৬ ,, ,,

১৮৬৫-৬৬ ,, ৫৩ ,, ৩৮ ,, ,, হয়।

১৮৬২ সালে আমেরিকা গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার নিকট ইংরাজ তূলা লইতে পারিল না। তখন ভারতের তূলায় "টান পড়ে" এবং ১৮৬৪-৬৫ সালে উনবিংশ শতাব্দীর রপ্তানীর চূড়ান্ত হইয়া যায়। ১৮৭৬-৭৭ সালের এই পরিমাণ অর্দ্ধেক হইয়া যায়; আর ১৮৭৮-৭৯ সালে মাত্র ৮ কোটী টাকায নামে; ইহাই রপ্তানী তূলার হিসাবে সর্ব্বনিম্ন স্তর। ১৯২২-২৩ হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পর্য্যন্ত রপ্তানীর আয় এক বিরাট অধ্যায়; এবং ১৯২৩-২৪ সালই রপ্তানীর সর্ব্বোচ্চশিখর, অর্থাৎ ৯৮ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা মূল্যে ৬,৭৩,৬২৮ টন তূলা বিদেশে যায়; পরিশিষ্ট (ঘ)।

পর পর দুই বৎসর যথাক্রমে ৯১ কোটী এবং ৯৫ কোটী টাকার তূলা বিদেশে বিক্রীত হইল। জাপান এই কয় বৎসর প্রতি সনেই ৪৬ কোটী, ৪৭ কোটী টাকার তূলা লইয়াছিল। ইটালী, চীন, বেলজিয়ম, ইংরাজ

ফরাসী, স্পেন, নেদারলণ্ড প্রভৃতি তখন অনেক তুলা লইয়াছে। পরিশিষ্ট (ঙ) হইতে প্রতি দেশের গৃহীত তুলার দাম পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাণিজ্যের এ সুদিন থাকে নাই। ৯৫ কোটী টাকার পরই ১৯২৬ ২৭ সালে একেবারে ৫৯ কোটী টাকায় নামিয়া যায়। শেষ রপ্তানী (১৯৩৮-৩৯) মাত্র ২৪ কোটী টাকায় নামিয়াছে। তুলার বাজার জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত; সুতরাং জাপান লইলে বেশী বিক্রয় হয়, তাহা না হইলে আর হয় না। অপরাপর ক্রেতাদের বাজার অ-ভারতীয় বিক্রেতা দখল করিয়াছে।

তুলার দামও অসম্ভব রকম হ্রাস পাইয়াছে ১৯২৭-২৮ সালে ও ১৯৩৮-৩৯ সালে সম পরিমাণ তুলা রপ্তানী হয় (যথাক্রমে ৪,৮২,৩৩৬ টন ও ৪,৮২,৬৫৮ টন) কিন্তু টাকার হিসাবে দেখা যায় ১৯২৭-২৮ সালে ৪৮ কোটী টাকা পাওয়া গেল, আর ১৯৩৮ ৩৯ সালে মাত্র ২৪ কোটী, অর্থাৎ ঠিক আধাআধি। পরিশিষ্ট (চ) হইতে ১৮৬১ সাল হইতে তুলার দামের হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যাইবে।

বর্ত্তমানেও জাপান আমাদের প্রধান খরিদ্দার; (১৯৩৮-৩৯) ২৪ কোটী টাকার তুলার মধ্যে তাহার অংশ সওয়া ১১ কোটী টাকা (৪৭·২%); পরেই ইংরাজ ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা (১৪ ৮%); পরে চীন, জার্ম্মাণী, ফরাসী, বেলজিয়ম, ইটালী প্রভৃতি অপরাপর ক্রেতা পরিশিষ্ট (ছ)।

আঁমদানী আছে সাড়ে আট কোটী টাকার তুলা; তন্মধ্যে কেনায়া উপনিবেশ দেয় পৌনে পাঁচ কোটী টাকার মাল (৫৫·৪%), তাহার পরই মিসর (প্রায় দুই কোটী ২২·০%), সুদান, আমেরিকা, টাঙ্গানাইকা প্রভৃতি আমাদের বিক্রেতা; পরিশিষ্ট (জ)।

আমদানী যাহারা করে, তাহাদের মধ্যে বোম্বাই বন্দর প্রধান।

আট কোটী টাকার তূলা (৭ কোটী ৯০½ লক্ষ), ৯২·৯%, সেখানে নামে। বাঙ্গলা ৫·৩% আর মদ্র ১·৭%।

যতদিন তূলা আমদানী হইতেছে, তাহার মধ্যে ১৯৩৭-৩৮ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; পরিশিষ্ট (ঝ)। ১ লক্ষ ৩৪·৫ হাজার টন তূলা ১২ কোটী টাকায় আসে ; ইতোপূর্ব্বে এরূপ আমদানী আর হয় নাই। বর্ত্তমানে আমদানী তূলার উপরে প্রতি পাউণ্ডে এক আনা শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে ; তাহাতে আমদানী হ্রাস পাইতেছে।

ঝড়তি তূলা (waste cotton) রপ্তানী হয় এবং যাহারা তূলার ব্যবহার জানে, অথচ ভাল তূলার দাম বেশী পড়িবে বলিয়া কাজে লাগায় না, তাহারা ভারতের ঝড়তি তূলা লয় ; ইহার দাম প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ইংরাজ লয় সাড়ে ২৬ লক্ষ টাকার মাল (৩২·৮%), তাহার পর জার্ম্মাণী, তাহার অংশ মোট টাকার সিকি। আমেরিকা, সুইডেন, বেলজিয়ম, ফরাসী প্রভৃতি দেশও কম বেশী লইয়া থাকে।

কাপড় বা অন্য কোনও বস্ত্রে কার্পাসের প্রয়োজন আছে। তোষক, বালিশ, গদি, জামার ভিতরের আস্তরণ, সূতা, দড়ি, দড়া প্রভৃতি মোটামুটী কাজেই আমরা তূলা ব্যবহার করিয়া থাকি।

তূলার ব্যবহার

তাহা অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র ব্যবহার পাই ফিতা, ক্যান্‌ভাস বা ক্যাম্বিস, তাঁবু, ঝালর, লাইনোলিয়ম্‌, কার্পেট, মটর প্রভৃতির টায়ার ও লাইনিং করিতে ; গ্যাসের ম্যান্‌টল্‌ (mantle), কলকারখানার বেল্টিং (belting), চিকিৎসার সহায়তার জন্য ব্যাণ্ডেজ, তূলার প্যাড, (wadding, shoddy) এই সব কাজে কিছু তূলা লাগিয়া যায়। কাগজ করিতে এবং তূলা হইতে বিশুদ্ধ সেলুলোজ্‌ (cellulose) পাইবার জন্য তূলার বহুল প্রয়োজন।

এখন এই সেলুলোজ্‌ সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। সেলুলোজ

হইতে আমরা সেলুলয়েড (বা কাঁচকড়া) পাই। তাহা আবার লাগে ফটোগ্রাফের ফিল্ম করিতে, বোতলের মুখোস বা টুপী করিতে, নানারকম বার্ণিশ, বিস্ফোরক, বিদ্যুৎ-রোধক (insulating) কয়েকটী বস্তু, নকল চামড়া, নকল সিল্কের কাপড় (rayon), কলোডিয়ন এবং সেলুলয়েডের অন্যান্য যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে।

আমাদের তুলা আছে, কিন্তু আমরা এ সকল করি না ; ভারতবর্ষে সেলুলয়েড প্রস্তুত করিতে না কি ভারত সরকারের ঘোরতর আপত্তি আছে। বিদেশ হইতে সেলুলয়েডের সীট্ বা চাদর আনিয়া দেশে তাহা হইতে নানা বস্তু তৈয়ারী হইয়া থাকে।

ঝড়তি তুলা যখন বিদেশীরা এত দাম দিয়া লয়, তখন নিশ্চয়ই তাহারা ইহার একটা সদ্ব্যবহার করে। ইহা হইতেও কাগজ হয়।

ঝড়্তি তুলার ব্যবহার

মালপত্র ভাল করিয়া প্যাক অর্থাৎ বস্তা বা বাক্সবন্দী করিতে, সলিতা বা পলিতা, সাদাসিধা কার্পেট প্রভৃতি কাজে ইহা বিশেষ উপযোগী। পরিত্যক্ত, কাটে খাওয়া সূতা ও এই তুলা বিশেষ করিয়া কারখানায় লাগে। যখন কোনও স্থান অনবরত তৈল নিষিক্ত করিবার দরকার হয়, অথচ সূক্ষ্ম সূতা, তুলা প্রভৃতি লাগিয়া থাকিলে ক্ষতি নাই, তখন এই গুলি তেলে ভিজাইয়া প্রয়োজনীয় স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। আর লাগে বিস্ফোরকে—gun-cotton করিবার জন্য। নাইট্রো সেলুলোজ্ (nitro-cellulose) এবং ধূমহীন বারুদ করিতে দামী তুলা খরচ না করিয়া ঝড়তি তুলার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য আইনমতে আমরা এ সকল পারি না।

অধুনা তুলার পরিমাণ পৃথিবীতে বেশী হওয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিতেছেন, যাহাতে উচ্চাঙ্গের রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে তুলার ব্যবহার করা যায়। ইতোমধ্যে পাট সম্বন্ধে এ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

কার্পাস শিল্পে ভারতের স্থান কোথায়, সে বিষয়েও কিছু জানা দরকার। অনুবর্ত্তী প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করা হইল।

পরিশিষ্ট

(ক)

১৯৩৮

মোট জমি— ২,৫৭,৪১,০০০ একর

ব্রিটিশ ভারত— ১,৪৩,৬৫,০০০ একর ৫৯·৭%

করদ রাজ্য— ১,০৩,৭৬,০০০ ,, ৪০·৩%

মোট ফলন—৫৭,৭৯,০০০ গাঁইট (৪০০ পাউণ্ড গাঁইট)

ব্রিটিশ ভারত— ৩৮,৫০,০০০ ,, ৬৭ ০%

করদ রাজ্য— ১৯,১৯,০০০ ,, ৩২·০%

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার গাঁইট	শতকরা অংশ
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৪০,৪৭	১৫·৭	৭,১১	১২·৫
বোম্বাই	৩৮,৬২	১৫·০	৭,৩৪	১২·৯
পঞ্চনদ	৩১,৩৫	১২·১	১১.৪০	২০·১
মদ্র	২৫,৬৯	৯·৯	৫,০৪	৮·৯
সিন্ধু	৯,৭০	৩·৭	৩,৫৪	৬·০
যুক্তপ্রদেশ	৫,৬৭	২·২	১,৯৩	৩·৪
বাঙ্গলা	৫৮	·২	২৩	—
অন্যান্য	—	—	—	—

(অনুসৃত)

করদ রাজ্য	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার গাঁইট	শতকরা অংশ
হায়দ্রাবাদ	৩৫,৬৩	১৩·৮	৫,৭০	১০·০৭
বোম্বাই করদ রাজ্যসমূহ	২৩,১২	৮·৯	৪,৭৯	৮·৪
মধ্যপ্রদেশ করদ রাজ্যসমূহ	১৩,৩৭	৫·২	১,৪৩	২·৫
বরোদা	৯,১৪	৩·৫	১,৮৬	৩·২
পঞ্চনদ করদ রাজ্যসমূহ	৮,৫১	৩·৩	৩,৭৩	৬·৭
গোয়ালিয়র	৬,৬৮	২·৬	৭৮	১·৪
রাজপুতানা করদ রাজ্যসমূহ	৫,২৪	২·০৩	৬৩	১·১
অন্যান্য	—	—	—	—

(খ)

পৃথিবীতে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ও প্রতি দেশের শতকরা অংশ (১)

(১৯৩৮-৩৯)

মোট—৩,৩৩,০০,০০০ গাঁইট (প্রতিটি ৪০০ পাউণ্ড)

	হাজার গাঁইট	শতকরা অংশ
আমেরিকা	১,৪১,০০	৪২·৩
ভারতবর্ষ (২)	৫১,৯৮	১৫·৬

(১) New York Cotton Exchange Service কর্তৃক প্রকাশিত। League of Nationsএর প্রদত্ত হিসাবের সহিত ইহার মোটামুটি মিল আছে।

(২) ভারত সরকার প্রদত্ত হিসাবে ৫৭,৭৯,০০০ গাঁইট দেওয়া আছে। Indian

	হাজার গাঁইট	শতকরা অংশ
রুশ গণতন্ত্র	৪৫,৪১	১৩·৬
ব্রেজিল	২২৪৩	৬·৭
মিসর	১৯,১২	৫·৬
চীন (৩)	১৭,৯২	৫·৩
পেরু	৪,৭১	১·৪
আর্জ্জেণ্টাইনা	৩,৫৮	১·০
ইঙ্গ-মিসরী সুদান	৩,২৩	·৯
উগাণ্ডা	৩,০০	·৯
মেক্সিকো	২,৭৮	·৮
তুরস্ক	২,৩৯	·৭
পারস্য	১,৯৮	·৬

(গ)

প্রতি একরে তুলার ফলন—পাউণ্ড *

(১৯৩৭-৩৮)

মিসর	৫৩১	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২৬৭
পেরু	৫০৮	ব্রেজিল	১৫৭
রুশ গণতন্ত্র	৩২২	আর্জ্জেণ্টাইনা	১৫১
সুদান	২৭৭	ভারতবর্ষ	৮৯
উগাণ্ডা	৮৪		

Central Cotton Committee এই দুই হিসাব হইতে ভিন্ন অঙ্ক দেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে নিউ ইয়র্কের হিসাবে ৫৯ লক্ষ গাঁইট; Central Cotton কমিটির হিসাবে ৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট; ভারত সরকারের মতে ৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার এবং League of Nations এর মতে ৫৬ লক্ষ ৬৪ হাজার গাঁইট।

(৩) National Agricultural Research Bureau of Nanking এর মতে ১৯৩৬ সালে চীনে ৫৬ লক্ষ ৮৭ হাজার গাঁইট তুলা হইয়াছিল।

* লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কমিটীর হিসাব।

(ঘ)

তুলার রপ্তানী

	টন	হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০		৪,৩০,১৮
১৮৫৪-৫৫		৩,৬৪,৩১
১৮৫৯-৬০		৮,৪৫,৬৪
১৮৬৪-৬৫	২,৩৪,৪০০	৫৬,৩৬,০৫
১৮৬৯-৭০	২,৪৯,৪৮০	২৮,৬১,৮৬
১৮৭৪-৭৫	২,৮০,০০০	২২,৮৮,৬০
১৮৭৯-৮০	১,৯৭,৪০০	১১,১৪,৫৫
১৮৮৪-৮৫	২,৫৩,৫০০	১৩,২৯,৫১
১৮৮৯-৯০	৩,১৬,১৫০	১৮,৬৭,১৩
১৮৯৪-৯৫	১,৬৯,৩৫০	৮,৭০,৮২
১৮৯৯-০০	২,১৮,৬৫০	৯,৯২,৫১
১৯০৪-০৫	২,৮২,৯০০	১৭,৪৬,৪৭
১৯০৯-১০	৪,৪৮,৮০০	৩১,৪৩,২৫
১৯১৪-১৫	৫,১৮,২৫০	৩৩,৫৩,৪১
১৯১৯-২০	৪,২৯,৬৯৮	৫৮,৮১,৩০
১৯২২-২৩	৬,০১,৬১০	৭১,০৯,৯১
১৯২৩-২৪	৬,৭৩,৬২৮	৯৮,৬৭,৪০
১৯২৪-২৫	৫,৯৫,৯৩৭	৯১,৪৭,০৩
১৯২৫-২৬	৭,৪৭,৩৩৪	৯৫,২৫,৫০
১৯২৯-৩০	৭,২৬,৮৬৪	৬৫,০৭,৭০
১৯৩৪-৩৫	৬,২৩,২৭৬	৩৪,৯৫,৩৬
১৯৩৫-৩৬	৬,০৬,৫৩৬	৩৩,৭৭,০৭
১৯৩৬-৩৭	৭,৬২,১৩৩	৪৪,৪০,৯৯
১৯৩৭-৩৮	৪,৮৭,৭৬৪	২৯,০২,৯৭
১৯৩৮-৩৯	৪,৮২,৬৫৮	২৩,৮৭,৮৯

(ঙ)

রপ্তানী—১৯২৩-২৪ ও ১৯২৫-২৬ সাল

ক্রেতার নাম ও অংশ

	১৯২৩-২৪ হাজার টাকা	শতকরা অংশ	১৯২৫-২৬ হাজার টাকা	শতকরা অংশ
মোট	৯৮,৪৭,০৯		৯৫,২৫,৫০	
জাপান	৪২,৬০,২০	৪৬.৩	৪৭,৪৭,৪২	৪৯.৮
ইটালী	১৪,৯৫,৭৯	১৫.১	১০,২৫,২১	১০.৭
ব্রিটেন	৮,৫৬,৮৭	৮.৭	৫,৪২,১৪	৫.৬
বেলজিয়ম	৭,০৭,৯৪	৭.১	৫,৬১,৫৯	৫.৯
চীন	৬,৮৪,৯৬	৬.৯	১২,১২,৬২	১২.৭
জার্ম্মাণী	৬,৬৫,৪৩	৬.৭	৪,৯৭,২৩	৫.২
ফ্রান্স	৪,৭৩,৭৬	৪.৮	৪,২৫,৪০	৪.৪
স্পেন	২,৪৪,৬৩	২.৪	১,৬১,৫২	১.৭
আমেরিকা	১,১৫,৫৮	১.১	৬৪,৩৫	.৬
অপরাপর	—	—	—	—

(চ)

দাম—ব্রোচ তুলার—১৮৬১ সাল হইতে

(৭৮৪ পাউণ্ড ওজনের গাঁইট)

	টাকা	আনা		টাকা	আনা
১৮৬১	১৩৯		১৮৭৫	২০৪	
১৮৬৫	৩৪২		১৮৮০	২৫১	
১৮৭০	৩০২		১৮৮৫	২২৯	

(অনুসৃত)

	টাকা	আনা		টাকা	আনা
১৮৯০	২৩৩	৮	১৯১৯	৬৩৫	০
১৮৯৫	২০২	৮	১৯২০	৫০২	১২
১৮৯৯	১৫০	৮	১৯২৫	৪৫৯	৮
১৯০০	২১৯	০	১৯৩০	২৪৮	৬
১৯০৫	২১৫	৮	১৯৩১	১৭৮	১২
১৯১০	৩০৩	০	১৯৩৫	২৩৭	১২
১৯১৫	২০৫	০	১৯৩৬	২২৩	৬
১৯১৮	৬৫৩	০	১৯৩৭	২২৩	৮

(ছ)

রপ্তানী—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

মোট—৪,৮২,৬৫৮ টন ;—মূল্য ২৩,৮৫,৮৯,১৫৪ টাকা

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
জাপান	১২৬,৩০১	১১,২৭,৩৬	৪৭·২
ব্রিটেন	৭৩,৩৯৭	৩,৫৪,৭৮	১৪·৮
চীন	৩৭,৩৮৬	১,৭১,০৫	৭·১
জার্ম্মাণী	৩৪,৪৩৪	১,৬১,৭৪	৬·৭
ফ্রান্স	৩০,২৬৭	১,৪৪,৯৮	৬·০
বেলজিয়ম	২৫,২৬৯	১,২৩,৯৩	৫·২
ইটালী	১৬,৩৬৪	৬৯,৪০	২·৯

(জ)

আমদানী—বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

মোট—৯৬,৩৭৪ টন ;—মূল্য ৮,৫০,৮৯,১৯৪ টাকা

	টন	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
কেনায়া উপনিবেশ	৫৬,১১২	৪,৭৩,৪৮	৫৫.৯
মিসর	১৮,৯৯০	১,৮৭,১৯	২১.৯
ইঙ্গ-মিসরীয় সুদান	১২,৪৪৮	১,১৮,০২	১৩.৮
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৪,৫৮০	৩৭,৪৭	৪.৪
টাঙ্গানাইকা প্রদেশ	৩,৪৮৭	৩০,৯৬	৩.৬
ইত্যাদি—			

(ঝ)

আমদানী—পরিমাণ ও মূল্য

	টন	হাজার টাকা
১৮৬২-৬৩	৩,৪৬৭	
১৮৬৪-৬৫	৪,৩৬০	
১৮৬৯-৭০	২,১৩০	
১৮৭৪-৭৫	৭৮৫	
১৮৭৯-৮০	৩,৮৬৩	
১৮৮৪-৮৫	৩,৪০৩	
১৮৮৯-৯০	৫,৭৬০	
১৮৯৪-৯৫	৩,৯০০	২০,৪৭
১৮৯৯-০০	৯,৪৩৯	৪৬.২৩

(অনুসৃত)

	টন	হাজার টাকা
১৯০৪-০৫	৯,৬২৭	৬৩,৮৫
১৯০৯-১০	৪,৭০০	৩৩,৫৮
১৯১১-১২	২৪,১৪৫	২,০৮,৬৪
১৯১৪-১৫	৪,২৯৭	২৯,১৭
১৯১৮-১৯	৪,৬৬৬	১,২০,৩৮
১৯১৯-২০	৩,৩০৩	৬৭,৮০
১৯২১-২২	২৪,৪৫০	৩,৪৪,২৮
১৯২৪-২৫	২০,১৮৩	২,৫০.৫৯
১৯২৯-৩০	২৩,৯৮০	৩,৪২,১৫
১৯৩৪-৩৫	৬০,৫৬৪	৫,২৮,৩৮
১৯৩৫-৩৬	৭৬,৪৮৭	৬,৩৭,৮৫
১৯৩৬-৩৭	৬৪,৯৮৮	৫,৮৪,৬৮
১৯৩৭-৩৮	১,৩৪,৪১৪	১২,১৩,৩২
১৯৩৮-৩৯	৯৬,৩৭৪	৮,৫০,৮৯

কার্পাস শিল্প

(১) পুরাতন যুগ

পুরাতন কথা

ভারতের কার্পাস শিল্প যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, সে বিষয়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত এবং বুদ্ধের যুগে "export of cotton fabric was of worldwide importance" অর্থাৎ ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র জগতের

রপ্তানীর বাজারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৩২১—২৯৭) সুদক্ষ কারিগরের নিপুণ হস্তে অতি সূক্ষ্ম ও মনোমুগ্ধকর বস্ত্র প্রস্তুত হইত। J. A. Mann সাহেব অনেক তথ্য আলোচনার পর লিখিয়াছেন—"আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, ভারতবর্ষই কার্পাস বস্ত্রের জন্মস্থান।" (India is according to our knowledge the accredited birth place of the cotton manufactures.)

এই সকল বিষয় আজ মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের পর নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহেঞ্জোদারোতে লোকে চরকা কাটিত এবং কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করিত তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। শীতবস্ত্রের জন্য পশুলোম হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। কার্পাসবস্ত্রের সামান্য টুকরা মৃৎপাত্রের গাত্রে সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আজ যে ভাবে পল্লীর গৃহিণী আচার, পুরাতন তেঁতুল প্রভৃতির আধার বস্ত্র দ্বারা কঠিনভাবে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখে সেইভাবে হয়ত কোনও সযত্নরক্ষিত মৃত্তিকাধার বস্ত্রাবৃত অবস্থায় ছিল; আজ তাহারই অবশিষ্ট খণ্ড বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া সে যুগের বস্ত্রশিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বহুদিনের চেষ্টার ফলে ভারতের বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও এত সুন্দর হইয়াছিল যে আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শিল্পীর কৃতিত্ব

সূতা হইতে বস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্তই সামান্য যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত হইত; সেই বস্ত্র অতি সৌখীন হইত এবং ধনী, রাজা, রাজচক্রবর্ত্তীর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিত। Baines নামে পণ্ডিত বলিয়াছেন "The Indians have in all ages maintained an unapproached and almost incredible

perfection in their fabrics of cotton—***some of their muslins might be thought the works of fairies or insects rather than of men.***"

বাঙ্গলার গৌরব এই যে, মসলিনে ভারতের মধ্যে ঢাকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার মসলিন বিভিন্ন নামে প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ মলমল, দোরিয়া, চারখানা ও জামদানী নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মলমলে আবার তিন ভাগ ছিল; যথা—(১) অবরোয়ান, তানজেব, মলমল; (২) সাবনাম খাসা, ঝুনা, সরকার আলি, গঙ্গাজল ও তেরিন্দম; (৩) হাম্মাম, ডিমটী, সান জঙ্গলখাসা ও গলাবন্দ। দোরিয়ার মধ্যে ডোরাকাটা, মসলিন, রাজকোট, ডাকান, পাদসাহীদার, কুস্তিদার, কাগজাহি ও কলাপাত; চারখানার প্রধান, ছিট মসলিন, নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতর খোপ, সাকুতা, বাছাদার ও কুস্তিদার এবং জামদানীতে নয়নসুখ, বুটীদার, সাবর্ণবুটী, ছাওয়াল, ডুবলিজাল, মেল, তেরছা প্রভৃতি নাম ছিল। এই সকল মসলিন জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, মিসর, পারস্য প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায়ীরা বস্ত্রসম্ভার লইয়া গিয়া বাঙ্গলায় অর্থ আনিয়া দিত। সুরাট, কালিকট, মসলিপট্টম, বরোদা, ব্রোচ, লাহোর, মুলতান, সুক্কুর প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল স্থানেই তন্তুবায় শ্রেণী বাস করিত এবং নানা প্রকারের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। কালিকটের নামে ভারতের কার্পাস-বস্ত্রের নাম "ক্যালিকো" হইয়াছিল। বিদেশী বণিকেরা যখন এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখনও ভারতের বস্ত্র শিল্পের অত্যন্ত সুসময়।

মসলিন পরিচয়

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে মোগল অভিযানের ফলে বস্ত্রশিল্প দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল; কিন্তু মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

আবার লুপ্তশ্রী বহু পরিমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া আবার তন্তুবায় তাহার তাঁতে মনোনিবেশ করিল এবং বাদসাহ, আমীর, ওমরাহরা প্রাসাদের একাংশে তাঁতশালা ("কারখানা") বসাইয়া নিজেদের রুচিমত বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এ সময়ে ও ভিজগাপট্টম, আর্কট, নেলোর, ত্রিনবল্লী, টিউটিকোরিণ প্রভৃতি স্থানে অতি সৌখীন ও সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত এবং মদ্রের রুমাল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

মোগল আমলের ইতিহাস

বাদশাহকে উপহার দিবার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা স্থানীয় সৌখীন ও মূল্যবান বস্তু প্রস্তুত করাইয়া লইতেন এবং সে সময় সৌখীন পোষাকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় এই সকল শাসনকর্ত্তারা নিজ প্রদেশের তন্তুবায়দিগকে উৎসাহ ও অর্থদান করিতেন। এই প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে স্থানে স্থানে এমন বস্ত্র প্রস্তুত হইত যাহার ধারণা করা এখন কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভারত সম্বন্ধে Tavernier এর মতামত অত্যন্ত মূল্যবান; তিনি বলিয়াছেন যে কতকগুলি বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে স্পর্শ-দ্বারা তাহার কোনও অনুভূতি হয় না এবং এক পাউণ্ড তুলা হইতে অন্ততঃ ২৫০ মাইল দীর্ঘ যে সূতা প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ সূতা হইতে বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিদেশীর দল এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের দৃষ্টি ভারতীয় বস্ত্রের সৌন্দর্য্য ও শিল্পের উৎকর্ষতার উপর পড়ে। তাহারা বুঝিতে পারে যে ভারতের বস্ত্র যে ধনীরই নিকট উপস্থিত হউক, সেখানেই সমাদর লাভ করিবে। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের এই ব্যবসায়ের যাত্রা সুরু হয় এবং তাহাদের পঞ্চম অভিযানের হিসাবে প্রকাশ পায় যে লাভের অংশ শতকরা ১০০

কোম্পানীর আমল

টাকাতেই দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যবসা নিজেদের করায়ত্ত করিবার জন্য ঢাকা, হুগলী, কাম্বে, কচ্, কোচিন, কালিকট্, মসলিপট্টম্, ব্রোচ, সুরাট, আহম্মদাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে তাহারা কুঠী নির্ম্মাণ করে। এই ব্যবসায়ীর দল মশলা, নীল, সোরা, তুলা, রেশমের সঙ্গে সূতার বস্ত্রও লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, যথারীতি ভারতীয় বস্ত্রাদি ও রুমাল ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়া বাজার অধিকার করিয়া বসে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে মিহি বস্ত্র আন্দাজ ৫০,০০০ খণ্ড ইংলণ্ডে যায় এবং আড়াই গুণ লাভে বিক্রীত হয়; ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অন্ততঃ এক লক্ষ খণ্ড বস্ত্র প্রবেশ করে এবং কিছু না হইলেও ভারতবর্ষে একা ইংলণ্ড হইতেই দুই লক্ষ টাকা আসে। ওলন্দাজেরাও প্রায় এক লক্ষ টাকার উপর কাপড় লইয়া যায়।

ইংলণ্ডে আমদানী

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের তুলা ইংলণ্ডে রপ্তানী হইতে থাকে। তখন লোকের মনে আতঙ্ক হয় যে এই তুলা রপ্তানীর ফলে যদি ইংলণ্ডে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন ভারতের বস্ত্রের আর চাহিদা থাকিবে না। সুতরাং তুলার রপ্তানী বন্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে এবং তুলা রপ্তানী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই তুলা রপ্তানীর জন্য ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হয় নাই এবং যতদূর হিসাব পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখিতে পাই যে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ দেড় লক্ষ পাউণ্ডের ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ভারতের বস্ত্রের এত সমাদর হইতে থাকে যে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীবৃন্দ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের কথা হইল যে ভারতের অনেক বস্তুর সহিত ভারতের বস্ত্র তাহাদের দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ভারতের বর্ব্বর জাতি দৈনিক এক পেনী পারিশ্রমিকে সারাদিন খাটে এবং তাহাদিগকে পুষ্ট করিয়া সুসভ্য খৃষ্টানজাতির ধ্বংসসাধন করা হইতেছে।

১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে। তাহারা হিসাব করিয়া দেখাইতে থাকে যে যে-দামে এক গজ ইংলণ্ডীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়, সেই দামে ভারতীয়েরা তিনটা পূরা পোষাকের কাপড় প্রস্তুত করিতে সক্ষম।

ভারতের সুবিধা

১৬৮০ সাল হইতে ভারতীয় বস্ত্রের সমাদর অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং কোম্পানীর লাভের পরিমাণ তদনুপাতে অধিক হইতে থাকে। ১৬৯৭ হইতে ১৭০২ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৭২৫ পাউণ্ড মূল্যের ভারতীয় বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে আমদানী হইয়া মহাসমস্যার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচুর ভারতীয় বস্ত্র চালান যাইত। ইংলণ্ডের পশমশিল্প দারুণ বিপন্ন হইয়া পড়ে।

এই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। নিজেদের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিয়া যখন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তখন দেশে আইনের আশ্রয় লইতে হইল। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে এক আইন প্রবর্ত্তিত হইল। ভারতীয় বস্ত্রপরিধানকারী ৫ পাউণ্ড এবং বিক্রেতা ২০ পাউণ্ড দণ্ড দিতে বাধ্য হইবে। ইহার ফল আশানুরূপ হইল না।

উদ্ধারের চেষ্টা

অনুরূপ চেষ্টা ভারতেও চলিতে থাকে। তখন আর ইংরাজ নিরীহ ব্যবসায়ী নহে। ভারতের রাজশক্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বিনাশুল্কে বিলাতী (ইংলণ্ডীয়) দ্রব্য বিক্রয়ের "ফারমাণ" লাভ করে। তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই দাবী করিতে থাকে যে তাহারা যে সকল পণ্যের ব্যবসা করিবে, তাহা আর কেহ বিনাশুল্কে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহা লইয়া মিরকাসিমের সহিত তাহাদের বিরোধ বাধে এবং মিরকাসিমের রাজ্যনাশ ঘটে। এই সকল কারণে বাঙ্গলার অন্তর্ব্বাণিজ্যের মহা অকল্যাণ হইল। তাহার পর

এই রাজ-বণিকের দল স্থির করিল যেখানে তাহারা পণ্য ক্রয় করিবে সেখানে তাহাদের কর্ম্মচারী আসিয়া পছন্দ করিয়া ক্রয় করিয়া লইবার পর ব্যবসায়ী অবশিষ্ট বস্ত্র অপরকে বিক্রয় করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য দাম সম্বন্ধে তাহাদের মতামতই চরম। যেখানে বহুপরিমাণ বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, সেখানে চরকার উপর অত্যধিক হারে শুল্ক বসাইয়া দিয়া নিজেদের বিনাশুল্কে আনীত দ্রব্যাদি জোর করিয়া চালাইতে থাকে।

শুল্কের উপদ্রব

১৮১০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্য নূতন করিয়া শুল্ক ধার্য্য হয় এবং কোনও কোনও দ্রব্যের উপর উহা চতুর্গুণ পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। ফলে ঐ সকল দ্রব্যাদি অনতিবৃহৎ পরিসর স্থানে বিক্রীত হইতে থাকে এবং শুল্কের উপদ্রবে বিক্রয়ের বাজার সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। ১৭৯৪ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে আমদানী শুল্কের হার পরিবর্ত্তন হইতে হইতে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে ভারতীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বিনাশুল্কের বাণিজ্যের ব্যাপারে (Free Trade) বিলাতী দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে ভারতে আসিতে পাইত কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের জন্য বিদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভারতীয় কার্পাসবস্ত্রের উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। বিলাতে আসিয়া দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া গেলে মসলিনের উপর শতকরা দশমাংশ, আর ইংলণ্ডে সেই দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে শতকরা ২৭ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স শুল্ক দিতে হইত। ক্যালিকোর উপর আমদানী শুল্ক ৩ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেন্স আর ইংলণ্ডে সেই ক্যালিকো ব্যবহৃত হইলে ৬৮ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেন্স শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতী মাল শতকরা আড়াই টাকা শুল্কে ভারতে আসিত তখন ভারতীয় দ্রব্যের উপর ইংলণ্ডে সাড়ে সতেরো টাকা শুল্ক দিতে হইত।

মিঃ মার্টিনের মতে, কোনও কোনও ভারতীয় দ্রব্যের উপর, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৫০০ হইতে ১০০০ গুণ অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় পণ্যের যে অবস্থা হওয়া উচিত তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই; অর্থাৎ এই সকল অবস্থা পরম্পরায় শিল্প প্রধান দেশ হইতে ভারতকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হয়।

আমদানী রপ্তানীর হিসাব

ভারতের রপ্তানী কি ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে পাঠকের বোধগম্য হইবে। এ বিষয়ে শ্র:দ্ধয় ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকখানির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিলেক্ট কমিটির নিকট মিঃ লারপেণ্ট যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহাতে তিনি নিম্নলিখিত অঙ্ক দাখিল করিয়া প্রমাণ করেন যে ভারতের সমৃদ্ধিশালী শিল্প অতি অন্যায়ভাবে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

	ইংলণ্ড হইতে ভারতে আনীত বস্ত্র গজ	ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত বস্ত্র সংখ্যা
১৮১৪	৮,১৮,২০৮	১২,৬৬,৬০৮
১৮২১	১,৯১,৩৮,৭২৬	৫,৩৪,৪৯৫
১৮২৮	৪,২৮,২২,০৭৭	৪,২২,৫০৪
১৮৩৫	৫,১৭,৭৭,২৭৭	৩,১৬,০৮৬

একধারে যেমন ভারতীয় বস্ত্রাদির উপর শুল্ক প্রয়োজনানুসারে হ্রাস বৃদ্ধি করা হইতে লাগিল, অপরদিকে ভারতীয় তুলা যাহাতে বিনাশুল্কে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে এবং সে কারণে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার

তুলার উপর শুল্ক রদ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে যথাক্রমে ১৮৩৮ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও মদ্রের তুলার শুল্ক রদ করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রমবিস্তার

যাহাতে ভারতে কার্পাসজাত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে লোকে কেবল তুলার চাষ করে এবং বিলাতী মাল ক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহার বিপুল চেষ্টা চলিতে থাকে। ফলে, আমাদের আমদানী যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তুলাজাত বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাস পাইয়া কাঁচা তুলার রপ্তানী সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ইত্যবসরে হারগ্রাভ্‌স্ (Hargreaves) কার্টরাইট (Cartwright) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে যন্ত্রপাতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়া ভারতের পুরাতন শিক্ষা নষ্ট করিল। দেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক নানারকম শুল্ক বর্ত্তমান থাকায় এক স্থানের পণ্য অন্যস্থানে যাওয়ার পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল; আর ইংলণ্ড ব্যতীত যে সকল দেশে ভারতের কার্পাসপণ্য রপ্তানী হইত, ক্রমে ক্রমে ইংরাজ সেই সকল বাজার দখল করিয়া বসিল। ফলে এক কালে যে শিল্প জগতকে চমৎকৃত করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের মুখের অন্নসংস্থান করিত, তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া গেল এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন পরিধেয় বস্ত্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে বাধ্য হইলাম।

যখন বিদেশের বাজার নষ্ট হইতে লাগিল তখনও ভারতের কার্পাস-শিল্প মরে নাই। অন্ন এবং বস্ত্র মানবজীবনের দুইটী প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু; সুতরাং লোকে নিজের ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু বস্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। কিন্তু বিদেশাগত বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক সস্তা হওয়ায় দেশী কাপড় দেশের বাজারেও হটিতে লাগিল। তাহার উপর বিদেশে তৈয়ারী সস্তা সূতা আসাতে চরকার উপর লোকের আর তত আস্থা রহিল না। আগে যেখানে সূতা কাটা এবং তাঁত বোনা দুইটী কাজ লোককে

কর্ম্মরত রাখিত তাহার একটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গেল। লোকে কলের সুতায় কাপড় বুনিতে লাগিল।

যখন ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের আর কোনও আশাই রহিল না, তখন ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের আমদানী শুল্কের হার হ্রাস করা হইল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক শতকরা ৫ এবং সুতার উপর ৩॥০ ধার্য্য হয়; তখন ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের সুতা ও কাপড়ের উপর অনুরূপ শুল্ক বর্ত্তমান ছিল।

ভারতীয় কারখানার অভ্যুদয়

যখন লোকে দেখিল যে কলের বস্ত্রের সঙ্গে আর তাঁতের বস্ত্র প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, তখন এদেশেও লোকে কল চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সন্নিকটে বাউরিয়া কটন মিল্‌স্ কোম্পানী লিঃ (The Bowreah Cotton Mills Company, Ltd.) নামে কল চালাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। আন্দাজ ১৮৩৮ সালে ঐ কল চালু হয়। ১৮৫১ সালে Bombay Spinning & Weaving Co. স্থাপিত হয় এবং দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় বারোটী কল আবির্ভূত হয়। পরের কয় বৎসরের কলের বৃদ্ধির সংখ্যা প্রভৃতি পরিশিষ্টে (ক ৭৪ পৃষ্ঠা) দেওয়া হইল।

(২) কলকারখানার যুগ

সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ভারতবাসী যে অপর সকলের সহিত প্রতিপক্ষতা করিতে পারে তাহার প্রমাণ ভারতের কাপড়ের কল স্থাপনা ও তাহার প্রভূত উন্নতি হইতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ভারতে ৩৮০টী বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৩৮ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ১০১ বৎসরে মাত্র ৩৮০টী কল দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত কিছুই নহে। কিন্তু কতগুলি বিষয়

বিবেচনা করিলে আমাদের এই ধারণা যে সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম কথা, নানা অসুবিধার মধ্যে ভারতের শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। বরাবরই শুল্ক প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পকে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে; এখনও তাহার শেষ হয় নাই। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের লোকে কি পছন্দ করে এবং তাহাদের প্রয়োজন কি, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশীরা অগ্রসর হইয়াছে। J. Forbes Watson, Reporter on the Products of India to the Secretary of State in Council, বিংশ খণ্ডে ভারতের সমস্ত পোষাকের চিত্র সম্বলিত "The Textile Manufactures and the Costumes of the People of India" নামে এক পুস্তক রচনা করেন। তিনি বলেন এই বিংশ খণ্ড "constitute twenty industrial museums" তাহাতে "specimens so prepared as to exhibit working samples" দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক টকলিতে সূতা কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া মসলিন তৈয়ারীর সমস্ত স্তর চিত্রে দেখানো আছে। তাহা ছাড়া যত চিত্র আছে, তাহা গ্রন্থকারের ভাষায় "কয়টী শিল্প প্রদর্শনী" বলিলে হয়। তখন তাহারা ভারতের রুচি অনুযায়ী বস্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে এবং প্রতি ইঞ্চি পরিমাণে আমাদের পোষাকের সমস্ত অংশ দখল করিয়াছে। অবস্থাগতিকে আমরা তখন সুপ্ত।

বিদেশীর কর্ম্ম পদ্ধতি

দূরদৃষ্টি

ইহা ছাড়া তাহারা আরও অন্য উপায় ভাবিয়াছে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে এদেশের তুলার তন্তু দীর্ঘ না হওয়ায় সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী করিতে বিদেশীয় তুলা আমদানী করিতে হয়। পাছে সেইরূপ তুলা আসিয়া দেশে সূক্ষ্ম সূতা হয় সেজন্য

বিদেশী তুলার উপর শতকরা ৫ ভাগ শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হয়।

আমদানী শুল্ক ও Factory Act.

ইহাতেও সুবিধা না হওয়াতে ভারতে বিদেশীয় কারখানা আইন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিদেশী বণিক ব্যবস্থা দিয়াছে। কারখানা আইন (Factory Act) সমর্থনযোগ্য, কিন্তু যে উপলক্ষ্যে তাহা ভারতে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার উদ্দেশ্য খুব সাধু নহে। এ দেশে কারিগর মজুর সস্তা, সুতরাং মজুর যাহাতে বেশী কাজ করিতে না পারে, তাহার জন্যই ভারতে কারখানা আইন বলবৎ করা হইল। বিলাতী বস্ত্র যাহাতে ভারতে বিনা শুল্কে যাইতে পারে তজ্জন্য পার্লামেণ্টে বরাবরই আন্দোলন হইয়াছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মোটা সূতা ও মোটা কাপড়ের উপর এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তূলাজাত সকল দ্রব্যের উপর শুল্ক রহিত করা হয়।

যখন দেখা গেল মোটা সূতা ও কাপড় ভারতীয় মিলে তৈয়ারী হয় এবং তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় বিলাতী কাপড় পারিয়া উঠে না, তখন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মোটা কাপড় ও সূতার উপর আমদানী শুল্ক বসানো হইল; জগতের ইতিহাসে আরও এক নূতন অধ্যায় আসিল অর্থাৎ ভারতীয় মিলে প্রস্তুত ২০নং সূতা বা

ঘরোয়া শুল্ক বা Excise

ততোধিক সূক্ষ্ম সূতার কাপড়ের উপর শতকরা ৫ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৯৬ সালে আরও অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। যে সকল সূতা বা বস্ত্রের সহিত লাঙ্কাসায়ারের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, অর্থাৎ মিহি বা মোটা নির্ব্বিচারে সকল মিলজাত বস্ত্রর উপর সাড়ে তিন টাকা excise

duty ধরা হইল। আমদানী শুল্কও কমাইয়া অনুরূপ করা হইল।*

এই অদ্ভুত আইন ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। এই সময় মিল মালিকেরা নিজেদের খরচ কমাইবার উদ্দেশ্যে মজুরদের কাজ এবং মজুরির হার কমাইয়া দেন; তাহার ফলে বোম্বাই মিলগুলিতে ভীষণ ধর্ম্মঘট চলিতে থাকে এবং ব্যবসায়ের বিপুল ক্ষতি হয়। তখন মালিকেরা ভারতসরকারকে চাপ দেওয়ায় শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। যুদ্ধের সময় হইতে কত টাকা ঘরোয়া শুল্ক আদায় হইয়াছে, তাহার পরিমাণ পরিশিষ্টে (খ) পাওয়া যাইবে।

ভারতের সুযোগ

এই দারুণ দুর্ব্বিপাকের মধ্যেও আজ ভারতের মিল গড়িয়া উঠিতেছে। আজ ভারতবাসী পরিধেয় বস্ত্রের অনেকখানি নিজে তৈয়ারী করিয়া লইতেছে। যে দেশের কার্পাস শিল্প এক কালে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে দেশে তুলা ও কল চালাইবার কয়লা প্রচুর, সস্তার মজুর এবং বিরাট বাজার, সে দেশে শিল্পের উন্নতি না হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

---

* শ্রদ্ধেয় ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন:

"It taxed the coarse Indian fabrics with which Manchester had never competed and never could compete. It threw a burden on Indian mills which competed with no mills in Europe. It raised the price of poor man's clothing in India without the pretext of relieving the poor man of Lancashire"

"As an instance of fiscal injustice the Indian Act of 1896 is unexampled in any civilized country in modern times. Most civilized governments protect their home industries by prohibitive duties on foreign goods. In India where an infant industry required protection.........no protection was given."

ভারতে এখনও চৌদ্দ কোটী টাকার কার্পাসজাত দ্রব্যাদি আসে; তন্মধ্যে কেবল কাপড় প্রভৃতিই সওয়া দশ কোটী টাকার, সূতা প্রায় তিন কোটী টাকার, সেলাইয়ের সূতা ৪৬ লক্ষ টাকার, আর মোজা গেঞ্জি জাতীয় বস্ত্র সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকার; পরিশিষ্ট (গ) দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে আমদানীর অতীত ইতিহাস কিছু জানা প্রয়োজন। ১৯১৯-২০ হইতে ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে সওয়া ৭৩ কোটী টাকার তূলা-জাতদ্রব্য ভারতে আসিয়াছে। তন্মধ্যে ১৯২০-২১ সালে ১০২ কোটী টাকায় পৌঁছিয়াছিল; ইহার ভিতর একা ইংরাজের অংশ ৮১ কোটী টাকা!* পরের ৫ বৎসরে গড়ে সওয়া ৬৮ কোটী টাকায় দাঁড়ায়, তাহার পর হইতে কমিয়াছে। মুদ্রা বিনিময়ের হারের বিশেষ তারতম্য এই হ্রাসের অন্যতম কারণ বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু নিরুপদ্রব অসহযোগ (Non-violent Non-co-operation Movement) আন্দোলন, ইহার প্রধান কারণ। আমদানী হ্রাসের পরিমাণ পরিশিষ্টে (ঘ—১ ও ২) দেওয়া হইল।

বাণিজ্য-কার্পাসজাত দ্রব্যাদি

জাতীয়তা আন্দোলনের প্রভাবে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের ৬০ কোটী টাকা হইতে আমদানীর পরিমাণ পর বৎসর সওয়া পঁচিশ কোটী টাকায় নামিয়া আসে। টাকা হিসাবে ১৯২০-২১ সালই, সূতা এবং বস্ত্রাদি, উভয়ের জন্যই সর্ব্বপ্রধান। ঐ সালে সূতার দাম ১৩ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা (৪ কোটী ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড) এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ৮৮ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা, (তন্মধ্যে কাপড় প্রভৃতি, piecegoods, ১৫১ কোটী ১৫ লক্ষ গজ) ছিল। কিন্তু

আমদানী হ্রাস

* এই সঙ্গে জাপান ১৫ কোটী, নেদারল্যাণ্ড দেড় কোটী, ইটালী ১ কোটী ৩৬ লক্ষ, আমেরিকা ১ কোটী, বেলজিয়ম ৭৩ লক্ষ টাকার মাল দিয়াছে।

পরিমাণ হিসাবে, ১৯২২-২৩ সালের, ৫ কোটী ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড সূতার (৯ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা) এবং ১৯১৩-১৪ সাল ৩১৯ কোটী ৯৪ লক্ষ গজ কাপড় বা piecegoods প্রভৃতির (৬২ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা)* সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ।

আমদানী হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মিল সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম কল স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এ শিল্প অধিক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ১৮৫১ সাল নাগাদ আবার নূতন করিয়া চেষ্টা চলিতে থাকে এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আরও ১০টী মিল স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দেই ভারতের মিলের কার্য্যারম্ভ হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নূতন করিয়া প্রথম মিল স্থাপিত হইলেও তাহার কাজ আরম্ভ হয় নাই। কি ভাবে মিল প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা পরিশিষ্ট (ক) হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমানে (১৯৩৮) মিল সংখ্যা ৩৮০। এই সংখ্যা হইতে সহজেই অনুমান হয় যে ভারতে কারখানা শিল্প ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে।

মিলের প্রসার প্রধান কারণ

১৯০৬ হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে ৬৬টী নূতন মিল স্থাপিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনে দেশী মিলের বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আবার নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের ফলে, ১৯২১-২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৮৪টী নূতন মিল স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতে মিলের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বিশেষ কমিতে থাকে। কি ভাবে এই আমদানী হ্রাস পাইয়াছে, পরিশিষ্টে (খ) দেওয়া হইয়াছে। যেমন একদিকে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী

* এই টাকার মধ্যে কাপড় প্রভৃতি ছাড়া অন্য দ্রব্যাদির দাম ও ধরা আছে; তাহার আনুমানিক মূল্য আড়াই কোটী টাকা।

কমিয়াছে, অপর দিকে ভারতের মিলের সূতা ও বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ৪২৬ কোটী ৯৩ লক্ষ গজ এবং সূতার পরিমাণ ১৩০ কোটী ৩২ লক্ষ পাউণ্ড। মিলগুলিতে উৎপন্ন সূতা ও বস্ত্রের পরিমাণ কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা পরিশিষ্ট (ঙ) হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে মিলে অধিক মাত্রায় তুলার প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতের তুলায় সূক্ষ্ম সূতা করিবার অসুবিধা আছে বলিয়া বিদেশী তুলা আমদানী করা হয়। সেই সঙ্গে এ দেশীয় ব্যবহৃত তুলার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহা কতকটা শুভ লক্ষণ। কারণ বিদেশীয়রা আমাদের তুলা না লইলে যে আমাদের সমূহ বিপদ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের কলে ১ কোটী ২৮ লক্ষ হন্দর তুলা লাগে (১৯৩৭-৩৮); তন্মধ্যে ভারতীয় তুলা প্রায় ১ কোটী হন্দর। ১৯৩০-৩১ সালের পূর্ব্বে ভারতের মিলে কত পরিমাণ কেবল ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইত তাহার স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইত না। তাহার পর হইতে কয় বৎসর কলে ব্যবহৃত মোট তুলা এবং তন্মধ্যে ভারতীয় তুলার পরিমাণ পরিশিষ্টে (চ) দেওয়া হইল।

ভারতীয় তুলার ব্যবহার

এখন ভারতীয় কলে এবং তাঁতে যে সূতা ব্যবহৃত হয়, তাহার শতকরা ৯৫ বা তদূর্দ্ধ ভাগ কেবল ভারতের মিলে প্রস্তুত হইতেছে। কাপড়ের অবস্থা তত ভাল না হইলেও আশাপ্রদ বলা যাইতে পারে; মোটামুটী আন্দাজ শতকরা আশী ভাগ ভারতের কলে প্রস্তুত হইতেছে। শতকরা কুড়ি ভাগের পরিমাণ যে কতখানি হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

দেশীয় বস্ত্রাদির অনুপাত

ভারতের কাপড় যাহা রপ্তানী হইত সে সমস্তই তাঁতের কাপড়। তাহার পর তাঁতের এবং মিলের কাপড় উভয়ে মিলিয়া রপ্তানী হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে টাকার হিসাবে ১৯১৯-২০ সালই এ বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। সূতা (১৫ কোটী ১৯ লক্ষ পাউণ্ড) এবং বস্ত্রাদি (১৯ কোটী ৬৬ লক্ষ গজ) যথাক্রমে ১৮ কোটী ২৬ লক্ষ এবং ৯ কোটী সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়াছিল। পরিমাণ হিসাবে, ১৯০৫-৬ সালে সূতা, ২৯ কোটী ৭৬ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ড (১২ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা) এবং ১৯১৬-১৭ সালে বস্ত্রাদি ২৬ কোটী ৩৮ লক্ষ ৪৫ হাজার গজ (৫ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পরিশিষ্টে (ছ) রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হইল।

দেশীয় বস্ত্রাদি রপ্তানী

সূতার রপ্তানী বহুদিন পর্য্যন্ত আমদানী অপেক্ষা কমই ছিল। কিন্তু ১৮৮২-৮৩ সালে ইহা প্রায় সমান সমান হইয়া যায়, রপ্তানী ৪ কোটী ৫৪ লক্ষ পাউণ্ড এবং আমদানী ৪ কোটী ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড। তাহার পর হইতে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। ১৮৯১-৯২ সালে রপ্তানী ১৬ কোটী ২৯ লক্ষ পাউণ্ড আর আমদানী ৫ কোটী ৪ লক্ষ পাউণ্ড। এই অবস্থা ১৯২১-২২ সাল পর্য্যন্ত চলে; তখন রপ্তানী ৮ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আমদানী ৫ কোটী ৭১ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ১৯২২-২৩ সালে রপ্তানী ৫ কোটী ৬৯ লক্ষ পাউণ্ড আর আমদানী ৫ কোটী ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড হয়। তাহার পর হইতে বরাবরই আমদানীর পরিমাণে আধিক্য রহিয়াছে।

চীনারা আমাদের প্রধান খরিদ্দার ছিল। তাহারা নিজে সূতা প্রস্তুত আরম্ভ করে এবং জাপান ঐ বাজার দখল করিবার ফলে এই অবস্থা দাঁড়ায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্ম বিচ্ছেদের ফলে পুনরায় রপ্তানী ও

আমদানীর অঙ্ক সম পরিমাণ হইয়া পড়ে। পরিশিষ্ট (ঘ-২ ও ছ) হইতে ইহার কতকটা ধারণা করা যাইবে।

বর্ত্তমানে (১৯৩৮-৩৯) সূতা ও কাপড় প্রভৃতি রপ্তানী আছে; কিন্তু পরিমাণ বা মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। সূতা ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড (মূল্য ১ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা) এবং বস্ত্রাদি ১৭ কোটী ৬৯ লক্ষ ৯২ হাজার গজ (৪ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা) রপ্তানী হইয়াছে। সূতার ৩৩·৪% এবং বস্ত্রাদির ৫০% ব্রহ্মদেশ ক্রয় করিয়া থাকে। হংকঙ, ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সূতা বেশী রপ্তানী হয়। বস্ত্রাদির জন্য ভারতীয় দ্রব্যের বাজার হিসাবে সিংহলকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যাইতে পারে; পরিশিষ্ট (জ ও ঝ)।

ভারতের মিলের অবস্থান

ভারতে মিলগুলি সকল প্রদেশে সমানভাবে স্থাপিত হয় নাই। বোম্বাই প্রদেশ এ বিষয়ে সকলকে পরাস্থিত করিয়াছে। যদিও বাঙ্গলায় কলিকাতার সন্নিকটে ভারতের প্রথম মিল স্থাপিত হয়, তথাপি এ বিষয়ে বাঙ্গলা বোম্বাই প্রদেশের বহু পিছনে পড়িয়া আছে। বোম্বাই প্রদেশের পার্শীদের অর্থ ও শিল্প প্রতিভা ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। বোম্বাই প্রদেশে তূলা বেশী মাত্রায় উৎপন্ন হয় এবং কয়লার সুবিধা বাঙ্গলাদেশে অধিক হইলেও, তাহারা বিদেশী কয়লা ব্যবহার করে। কয়লার বিষয়ে বাঙ্গলার বিশেষ সুবিধা এবং দামও সস্তা, কিন্তু প্রায় আর সকল বিষয়ে সে পিছাইয়া আছে।

বলা বাহুল্য, বস্ত্র এবং সূতা প্রস্তুত এবং রপ্তানীর হিসাবে বোম্বাই প্রদেশের স্থান সর্ব্বপ্রধান। সমস্ত ভারতীয় সূতার অর্দ্ধেক এবং বস্ত্রাদির তিন ভাগের দুইভাগ বোম্বাই প্রদেশে প্রস্তুত হয়। মিলের শতকরা ৫৬·৭৭, মূলধনের ৫৫·৮, টাকু সংখ্যার ৬০·৮, তাঁতের ৭০·২, ভারতে মোট

ব্যবহৃত তুলার ৫৫.৮, মোট মজুর সংখ্যার ৫৮.৮% বোম্বায়ের অংশে পড়ে। সে স্থলে বাঙ্গলার ভাগে মিল সংখ্যা ৭.৩%, মূলধনের ৫.৭%, টাকুর ৪.১%, তাঁতের ৪.৬%, তুলার ৩.২%, মজুরের ৩.৮%, বস্ত্রাদির ৪.৮%এবং সূতার ৩.৫% পড়ে।

বোম্বাই ও বাঙ্গলার অংশ

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মোট মিল ৩৮০, মূলধন ৪০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা, টাকু সংখ্যা ১ কোটী ২০ হাজার, তাঁত ২ লক্ষ, দৈনিক মজুরের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার। প্রস্তুত সূতা ১৩০ কোটী ৩২ লক্ষ পাউণ্ড এবং বস্ত্রাদির পরিমাণ ৪২৬ কোটী ৯৩ লক্ষ গজ।

সূতা এবং প্রস্তুত কাপড়ের হিসাব দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) বৃটিশ ভারত ও (২) করদ রাজ্যসকল ও ইংরাজ ব্যতীত অপর বিদেশী রাজ্য। শেষোক্ত অংশে ইন্দোর, মহীশূর, বরোদা, নন্দগাঁ, ভবনগর, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, কোলাপুর, কোচিন, রাজকোট, রাটলাম, কচ, পোরবন্দর, ত্রিবাঙ্কুর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি পড়ে।

বৃটিশ ভারতে সূতার অংশ পড়ে ৮৪.৭% (১১০ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড), আর করদ প্রভৃতি রাজ্যে ১৫.৩% (১৯ কোটী ৯২ লক্ষ পাউণ্ড) এবং বস্ত্রাদিতে যথাক্রমে ৮৪% (৩৫৮ কোটী ৩০ লক্ষ গজ) ও ১৬% (৬৮ কোটী ৬২ লক্ষ গজ) পড়ে; পরিশিষ্ট (এ৩) দ্রষ্টব্য।

তাঁতের বস্ত্র দিয়া ভারত একদিন জগতের শত শত লোকের অঙ্গাবরণ করিয়াছে, কারু ও শিল্প কার্য্য দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। এখন কলকারখানার শব্দে হাতের তাঁতের "ঠকঠকানি" চাপা পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু আজও যে তাহা লোপ পায় নাই, তাহারই কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

ভারতের তাঁত

বলিলে আজ লোকে বিশ্বাস করিবে না যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

ভারতের কল অপেক্ষা তাঁতে বেশী কাপড় প্রস্তুত হইত। তাহার পর হইতে তাঁতের ক্রমেই অবনতি ঘটিতে থাকে। ঐ সালেই আন্দাজ ১১১ কোটী ৬০ লক্ষ গজ কাপড় তাঁতে বোনা হইয়াছে, তখন মিলে মাত্র ৮২ কোটী ৪০ লক্ষ গজ কাপড় হইয়াছে। ১৯২০-২১ পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে, তাহার পর আবার তাঁতের চলন অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে যেখানে ২০ কোটী পাউণ্ড সুতা তাঁতে লাগিত সেখানে উহা ৩০ কোটী পাউণ্ডে পৌছায়। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁতে ৩৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা লাগে এবং ১৪০ কোটী ৪০ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষে, আন্দাজ ১৬৬ কোটী গজ কাপড় বোনা হইয়াছে। মিলে ঐ সালে কিঞ্চিদধিক ৩৫০ কোটী গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছিল।

বস্ত্রাদির পরিমাণ

বর্ত্তমানে ভারতের মোট ব্যবহারের সমস্ত কাপড়ের শতকরা ৫০ ভাগ ভারতের মিলে, ২৭ ভাগ তাঁতে উৎপন্ন হয়। বাকী বিদেশ হইতে আসে। সুতরাং তাঁত লোপ পাইয়াছে, এ কথা মনে করা নিতান্ত ভুল। ভারতে প্রস্তুত মোট কাপড়ের শতকরা ৪০ ভাগ তাঁত হইতে পাওয়া যায়। তাঁত মরিতে পারে না, কারণ কয়েক রকমের বস্ত্র আছে, তাহা তাঁতে প্রস্তুত করা সহজ এবং সুলভ।

তাঁতে মূলধন লাগে সামান্য, অলস ভাবে বসিয়া থাকাকালীন কাজ চালানো যায়, যখন তখন ইচ্ছামত কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে মন দেওয়া যায়, পরিবারবর্গের সাহায্য লাভ করা যায়। এই সব ও অন্যান্য কারণে তাঁত ভারতবর্ষে টিকিয়া আছে ও থাকিবে। সামান্য উন্নতি সাধিত হইলে ভারতবর্ষের তাঁত বহু লোকের অন্নসংস্থান করিবে এবং আবার ভারতের মিহি কাপড়, মসলিন প্রভৃতি জগতে সমাদর লাভ করিবে।

তাঁতের সুবিধা

পরিশিষ্ট

(ক)

ভারতে মিল সংখ্যা

	মিল সংখ্যা	টাকু হাজার	তাঁত হাজার
১৮৫১	(?)	...	...
১৮৬১	১২	৩,৩৮	
১৮৬৬	১৩		
১৮৭৬	৪৭		
১৮৭৯	৫৮	১৫,০০	
১৮৮৬	৯০	২২,০১	১৭
১৮৯৭	১৭৩	৪০,৬৬	৩৭·৬
১৯০০	১৯৩	৪৯,৪৬	৪০·১
১৯০৫	১৯৭	৫১,৬৩	৫০·১
১৯১০	২৬৩	৬১,৯৬	৮২·৭
১৯১৫	২৭২	৬৮,৪৯	১,০৮·০
১৯২০	২৫৩	৬৭,৬৩	১,১৯·০
১৯২২	২৯৮	৭৩,৩১	১,৩৪·৬
১৯২৩	৩৩৬	৭৯,২৮	১,৪৪·৮
১৯২৫	৩৩৭	৮৫,১১	১,৫৪·৩
১৯৩০	৩৪৮	৯১,২৫	১,৭৯·২
১৯৩৫	৩৬৫	৯৮,৮৫	১,৯৮·৯
১৯৩৭	৩৭০	৯৭,৩১	১,৯৭·৮
১৯৩৮	৩৮০	১,০০,২০	২,০০·২

(খ)

ভারতে প্রস্তুত কার্পাসজাত দ্রব্যের উপর

ঘরোয়া শুল্ক (Excise)

১৯১৪-১৫—১৯২৫-২৬

	ব্রিটিশ ভারতে মিল হইতে হাজার টাকা	করদ রাজ্য মিল হইতে হাজার টাকা
১৯১৪-১৫	৪৯,৩২	২,৩৩
১৯১৫-১৬	৪৮,৪০	১,৯০
১৯১৬-১৭	৪৩,৮০	২,৪৭
১৯১৭-১৮	৭৫,৪৫	৩,৮৫
১৯১৮-১৯	১,৩৬,৭৯	৫,০৮
১৯১৯-২০	১,৫২,৫৫	৮,৯১
১৯২০-২১	২,২৮,৭২	৯,৬৬
১৯২১-২২	২,১২,২৮	১০,০৮
১৯২২-২৩	১,৭৪,২২	১১,৫৪
১৯২৩-২৪	১,৩৮,৫১	১১,৬৭
১৯২৪-২৫	২,১২,২৬	১৬,২০
১৯২৫-২৬	১,৩৫,৬০	১৫,০৪

১৯২৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে এই শুল্ক আদায় স্থগিত রাখিয়া পরে ঐ বৎসরই ১৮৯৬ সালের ২ আইন রদ করিয়া দিলে, এই শুল্ক আদায় বন্ধ হইয়া যায়।

(গ)

আমদানী—কাপাসজাত দ্রব্যাদির পরিমাণ ও প্রত্যেকের অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

মোট—১৪,১৫,২৭,১৬৭ টাকা

	হাজার টাকা	মোট হাজার টাকা	শতকরা অংশ
সূতা	...	২,৯২,৯১	২০'৭
কোরা	১,৫৭,১৯		
ধোয়া	১৯,১০		
mercerised	১,১১,৩০		
রঞ্জিত	৫,০৯		
রুমাল প্রভৃতি		৪,২৩	'৩
গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি		১৭,৫৩	১'২
কাপড় প্রভৃতি (piecegoods)		১০,২৭,৪৫	৭২'৬
কোরা	৩,০৬,৭৪		
ধোয়া	৩,৩০,২৬		
ছাপানো	২,০৬,০৩		
রঞ্জিত	১,৫২,৮৫		
অন্যান্য	...		
সেলায়ের সূতা প্রভৃতি		৪৬,৪৩	৩'২
দড়ি	...	৬,৮৯	'৪৮
অপরাপর	...		১'৫২

(ঘ—১)

আমদানী—সূতা ও কার্পাস দ্রব্যাদি

১৮৪৯-৫০ হইতে ১৯৩৮-৩৯ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কয় বৎসরের মূল্য

	সূতা (twin & yarn) হাজার টাকা	কার্পাস দ্রব্যাদি (other cotton manufactures)* হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০	১,৬৯,৭৪	৫,০৫,৭৪
১৮৫৪-৫৫	১,৯১,১১	৮,১০,৪৯
১৮৫৯-৬০	৩,০৭,০৭	১৪,৪৭,৭৭
১৮৬৪-৬৫	৩,৩৮,৭২	১৬,৫৫,৩৮
১৮৬৯-৭০	৪,০৭,৩১	২০,৩৩,৩৮
১৮৭৪-৭৫	৪,৭৩,৬৭	২৪,৩৯,৫৩
১৮৭৯-৮০	২,৭৪,৫৩	১৬,৯১,৫৫
১৮৮৪-৮৫	৩,৩৬,০৪	২১,১৯,৭৪
১৮৮৯-৯০	২,৪৮,২৫	২৬,৩৯,১৩
১৮৯৪-৯৫	২,৮৫,১২	২৯,৮২,২৪
১৮৯৯-০০	২,৪৫,০০	২৭,০০,২১
১৯০৪-০৫	২,৪৮,৭৬	৩৫,৫৫,৯২
১৯০৯-১০	৩,১৯,৯৬	৩৬,০৬,৪৫
১৯১৩-১৪	৪,১৬,৪০	৬২,১৩,৪৫
১৯১৪-১৫	৩,৮৫,২০	৪৫,১৪,৭০
১৯১৮-১৯	৮,৮৬,৬৩	৫৮,৬১,৮৫
১৯২০-২১	১৩,৫৭,৮৩	৮৮,৫৪,১৭
১৯২১-২২	১১,৫১,২২	৪৫,৪২,৪৯

(অনুসৃত)

	হাজার টাকা	হাজার টাকা
১৯২২-২৩	৯,২৫,৮৫	৬০,৮৭,১৭
১৯২৪-২৫	৯,৬৬,৩১	৫৯,৫৪,৭০
১৯২৯-৩০	৫,৯৯,৮৬	৫৩,৪৮,৮৭
১৯৩০-৩১	৩,০৭,৩৮	২২,১৭,২৩
১৯৩৪-৩৫	৩,০৯,৮৬	১৮,৬৬,৩২
১৯৩৬-৩৭	২,৫৪,৮৭	১৪,৯৩,৪৩
১৯৩৭-৩৮	২,৫০,৭৪	১৩,০৪,৫৫
১৯৩৮-৩৯	২,৯২,৯১	১১,২২,৩৬

* যথা, কাপড় প্রভৃতি, কার্পাস ও নকল রেশম মিশ্রিত বস্ত্রাদি, সূতা দড়ি, সূতার কম্বল প্রভৃতি এবং ইহাদের সম্মিলিত মূল্য দুই হইতে আড়াই কোটী টাকা।

(ঘ—২)

আমদানী—সূতা ও কাপড় (piecegoods)

১৮৬৪-৬৫ হইতে ১৮৩৮-৩৯ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কয়বৎসরের পরিমাণ

	সূতা (twist & yarn) হাজার পাউণ্ড	কাটা কাপড় (piecegoods) হাজার গজ
১৮৬৪-৬৫	১,৭৯,০২	
১৮৬৯-৭০	৩,১৬,৯৩	৯১,৯৬,৩৭
১৮৭৪-৭৫	৩,৭০,৯৭	১০৩,৯০,৩৬
১৮৭৯-৮০	৩,৩২,১৩	১৩৩,৩৭,৪১
১৮৮৪-৮৫	৪,২৮,০০	১৭৩,৪০,৯৮

(অনুসৃত)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার গজ
১৮৮৯-৯০	৪,৬৩,৮৩	১৯৯,৭২,৩৩
১৮৯৪-৯৫	৪,১৪,৮২	২২৫,৯৪,২৭
১৮৯৯-০০	৪,২৬,২২	২১৯,৪০,৮৮
১৯০৪-০৫	৩,০৫,৭৬	২২৮,৮৩,৮১
১৯০৯-১০	৪,০৩,০০	২১৯,৪৭,৩৪
১৯১৩-১৪	৪,৪১,৭১	৩১৯,৯৪,১০
১৯১৪-১৫	৪,২৮,৬৪	২৪৪,৭২,৫৮
১৯১৮-১৯	৩,০০,৯৫	১১২,৭৮,৬৩
১৯২০-২১	৪,৭৩,৩৩	১৫১,১৪,৫৫
১৯২১-২২	৫,৭১,৭৫	১৫১,১৪,৫৫
১৯২২-২৩	৫,৯২,৭৪	১৫৯,৩২,০৫
১৯২৪-২৫	৫,৫৯,০৭	১৮২,৩২,৪০
১৯২৯-৩০	৪,৩৮,৮২	১৯১,৯৩,৪৭
১৯৩০-৩১	২,৯১,৩০	৮৯,০০,৩০
১৯৩৪-৩৫	৩,৪০'২২	৯৪,৪০,০০
১৯৩৬-৩৭	২,৮৫,২০	৭৬,৪০,০০
১৯৩৭-৩৮	২,১৯,৯৮	৫৯,০৮,০০
১৯৩৮-৩৯	৩,৬৪,৫৯	৬৪,৭২,৬৪

(ঙ)

ভারতীয় মিলে প্রস্তুত সূতা ও বস্ত্রাদির পরিমাণ

	সূতা	কাপড়
	হাজার পাউণ্ড	হাজার পাউণ্ড
১৮৯৫-৯৬	৪৩,২০,০০	
১৮৯৯-০০	...	৯,৫০,০০
১৯০২-০৩	৫৭,৫০,০০	১১,৭০,০০

(অনুসৃত)	সূতা হাজার পাউণ্ড	বস্ত্রাদি হাজার পাউণ্ড
১৯০৪-০৫	৫৭,৮০,০০	১৫,২০,০০
১৯০৫-০৬	৬৮,০০,০০	১৬,৩০,০০
১৯০৯-১০	৫৯,৩৪,০০	২১,৫৪,৬১
১৯১৪-১৫	৬১,৩৭,৫৭	২৫,৮১,৮০
১৯১৯-২০	৬৩,৫৭,৬০	৩৭,৩৮,৪৭
১৯২৪-২৫	৭১,৯৩,৯০	৪৫,৮৮,৪০
১৯২৯-৩০	৮৩,৩৫,৬০	৫৬,১৬,৩৪
১৯৩০-৩১	৮৬,৭২,৭৮	৫৯,০৩,৫৮
১৯৩১-৩২	৯৬,৬৩,৭৩	৬৭,২২,৫৮
১৯৩৪-৩৫	১০০,১৪,২০	৭৩,৬৬,৪৯
১৯৩৫-৩৬	১০৫,৯২,৮৭	৭৬,১০,৭৪
১৯৩৬-৩৭	১০৫,০৬,৩৬	৭৮,১৮,১৪
১৯৩৭-৩৮	১১৬,০৭,১৬	৮৬,৪২,০৫
১৯৩৮-৩৯	১৩০,৩২,৪৬	৯২,০৪,৭৬

(ভারতীয় মিলে প্রস্তুত) বস্ত্রাদি—গজ হিসাবে

১৯৩৪-৩৫	...	৩৩৯ কোটী	৩৪	লক্ষ গজ
১৯৩৫-৩৬	...	৩৫৭ ,,	১৫	,, ,,
১৯৩৬-৩৭	...	৩৫৭ ,,	২০	,, ,,
১৯৩৭-৩৮	...	৪০৮ ,,	৪৩	,, ,,
১৯৩৮-৩৯	...	৪২৬ ,,	৯৩	,, ,,

(চ)

১৯৩০-৩১ হইতে ভারতের মিলে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ

	মোট	ভারতীয় তূলা*
	হন্দর	হন্দর
১৯৩০-৩১	৯২,১৬,১১৬	৮০,৭৬,৪০০
১৯৩১-৩২	১,০১,৮৯,৪২৪	৮৩,৬৩,২০০
১৯৩২-৩৩	৯৯,৩০,০৫৩	৮৪,৮৯,০০০
১৯৩৩-৩৪	৯৪,৬৩,৯৬৫	৯৯,৫৬,০০০
১৯৩৪-৩৫	১,০৯,৩১,৯৪৯	৯১,২০,০০০
১৯৩৫-৩৬	১,১১,৩৪,৯৬৩	৯৩,২০,০০০
১৯৩৬-৩৭	১,১০,১৩,৬৩২	৯৩,১০,০০০
১৯৩৭-৩৮	১,২৮,১৯,২৬৮	১,০২,৩৭,৫০০
১৯৩৮-৩৯	...	১,১০,১৪,০০০

(ছ)

রপ্তানী—সূতা ও বস্ত্রাদি—১৮৯১-১৮৯২ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

	সূতা		কার্পাসজাত	কাপড়ের
	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	দ্রব্যাদির মূল্য হাজার টাকা	(piece goods) হাজার গজ
১৮৯১-৯২	১৬,২৯,০২	৫,৮৮,৪৭	৩,০৮,১২	১৬,৮২,৬২
১৮৯৪-৯৫	১৬,০৬,০৬	৫,৭৮,৩৬	৩,৬০,০০	৮,৫৬,৫৩
১৮৯৯-০০	২৪,০৬,৯৩	৬,৯০,২২	১,৩৭,১৯	৬,৯৫,৫৬
১৯০৪-০৫	২৪,৭৮,৫৫	৯,৮১,৫৭	১,৮২,৭৫	৮,৭৪,৭১

* "Monthly Survey of Business Conditions in India" হইতে গৃহীত। Indian Central Cotton Committee কর্তৃক প্রকাশিত "Supply and Distribution of the various Types of Indian Cotton" পুস্তিকায় প্রদত্ত সংখ্যার সহিত ইহার পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভারতের বাহিরে প্রথমোক্ত পুস্তকের হিসাব গৃহীত হইয়া থাকে।

(অনুসৃত)

	সূতা হাজার পাউণ্ড	সূতা হাজার টাকা	কার্পাসজাত দ্রব্যাদির মূল্য হাজার টাকা	কাপড়ের (peice goods) হাজার গজ
১৯০৫-০৬	২৯,৭৬,৩৪	১২,৩৮,৭৭	২,০৩,৭৮	৯,১৯,৯৪
১৯০৯-১০	২২,৭৩,৬৪	৯,৭০,৯১	২,২০,৬৫	৯,৪১,৬৭
১৯১৪-১৫	১৩,৩৬,১৯	৬,২৮,৬৫	১,৭২,৪০	৬,৭১,৯৪
১৯১৬-১৭	১৬,৮৯,৮০	৭,৪৯,৮৯	৫,২৬,১০	২৬,৩৮,৪৫
১৯১৯-২০	১৫,১৮,৭০	১৮,৮৫,৯২	৯,১৫,৪১	১৯,৬৫,৫৪
১৯২৪-২৫	৩,৬৫,৩২	৩,৭০,১১	৭,৫৭,৩৬*	১৮,১৫,১১
১৯২৯-৩০	২,৪৫,৭০	১,৯০,২৪	৫,২৮,৪৩*	১৩,৩৪,২৬
১৯৩৫-৩৬	৯৬,৬৮	৪৬,৯৪	২,৪৫,৭৮	৭,১২,৫০
১৯৩৬-৩৭	১,২১,৭৩	৫৮,৬২	৩,১৯,৮১	১০,১৬,৩৬
১৯৩৭-৩৮	৪,০১,২৪	২,০২,৫৪	৭,২৬,৭৭	২৪,১২,৫৫
১৯৩৮-৩৯	৩,৭৯,৬০	১,৮৭,৮১	৫,২৩,৯৮	১৭,৬৯,৯২

রপ্তানী—১৮৪৯ সাল হইতে ১৮৬৪-৬৫ পর্য্যন্ত সূতা ও অন্যান্য কার্পাসজাত দ্রব্যের মূল্য

		হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০	...	১,১১,৩৫
১৮৫৪-৫৫	...	১,২২,৫৭
১৮৫৯-৬০	...	১,১৪,৫৪
১৮৬৪-৬৫	...	১,৫৬,৫৯

রপ্তানী—১৮৬৬-৬৭ হইতে ১৮৮৯-৯০ পর্য্যন্ত সূতা ও কার্পাস দ্রব্যের স্বতন্ত্র মূল্য

	সূতা হাজার টাকা	কার্পাস দ্রব্যাদি হাজার টাকা
১৮৬৬-৬৭	১৪,৩৩	১,৫৯,৩৫
১৮৬৯-৭০	১৮,৩৯	১,৭৬,৪২

* মাত্র কাপড়ের (Piece goods) মূল্য

(অনুসৃত)

	সূতা হাজার টাকা	কার্পাস দ্রব্যাদি হাজার টাকা
১৮৭৪-৭৫	৩০,৫৭	২,১৩,৯৮
১৮৭৯-৮০	১,১৬,৩৯	১,৫৭,৪০
১৮৮৪-৮৫	২,৫০,৬৬	২,০৮,০০
১৮৮৯-৯০	৫,৮৪,০১	২,৭৩,৩৪

(জ)

রপ্তানী—সূতা—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

মোট ৩,৭৯,৬০,০০০ পাউণ্ড ; ১,৮৭,৮১,০০০ টাকা

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	৭২,৭৬	৩৩'৪
হংকঙ	৪১,৩০	২১'৯
ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেল্‌মেন্টস্	২৯,০৬	১৫'৪
সিরিয়া	১৬,৬৩	৮'৮

শ্যাম, এদেন, ইরাক প্রভৃতি।

(ঝ)

রপ্তানী—বস্ত্রাদি—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

মোট—১৭,৬৯,৯১,৯৬৮ গজ ; ৪,৭৯,৩৭,৮৯০ টাকা

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	২,৩৮,৮৩	৪৯'৮
সিংহল	৬৬,২১	১৩'৮
ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্	৫২,১৬	১০'৮

(অনুসৃত)

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
নাইজিরিয়া	১২,৬১	২'৬
মালয়	৯,৯২	২'০৬
ইরাক	৯,০২	১'৮

মরিসস্, আরব, এদেন প্রভৃতি।

(ঞ)

(১৯৩৮-৩৯)

ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি ও সূতার পরিমাণ ও প্রতি প্রদেশের শতকরা অংশ

মোট কাপড়— ৪২৬,৯২,৬৯,৪৯৯ গজ

সূতা— ১৩০,৩২,৪৫,৯০২ পাউণ্ড

	বস্ত্রাদি লক্ষ গজ	%	সূতা লক্ষ পাউণ্ড	%
বোম্বাই	২৭৮,৩০	৬৫'২	৬৪,৭৭	৪৯'৭
মদ্র	৭,৮৫	১'৮	১৬,৮৮	১২'৯
বাঙ্গলা	২০,৬২	৪'৮	৪,৫৭	৩'৫
যুক্তপ্রদেশ	২৩,৮৮	৫'৬	১১,৭৭	৯'০
আজমীর মাড়োয়ার	২,৯০	'৬	১,৫১	১'০
পঞ্চনদ	৫,৯৪	১'২	১,৫৭	১'২
দিল্লী	৯,৪৫	২ ২	৩,০৯	২'৩
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৯,১৫	২'১	৫,৯৬	৪'৫
বিহার	২১	...	২৮	'২
করদ রাজ্য	৬৮,৬২	১৬'১	১৯,৯২	১৫'৬

পশম বা পশুলোম (Wool)

হিসাবমত ধরিতে গেলে পশমের স্থান প্রাণিজাত দ্রব্যাদির তালিকায় হওয়া উচিত; রেশমের পক্ষেও সেই কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু রপ্তানী দ্রব্যের সরকারী পণ্য-তালিকায়* সকল প্রকার তন্তুরই একস্থানে উল্লেখ আছে এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া পুস্তকের এই খণ্ডে পশম সম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ করা গেল।

ভারতবাসীরা একই সময় তুলার এবং পশমের বস্ত্রের ব্যবহার জানিত। তুলা অপেক্ষা পশমের জ্ঞান প্রাচীনতর হওয়া সম্ভব। ব্রহ্মার আদি সৃষ্টির কয়েকটি বস্তুর মধ্যে পশমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ বা শীতপ্রধান অন্যান্য দেশে তুলার পরিবর্ত্তে পশমের পোষাকই প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে (মিঃ কটনের মতে) পঞ্চনদ, সীমান্ত প্রদেশ, যুক্ত-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানই পশমের জন্য প্রসিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশ, ভারতের পশ্চিমাংশ এবং সিন্ধু প্রদেশেও অনেক পশম পাওয়া যায়। রাজপুতানা ও মধ্যভারতের নানা অংশেও উৎকৃষ্ট পশম সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে আবার কয়েকটি জেলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পঞ্চনদ ও সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে হিসারের স্থান প্রথম; অন্যগুলি ফিরোজপুর, লাহোর, পেশোয়ার, ডেরা-ইস্‌মাইল খাঁ, অমৃতসর, মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডি; যুক্তপ্রদেশের মধ্যে কয়েকটি পার্ব্বত্য স্থান যথা, নৈনীতাল, আল-মোড়া, গাড়োয়াল এবং সমতলক্ষেত্রের মধ্যে মির্জ্জাপুর ও আগ্রা। খান্দেশ ও দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ পশম এবং সিন্ধু, গুর্জ্জর ও কাথিয়াবাড়ের শ্বেত

উৎপত্তি স্থান

*"Accounts relating to the Sea-borne Trade and Navigation of British India."

পশম বিশেষ প্রসিদ্ধ। সিন্ধুর মধ্যে বেলুচিস্থান ও বিকানীর করদরাজ্যে পশমের বিরাট বাজার আছে। মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধা, জব্বলপুর, নাগপুর ও রায়পুর; রাজপুতানা ও মধ্যভারতের মধ্যে বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর ও আজমীর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে মহীশূর, কইম্বাটুর, বেলারী ও কর্ণৌল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিকানীরের পশম ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে; উৎকৃষ্ট কার্পেট প্রস্তুত করিতে এই পশম সমধিক উপযোগী। ফজিল্‌কা ও বেওয়ার, এই দুই স্থানে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পশম-ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

অনুমান হয়, প্রতি বৎসর ভারতে নয় কোটী পাউণ্ড পশম সংগৃহীত হয়। এখানে ভেড়ার সংখ্যার তুলনায় এই পরিমাণ নিতান্ত কম। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি ভেড়া হইতে আট পাউণ্ড আন্দাজ লোম পাওয়া যায়; সে স্থলে ভারতের পরিমাণ তাহার এক চতুর্থাংশ মাত্র।

ভারতের এত পশম উৎপন্ন হইলেও, উত্তর-পশ্চিমের পার্ব্বত্য স্থানসমূহ হইতেও অনেক পশম রেল ও পশুবাহনে ভারতে প্রবেশলাভ করে। ইহাদের মধ্যে আফগানিস্থান, তিব্বত ও নেপালের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কোয়েটা, শিকারপুর, অমৃতসর, মুলতান প্রভৃতি স্থানে

সীমান্ত প্রদেশ হইতে আমদানী

এই সকল পশমের বাজার বসে এবং ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। তিব্বতের পশম কালিম্পঙ ও টঙ্কাপুরেই বিক্রীত হয়। পারস্য হইতে কারমানি নামে উৎকৃষ্ট পশম ভারতে আমদানী করা হয়। সেখ ওহাবসাহ নামে এক বণিক প্রথমে এই পশম আমদানী করে বলিয়া পঞ্চনদে ইহাকে "ওহাবসাহী পশম" বলে। ইহার পরই বিকানীর পশমের স্থান।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চনদই ভারতে পশমের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র এবং সেই কারণেই সেইস্থানে বিশেষভাবে পশমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

একসঙ্গে এত কাঁচা মাল ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় না। লুধিয়ানা, গুরুদাসপুর, শিয়ালকোট, লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে শাল, লোহি, জামিয়ার, পট্টু, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশেও নানারূপ গরম কাপড়ের সহিত ভাল কার্পেট তৈয়ারী হয়।

শিল্পকেন্দ্র

সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান শালের জন্য কাশ্মীর বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে ঐস্থানের আর সে সমৃদ্ধি নাই। কলে প্রস্তুত শাল আসিয়া শিল্পীর অন্নাভাব ঘটাইয়াছে এবং এক সময় যাহাদের নাম লোকে গর্ব্বের সহিত উচ্চারণ করিত, আজ তাহাদের বংশধর বা শিষ্যেরা হয় অনাহারে মরিতেছে, আর না হয় চাষ প্রভৃতি কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছে। ১৮৬৫--৬৬ সাল পর্য্যন্ত সরকারী খাতায় শাল রপ্তানীর স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইত।

পৃথিবীতে যে সকল দেশে পশম উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। প্রতি বৎসর আন্দাজ ৩৯৩ কোটী পাউণ্ড পশম (চর্ব্বিসমেত) সকল দেশের সম্মিলিত মেষ হইতে পায়; তন্মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বপ্রথম। পরে আমেরিকা, আর্জ্জেণ্টাইনা, নিউজীলণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা যুক্তরাজ্য প্রভৃতি পড়ে; পরিশিষ্ট (ক)।

পৃথিবীতে পশমের পরিমাণ

ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ৯ কোটী পাউণ্ড পশম সংগৃহীত হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশে রপ্তানী হয়, ইহাতে আন্দাজ তিন কোটি টাকা পাওয়া যায়; পরিশিষ্ট (খ)। ইংলণ্ড আমাদের প্রধান খরিদ্দার; মোটামুটি শতকরা ৮০ ভাগ একা ইংলণ্ড ক্রয় করে; পরে আমেরিকা, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশের স্থান; পরিশিষ্ট (গ)। রপ্তানীর জন্য সিন্ধু বন্দর প্রধান (৭৬·৫%) তাহার পর বোম্বাই; পরিশিষ্ট (ঘ)।

বাণিজ্য—রপ্তানী

পশম বাদে দেশ হইতে কার্পেট ও কম্বল চালান যায়; অন্য সকল প্রকার পশমজাত দ্রব্যাদি মিলিয়া ৫ লক্ষ টাকাও হয় না। কম্বল ও কার্পেটের ওজন ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, ইহা ১৯৩৮-৩৯ সালে ৮০ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে; এখানেও ইংলণ্ড আমাদের প্রধান খরিদ্দার। প্রতি এক শত টাকার মধ্যে পঁচাত্তর টাকার মাল ইংরাজ লইয়াছে; পরিশিষ্ট (ঙ)।

কাঁচা পশম রপ্তানীতে, মূল্য হিসাবে ১৯১৮-১৯ সাল এবং পরিমাণ হিসাবে ১৯১৫-১৬ সাল সর্ব্বপ্রধান। ঐ দুই বৎসরে, যথাক্রমে, ৫ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা (পরিমাণ ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ পাউণ্ড) এবং ৬ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পশম (৩ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা) রপ্তানী হয়। পরিশিষ্টে (খ) অন্যান্য বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল। পশমী দ্রব্যের মূল্যে ১ কোটী ১৪ লক্ষ টাকাই (১৯২৪-২৫) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এত পশম উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বহু টাকার পশম বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়; ইহার ওজন ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড এবং মূল্য কমবেশী ৬২ লক্ষ টাকা; পরিশিষ্ট (চ)। কাঁচা পশম ব্যতীত পশমজাত দ্রব্যাদির আমদানীর মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা; তন্মধ্যে মূল্য হিসাবে পশমী কাপড়ের অংশই বেশী; পরিশিষ্ট (জ)। ইহা ছাড়া আরও নানা রকমের দ্রব্যাদি আসে। সাধারণের মনে জানিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে, সেই কারণে ইহার সবিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে (জ) দিলাম। কাঁচা পশম বিক্রয়ে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান প্রথম। তাহার পরই ইংলণ্ডের অংশ; পরিশিষ্ট (ছ)।

আমদানী

কাঁচা পশম আমদানীতে ১৯৩৭-৩৮ সাল প্রধান, অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মাল (৮১ লক্ষ ৮৩ হাজার পাউণ্ড ওজন) আসে। পরিমাণ ধরিলে ১৯৩২-৩৩ সাল, ১ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (৪২ লক্ষ

১২ হাজার টাকা) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পশমী মাল ৪ কোটী ৯২ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে যায় নাই (১৯২৭-২৮) ; পরিশিষ্ট (চ)

ইহার উপর আন্দাজ ২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড পশম তিব্বত, আফ্‌গানিস্থান, নেপাল প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যতপ্রকার পশম আছে, যেমন মেরিনো, ক্রশব্রেড (crossbred) ও কার্পেটের পশম (carpet wool), তাহার মধ্যে ভারতের পশমই নিকৃষ্ট। সুতরাং বাহির হইতে পশম আমদানী করিবার কারণ বুঝা কঠিন নহে। নানারূপ আমদানী করা পশম হইতে এক কোটী পাউণ্ড বা ৩০ লক্ষ টাকার মাল আবার বিদেশে চলিয়া যায় (re-export) ; পরিশিষ্ট (ঝ)। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা এ দেশের কারখানা বা তাঁত প্রভৃতি দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

যে পরিমাণ পশম এবং পশমজাত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়, সাধারণতঃ তাহার পরিমাণ প্রায় সওয়া ৪ কোটি টাকা; পরিশিষ্ট (চ-১)। সুতরাং এখানে এখনও পশম শিল্পীর প্রকাণ্ড বাজার পড়িয়া আছে। এত বেকার চারিদিকে, সুবিধা করিতে পারিলে, পশমজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে পশমজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবার উল্লেখযোগ্য কোনই কারবার বা কারখানা নাই। কালিম্পঙ হইতে কতকটা কাঁচা পশম সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ব্রিটিশ ভারতে আন্দাজ কুড়ি এবং করদরাজ্যে দশটী পশমের মিল আছে। ইহাতে দিন মজুরের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার; তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৩০ এবং পঞ্চনদে ২৯ জন মজুর খাটে। তাহার পরেই বোম্বায়ের স্থান। অনুমান করা হয় এই সকল মিল হইতে বৎসরে আড়াই বা তিন কোটী টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত

ভারতে মিল

হইয়া থাকে। পশমজাত দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, আশা করা যায় এদিকে লোকে ক্রমশঃ নজর দিতে আরম্ভ করিবে।

পশমের দাম

ভারতীয় অন্যান্য পণ্যের ন্যায় এ দেশীয় পশমের দামেরও দারুণ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯২৫ সালেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য, অর্থাৎ প্রতি মণ খোরাসানী পশমের জন্য ৪৬৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে যেরূপ দাম পড়িয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে জগতের বাজারে ভারতের পশমের আর কোনও প্রয়োজন নাই; তখন উহা ১১৲ টাকায় নামে। পরে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০॥০ উঠিয়াছে (১৯৩৭)। পরিশিষ্ট (এও) হইতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে।

ব্যবহার-পশমের বসা

পশমের নিজস্ব ব্যবহার ছাড়া পশমে যে আঠাল পদার্থ লাগিয়া থাকে, তাহা লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বক কাজে লাগাইয়াছে। শীত বস্ত্রাদি, শাল, আলোয়ান, কার্পেট, পশমী সূতা প্রভৃতি করিতে পশম লাগে; কিন্তু সদ্যঃ সংগৃহীত পশমে বসাজাতীয় পদার্থ (ইহার বিশেষ নাম "yolk") শতকরা ২০ হইতে, ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। লোকে পশম হইতে এই বসা, স্বতন্ত্র করিয়া লয়; ইহাকে ইংরাজিতে "scouring" বলে। ইহার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয়। পশমগুলিকে ক্ষারের জলে ফুটাইলে (সাবান ও সোডার জল) কতক বসা ঘনীভূত হইয়া যায় এবং বাকী অংশ ঐ জলে মিশিয়া থাকে। এই জল ভিন্ন পাত্রে ধারণ করিয়া অম্ল বা য়্যাসিড (বিশেষতঃ সলফিউরিক য়্যাসিড) যোগে একেবারে নির্দ্দোষ করা হয়। য়্যাসিড যোগ করাতে অবশিষ্ট বসা উপরে ভাসিয়া উঠে (wool grease); তখন তাহাকে ছাঁকিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। সাধারণতঃ অম্ল বা য়্যাসিড যোগ

প্রক্রিয়া

করিবার পূর্ব্বে এই জল স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যেখানে সেখানে ফেলিতে দেওয়া হয় না। য়্যাসিড দিয়া ফুটাইয়া লইবার পর ইহা আইনের চক্ষে দোষ শূন্য হয়।

এই বসার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। নিতান্ত অপরিস্কার অবস্থায় ইহার রঙ দেখিতে কালো এবং ইহাতে দারুণ দুর্গন্ধ থাকে। সাধারণতঃ শতকরা ৩০ ভাগ অবিমিশ্র অম্ল (free acids) এবং প্রায় সমপরিমাণ কোলেষ্টেরল (cholesterol) এবং স্নেহজ সুরাসার (allied wax alcohols) থাকে। এই বসা নানাকাজে লাগে। অর্দ্ধদ্রব অবস্থায় গাড়ীর চাকা প্রভৃতি স্থানে লাগাইয়া ঘর্ষণরোধ করা হয়। বিশেষতঃ যেস্থানে ball bearing থাকে সেখানে ইহা সমধিক উপযোগী। বিশেষজ্ঞরা ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"For the more crude kinds of lubrication, such as that of the axles of railway wagons or other stuffing boxes at the glands of pistons or rotating shafts in closed vessels, etc.—wool grease is very suitable."

বলা বাহুল্য প্রচুর পরিমাণে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"পশমী বসা"র অপর একটি সুন্দর ব্যবহার রহিয়াছে। বসা উঠাইয়া লইয়া যে জল থাকে বৈজ্ঞানিক তাহার মধ্যে পটাশ মিশ্রিত বা

সার

পটাশজাত লবণ (Potash salts) এর সন্ধান পাইয়াছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, এই পটাশে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে। বুদ্ধিমানেরা এই অকিঞ্চিৎকর বস্তুকে যেরূপ কাজে লাগাইতেছে তাহা দেখিয়াও চৈতন্য হয় না। সারের অভাবে আমাদের দেশের জমি ক্রমেই অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, প্রতিবৎসরই ফসলের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে।

জীবের বিষ্ঠা এবং পশুর হাড় এতদিন ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। এখন আমরা গোবর জ্বালাইয়া থাকি এবং বিদেশীয়েরা নানাস্থানের হাড় সংগ্রহ করিয়া, সার প্রভৃতি বহু-কাজে লাগাইতেছে। এই রূপান্তরিত হাড় যে মূল্যে বিক্রীত হয়, আমাদের তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকে না। পশমের আবর্জ্জনা হইতে যে এত মূল্যবান পদার্থ হয়, তাহা উদ্ধার করিতে আমাদের কোনও চেষ্টা নাই। এদিকে কি কেহ মনোযোগ দিতে পারেন না? বাঙ্গলা দেশে খুব বেশী ভেড়া নাই, কিন্তু সামান্য যাহা আছে, তাহা লইয়া পরীক্ষা করিবার পর পঞ্চনদ প্রভৃতি প্রদেশে গিয়া পশম সাফ করিয়া দিবার কারখানা খুলিলে, বোধ হয়, উহার মজুরি উঠিয়া যায়; উপরন্তু, পশমী বসা এবং পটাশজাত সার লাভ হইতে পারে।

পরিশুদ্ধ পশমী বসার আরও সূক্ষ্ম ব্যবহার আছে। মনুষ্য ত্বকের মধ্যে অতি দ্রুত প্রবেশ করে বলিয়া লোকে ইহাতে নানারকম মলম প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এইরূপ বসাকে ইংরাজিতে 'ল্যানোলিন (lanolin) বলে। অম্ল বা ক্ষারের সকল প্রভাব হইতেই ইহা মুক্ত, সহজে চট্‌চটে হয় না বা ক্ষারযোগে সাবান প্রভৃতি বস্তুতে পরিণত হয় না। জলের সহিত মিশ্রণের ইহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, এমন কি একশত ভাগ ল্যানোলিনের সহিত ১১০ ভাগ জল মিশাইয়া লইলেও মলমের বা creamএর মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গ্লিসারিনের সহিতও ইহার ঐ পরিমাণে মিলনের শক্তি আছে। লোমকূপ দিয়া ইহা অতি দ্রুত প্রবেশ লাভ করে এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। করোসিভ সাব্লিমেট (corrosive sublimate) বা পারদ-জাত লবণ এক হাজার ভাগ ল্যানোলিনের সহিত এক ভাগ মিশাইয়া দেহের যে কোন স্থানে প্রলেপ দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে-জিহ্বায় ধাতব আস্বাদ

ঔষধার্থে

উপস্থিত করে। এই কারণে ইহা প্রলেপ, পমেটম, কসমেটিক প্রভৃতি প্রসাধনের ব্যবহারে লাগিয়া থাকে। আমাদের দেশে কোনও স্থানে কি ল্যানোনিল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে ?

ঠাণ্ডা হইতে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনে পশমের ব্যবহার। প্রাকৃতিক নিয়মে শীতপ্রধান দেশের পশুদিগের গায়ে লোম (বা পশম) বেশী ; ইহা বিশেষভাবে অপরিবাহী। তুলা বা অন্যান্য তন্তু হইতে সাধারণতঃ পশম দেহের তাপ অধিক রক্ষা করে। তন্তুর মধ্যে যে বায়ু থাকে, তাহা দেহের তাপে উত্তপ্ত হয় এবং বাহিরের শীতল বায়ু দেহ স্পর্শ করে না বলিয়া পশমের প্রয়োজন। শীতের সকল প্রকার বস্ত্র, কম্বল, কার্পেট প্রভৃতি পশম হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষ মোটামুটী উষ্ণ প্রধান দেশ ; এখানে পশমের ব্যবহার খুব প্রচলিত ছিল না। এ দেশে শীতকালে যাহা প্রয়োজন, তাহা দেশের শিল্পীতেই মিটাইতে পারিত।

পশমের অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে "ফেল্ট" (felt) একটী প্রধান। ভাল পশমের প্রয়োজন হয় না, অথচ পশম জমাইয়া বা বুনিয়া পুরু আসন, জিন, বিলিয়ার্ড টেব্‌লের আস্তরণ প্রভৃতি ইহার দ্বারা তৈয়ারী হয়।

চেষ্টা করিলে ভারতীয় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া এই আমদানী হ্রাস করা যাইতে পারে। হায়দ্রাবাদের দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, যেখানে ১৯৩৬-৩৭ সালে মাত্র ২০ হাজার টাকার কার্পেট রপ্তানী হইয়াছিল, ; সেখানে শিল্প বিভাগের চেষ্টায় যখন কারিকরকে নূতন শিক্ষা দেওয়া হইল এবং মালের উন্নতি সাধিত হইল, তখন ১৯৩৭-৩৮ সালে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মাল রপ্তানী হয়। চেষ্টা করিলে সকল স্থানেই এরূপ সুফল পাওয়া অসম্ভব নহে। বাহিরে চালান না গেলেও ভারতেই যে বিরাট বাজার পড়িয়া আছে তাহার রত্ন অপরে লুটিয়া খায় কেন ?

পরিশিষ্ট

(ক)

পৃথিবীতে উৎপন্ন পশমের পরিমাণ ও প্রতি দেশের অংশ

	লক্ষ পাউণ্ড	শতকরা অংশ
অষ্ট্রেলিয়া	৯৫,৮০	২৪'৪
আমেরিকা	৪৫,৮০	১১'৬
আর্জ্জেণ্টাইনা	৩৮,৫০	৯'৮
নিউজীলণ্ড	৩০,৫০	৭'৭
রুশ গণতন্ত্র	৩০,০৩	৭'৬
দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য	২৬,১০	৬'৬
চীন	?	
উরুগায়	১১,৪০	২'৯
ইংলণ্ড	১১,১০	২'৮
ভারতবর্ষ	৯,০০	২'০
তুরস্ক	৭,০০	১'৯
ফ্রান্স	৫,৪০	১'৩
অপরাপর	—	—
মোট	৩,৯৩,০০	—

স্পেন, তুরস্ক, ইরাণ প্রভৃতি দেশেও পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে

(খ)

রপ্তানী—কাঁচা পশম ও পশমী দ্রব্য

১৮৪৯-৫০ হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

	কাঁচা পশম		পশমী দ্রব্য
	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০	...	৭,৩৪	২২,০৫*
১৮৫৪-৫৫	...	৩১.০৯	২৯,৭৫*
১৮৫৯-৬০	...	৬৫,৫০	৩৩,৭৭*
১৮৬৪-৬৫	২,২৪,৩৩	১,৭২,৬৫	৪৩,৫১
১৮৬৯-৭০	১,৩৩,২৮	৭০,৮৯	৩৮,৩১
১৮৭৪-৭৫	২,১৪,৪৩	১,৪৪,৮৯	৩১,৭৩
১৮৭৯-৮০	২,৮৬,৬৭	১,১৮,৭৮	১৬,২২
১৮৮৪-৮৫	২,৫৫,৩০	৯৯,৩৯	১৫,০৮
১৮৮৯-৯০	৩,৮২,৭২	১,৭৭,৯১	১৭,৬১
১৮৯৪-৯৫	৩,১১,৫০	১,৩৭,৬৯	১৫,১৩
১৮৯৯-০০	৩,১৯,৩৫	১,৩৫,৬৪	২৫,৩৩
১৯০৪-০৫	৩,৮৫,৭২	১,৮৯,১৭	২২,৬৭
১৯০৯-১০	৫,৯৮,২৭	২,৮৫,৭৭	২৪,০৬
১৯১৪-১৫	৪,৪৬,১০	২,৩৬,৯০	১৬,৯৭
১৯১৫-১৬	৬,৫০,২৪	৩,৭৯,০৯	২৪,০৭
১৯১৮-১৯	৪,৭৩,৭৬	৫,৩৯,২৫	১৭,৫৫
১৯১৯-২০	৩,৬৩,১৯	৪,০১,২৭	৬৭,৩৮

* ১৮৬৫-৬৬ সাল পর্য্যন্ত শালের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইত ; পরে উহা লোপ পাইয়াছে।

(অনুসৃত)	কাঁচা পশম		পশমী দ্রব্য
	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	হাজার টাকা
১৯২৪-২৫	৫,২৭,৯৯	৫,০৭,৩০	১,১৪,২৯
১৯২৫-২৬	৪,০৪,১০	৩,৭৯,৮৮	৭৯,৫৯
১৯২৯-৩০	৫,০৩,৬৬	৪,৪২,২২	৯১,৩৩
১৯৩৪-৩৫	৩,৪০,৭৫	১,২৭,৫০	৯১,৭৮
১৯৩৫-৩৬	৪,৯৩,৫২	২,০৯,৬৬	৮২,৯০
১৯৩৬-৩৭	৬,১৯,৩৮	২,৮৬,০৮	৮৭,৮১
১৯৩৭-৩৮	৩,৭৯,৮৯	২,৬৪,৬৫	১,০৭,৮২
১৯৩৮-৩৯	৫,৫৬,১৬	২,৯৮,৬৮	৮৬,২৬

(খ—১)

মোট রপ্তানী—পশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি

	হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	৩,৭৩,৮৯
১৯৩৭-৩৮	৩,৭২,৩৭
১৯৩৮-৩৯	৩,৮৪,৯৫

(গ)

ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
ইংলণ্ড	৪,৪৯,৫৩	২,৪০,৮৪	৮০·৬
আমেরিকা	৮৯,৫১	৪৯,৯১	১৭·০
বেলজিয়ম	৪,৭০	২,৪৬	·৮
অন্যান্য	১০,৪৩	৫,৪৭	১·৬

(ঘ)

রপ্তানী—বন্দর হিসাবে

(১৯৩৮-৩৯)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
সিন্ধু	৪,১৬,৪৩	২,২৮,৬৪	৭৬'৫
বোম্বাই	১,১৫,৫৬	৬৪,৭৫	২১'৬
মদ্র	১৭,৫৮	৪,৪৮	১'৫
বাঙ্গলা	৪,৫৯	৮২	'২
মোট	৫,৫৪,১৬	২,৯৮,৬৮	

(ঙ)

রপ্তানী—পশমজাতদ্রব্য—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

মোট ৮৯,৪৫,০০০ পাউণ্ড ; ৮১,৫৫,০০০ টাকা

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ইংলণ্ড	৭২,১৭	৬১,২১	৭৫'০
আমেরিকা	৬,৫৫	৭,১৪	৯'৭
কানাডা	৪,১৩	৭,০৬	৮'৬
অষ্ট্রেলিয়া	১,৩৭	১,১৬	১'৪
অন্যান্য	৫,২১	৪,৯৫	৬'৫

(চ)

আমদানী—কাঁচা পশম ও পশমী দ্রব্য

১৮৬৪-৬৫ হইতে বিশিষ্ট কয়েক সালের হিসাব

	কাঁচা পশম		পশমী মাল
	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	হাজার টাকা
১৮৬৪-৬৫	২৪,৯২	...	১,৩০,১৭
১৮৬৯-৭০	১৬,৭১	৮,১০	৮৯,৫০
১৮৭৪-৭৫	১৫,৪৩	৬,৪২	৮৩,৬৪
১৮৭৯-৮০	৩৫,৬৫	৮,৭৩	৮৭,৮০
১৮৮৪-৮৫	২৫,৯১	৬,১৮	১,২৩,৪৩
১৮৮৯-৯০	৫১,০১	১৩,৬৭	১,৪৩,৫১
১৮৯৪-৯৫	৪৯,৩৪	১৩,২৪	১,৫৪,১৬
১৮৯৯-০০	৩৩,৬৫	৮,৫৫	১,৭৫,৮০
১৯০৪-০৫	২১,১৮	৬,৮১	৩,০৭,৬৪
১৯০৯-১০	২৫,৮৭	১০,৮৩	২,০৮,১১
১৯১৪-১৫	৩৩,১৭	১৬,৪৪	১,৯২,৫১
১৯১৯-২০	১৩,১৮	৭,৪৮	১,৫৯,৮৫
১৯২৪-২৫	৮২,১৪	৭৮,৯৩	৩,৫৬,৪৮
১৯২৭-২৮	৫৭,৮১	৪৪,৯৫	৪,৯১,৮৭
১৯২৯-৩০	১,২৫,৬১	৫১,৭১	৩,৭৬,৭৫
১৯৩২-৩৩	১,৪০,০০	৪২,১২	২,৫৪,৩৫
১৯৩৪-৩৫	৫৯,৮৫	৪১,৩৫	৩,৪৫,১২
১৯৩৫-৩৬	৭৪,৮৫	৪৪,১০	২,৩৪,৪৪

(অনুসৃত)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	৬৭,৭৪	৫৯,৫২	২,২৭,৪২
১৯৩৭-৩৮	৮১,৭৩	৮৪,৮০	৩,৩০,০৬
১৯৩৮-৩৯	৭২,৯৬	৬২,১১	২,১৯,৭৮

(চ-১)

মোট আমদানী—পশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি

		হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	...	২,৮৬,৯৪
১৯৩৭-৩৮	...	৪,১৪,৮৭
১৯৩৮-৩৯	...	২,৮১,৯০

(ছ)

আমদানী—কাঁচা পশম—বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
অষ্ট্রেলিয়া	৪৪,৪৮	৩৫,৫৪	৫৭·২
ইংলণ্ড	২৫,৪৯	২৫,২৭	৪০·৬
অপরাপর	২,৯৯	১,৩১	২·১
মোট	৭২,৯৬	৬২,১৪	

(জ)

আমদানী—পশমজাত দ্রব্যাদি—বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের নাম, মূল্য ও প্রত্যেকের শতকরা অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

	১৯৩৬-৩৭ হাজার টাকা	১৯৩৭-৩৮ হাজার টাকা	১৯৩৮-৩৯ হাজার টাকা	১৯৩৮-৩৯ শতকরা অংশ
বুননের পশম	৪১,৭৭	৬৮,২৯	৬৪,০৪	২২·৭
কম্বল (rug) প্রভৃতি	২৫,৪৯	৩৯,৩৮	৩১,৫২(*)	১১·২
কার্পেট প্রভৃতি	৪,১৩	৪,০৫	২,৪২	
গেঞ্জি মোজা (Hosiery)	১৪,৪৯	১০,৯৮	১৩,৪৭	৪·৭
গরম কাপড়, জামার ছিট প্রভৃতি	৮৪,২৯	১,১২,৫২	৪৫,০৮(†)	১৫·৯
পশম ও অন্যান্য তন্তু মিশ্রিত দ্রব্যাদি	৩১,৬৬	৫১,০৬	৩১,৭৪	১১·২
শাল, লোহি প্রভৃতি	১২,৯০	১৮,৩১	১৩,৯২	৪·৯
অন্যান্য সকল প্রকার				
মোট—	২,২৭,৪২	৩,৩০,০৬	২,১৯,৭৮	

(*) ইটালীর অংশ ৩০,৪৩,১৩৭ টাকা

(†) পূর্ব্ব বৎসর জাপানের অংশ ৫৬,৬৭,৬৯৭ টাকা ছিল, এ বৎসর ১৪,৬০,৪৪৭ টাকা মাত্র।

(ঝ)

আমদানী মালের পুনঃ রপ্তানী (Re-exports)

এই আমদানীর মধ্যে ভারতের বাহির অর্থাৎ তিব্বত, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত পশম ধরা হয়।

পশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি

	হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	৫২,৯৫
১৯৩৭-৩৮	৩৯,৯০
১৯৩৮-৩৯	৪৩,৬৫

(ঞ)

পশমের (খোরাসান) দাম—করাচীতে প্রতি মণ (৮২ পাউণ্ড)

		টা.	আ.			টা.	আ.
১৮৭০	...	১৯	৮	১৯১৬	...	৩৯	০
১৮৭৫	...	২৩	৮	১৯২০	...	৩২	০
১৮৮০	...	৩৩	১০	১৯২৫	...	৪৬	০
১৮৮৫	...	২১	৬	১৯৩০	...	২৭	০
১৮৯০	...	২৬	৮	১৯৩১	...	১৫	৮
১৮৯৫	...	২৮	০	১৯৩২	...	১৩	০
১৯০০	...	২০	৪	১৯৩৩	...	১১	০
১৯০৫	...	২৯	৮	১৯৩৪	...	২৩	০
১৯১০	...	২৩	৮	১৯৩৫	...	২০	৮
১৯১৫	...	২৯	৮	১৯৩৬	...	২১	০

১৯৩৭ ... ৩০ টাকা ৮ আনা

রেশম (Silk)

হিসাবমত ধরিতে গেলে, পশমের ন্যায়, রেশমের স্থানও, কীটলালা হইতে এই তন্তু উদ্ভূত হইয়া থাকে বলিয়া, প্রাণীজাত দ্রব্যের তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন, পাট, তুলা, শণ, পশম প্রভৃতি অন্য নানাপ্রকার তন্তুর সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই।

রেশমের সহিত ভারতের এক স্মরণীয় অতীত অধ্যায় যুক্ত হইয়া আছে। একদিন যে তন্তু পৃথিবীর নানা স্থানে গিয়া বহু সমাদর লাভ করিয়াছে এবং যাহার বস্ত্রাদি বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, যাহার দ্বারা রেশম উৎপাদক এবং রেশম শিল্পী বহু অর্থলাভ করিয়াছে, সেই দেশ এখন প্রায় সর্ব্বপ্রকারেই বিদেশীর মুখাপেক্ষী। পাঠক হয়ত বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু সত্যসত্যই প্রতি বৎসর আমরা আন্দাজ তিন কোটি টাকার কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্র আমদানী করি; আর সেই রেশম ব্যবহারের নেশায় পড়িয়া নকল রেশম ও নকল রেশমী বস্ত্রও প্রতি বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার আমদানী করিতেছি।

ভারতে রেশমের ইতিহাস কত পুরাতন, তাহা সঠিক বলা যায় না। এক চীন ব্যতীত জগতের আর কোনও জাতিই যখন রেশমের পরিচয় পায় নাই, তখন ভারত রেশম-শিল্পে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে এবং তাহার বস্ত্র পাইবার জন্য বহু সমৃদ্ধ এবং সভ্য দেশের নরনারী লালায়িত হইয়াছে। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, চীনারা অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রেশমের গুটী পালন করিতে এবং তাহা হইতে রেশম উদ্ধার করিতে শিখিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিমালয়ের কোনও কোনও বৃক্ষে তদ্দেশীয় কয়েকটি গুটী পাওয়াতে পণ্ডিতেরা এখন মনে করেন যে, চীনারা প্রথমে ভারতীয় গুটী সংগ্রহ করিয়া এমনভাবে লইয়া যায় যে, এখানে ঐ

ইতিহাস

কীটের অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না। সুতরাং, ভারতই প্রকৃতপক্ষে রেশমের কীটের আদি জন্মস্থান। কিন্তু প্রচলিত ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী হিসাবে, খোটানের কোনও রাজপুত্রের প্রতি চীন দেশীয় কোনও রাজ-কন্যার প্রেমই নাকি ভারতে রেশম কীট আনিয়া দিয়াছে। প্রেমাস্পদের মনস্তুষ্টির জন্য ঐ মহিলা আপনার অবগুণ্ঠন, কুন্তল বা শিরাভরণের মধ্যে কীট বীজ লুকাইয়া আনে এবং উহা উপহার দিয়া খোটানবাসীদের কীট পালনের শিক্ষা পর্য্যন্ত দেয়।

খোটান হইতে পারস্য ও রোম হইতে গ্রীসে এই' কীট ও কীট পালনের জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে। সেই জ্ঞান আজ পরিপুষ্ট হইয়া ইউরোপের নানা দেশে গুটী পালন ও রেশমের বিরাট ব্যবসায়ের সুযোগ দিয়াছে। মোট কথা, যেখানেই তুঁতগাছ জন্মানো সম্ভব হইয়াছে, সেখানেই লোকে গুটী পালন করিতে আরম্ভ করে।

মধ্য এশিয়া (খোটান) হইতে ক্রমশঃ "রেশম-বিদ্যা" ভারতে আসিয় প্রবেশ লাভ করে। আরও মনে হয়, বাঙ্গলার এ বিষয়েও একটু বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালী অসমীয়াদের সঙ্গে মণিপুর রাজ্যের ভিতর দিয়া চীনে যাতায়াত করিয়া এই শিল্প সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞান এদেশে লইয়া আসে। তাহার পর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে বাঙ্গলার রেশম আপনার আসন দখল করিয়া লয়। তাহার পর আবার কিভাবে এই বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার অন্য ইতিহাস আছে।

রেশম কীটের পরিচয়

রেশম কীটকে দেখিলে হাত দিতে ঘৃণা বোধ হইবে এবং এতৎসদৃশ সকল কীটকে দূরে রাখিতে পারিলে বা নির্ম্মূল করিতে পারিলেই আনন্দ হইয়া থাকে। কিন্তু জগতে যে সকল অতি আশ্চর্য্য বস্তু আছে, রেশম কীট তাহার মধ্যে অন্যতম। যে সকল কীট গাছের পাতা খাইয়া শস্য নষ্ট করে, তাহারাও মোটামুটি

এই জাতীয় কীট। যাহারা লোকের প্রভূত ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহারই এক জাতি সারা পৃথিবীতে প্রতি বৎসর আপনার লালা হইতে অন্ততঃ এক শত কোটি টাকার তন্তু প্রস্তুত করে। কাহারও কাহারও মনে ইহাদের জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে; কাহারও বা প্রয়োজন আছে মনে করিয়া এই সম্পর্কে সামান্য পরিচয় দিলাম।

স্ত্রী কীটগুলি অতি ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করে; প্রতি কীট অন্ততঃ ৩০০ হইতে ৫০০ ডিম্ব প্রসবে সমর্থ। এই সকল ডিম্ব সামান্য উত্তাপে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে এবং অতি ক্ষুদ্র কীটের আকার ধারণ করে। ডিম্ব ফুটিবার জন্য যে সামান্য তাপের প্রয়োজন, তাহার সুযোগ লইয়া লোকে নিজের সুবিধামত ইহা ফুটাইয়া লয়। যাঁহারা সুবিধা মত কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া ডিম ফুটাইতে চান, তাঁহারা উত্তাপহীন আধারের মধ্যে রাখিয়া পরে আবার আধারের তাপ বাড়াইয়া লইয়া ডিম ফুটাইতে পারেন। উত্তাপহীন পাত্রের মধ্যে লইয়া লোকে ডিম বা কীট দেশ হইতে দেশান্তরে চালান দিয়া থাকে। এই ডিমগুলি এত ক্ষুদ্র যে, আন্দাজ একশত ডিমে এক গ্রেণ ওজন হয়।

জীবনেতিহাস

তুঁতপাতা খাইয়া যে সকল কীট জীবন ধারণ করে, আজকাল ব্যবসায়ীরা আপনার গৃহে নানাপ্রকারে ইহাদের পালন করে। কীটের আকার ধারণ করিলে ইহাদের তুঁতপাতা খাইতে দেওয়া হয় এবং ইহারা আকারে অতি দ্রুত বাড়িতে থাকে। দুই লক্ষ কীটে পক্ষকাল মধ্যে কমবেশ ত্রিশ মণ তুঁতপাতা খাইতে পারে। পোকা অবস্থায় গুটী বাঁধিবার পূর্ব্বে কীটেরা অন্ততঃ চার বার উপবাস করে এবং মাঝে মাঝে দেহের উপরের পাতলা আবরণ বা খোলস পরিত্যাগ করে। খোলস ছাড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের আবরণ আবার দেখা দেয়। এইরূপে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে

অর্থাৎ দুই হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা হইতে ইহাদের প্রায় একমাস সময় লাগিয়া যায় ; অবশ্য কীটের জাতির বিভিন্নতা এবং দেশের তাপের উপর এই সময়ের তারতম্য আছে। জাপানে এক একবার খোলস বদলাইতে কীটগুলির আন্দাজ পাঁচ দিন সময় লাগিয়া যায়। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটিতে সাত দিন লাগে এবং শেষবারে দশ দিন পড়ে। খোলস ছাড়িয়া তখন ইহারা উপযুক্ত আহার ও বাসস্থান পাইলে, নিজ দেহের চতুর্দ্দিকে আপনাদের মুখনিঃসৃত লালা জড়াইতে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রথমে এই লালার কোনও আকৃতি থাকে না, বাতাস পাইয়া ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে এবং গুটীটি পক্ষী ডিম্বের আকার ধারণ করে।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টাকাল লালা বাহির হইবার পর কীটটিকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তিন হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে গুটী তৈযারী শেষ করিয়া ফেলে। কঠোর পরিশ্রমের জন্য কীটের দেহের পরিমাণ কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যায়। এই সময় ইহারা আর একবার খোলস ছাড়ে এবং পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করে। এতদবস্থায় আবার কয়েক দিন কাটিয়া যায়, ইহাতে কখনও কখনও কুড়ি পঁচিশ দিন পর্য্যন্ত লাগে। তাহার পর মুখের লালা দ্বারা গুটীর একস্থান ভিজাইয়া লইয়া আপন চেষ্টায বাহির হইয়া পড়ে এবং মাত্র তখনই ইহাকে পতঙ্গের আকারে দেখিতে পাওয়া যায়।

লালা বাহির হইবার প্রথমাবস্থায় যে তন্তু প্রস্তুত হয়, তাহা পরে গুটীর মধ্যের রেশম হইতে গুণানুসারে অনেক তফাৎ। গুটীর অন্তর্ভাগের রেশম অনেক ভাল এবং অপেক্ষাকৃত ইহার দরও অনেক বেশী।

রেশমকীটের নানা জাতি আছে। কোনও কোনও কীট বৎসরে মাত্র

একবার (univoltine) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের খেলা শেষ করে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। কাহারও বা ছয় মাসে (bivoltine) জন্ম, কীটাবস্থা, গুটী, পতঙ্গ, (ডিম্ব প্রসব) ও মৃত্যু সবই শেষ হয়। এইভাবে বৎসরে তিনবার (trivoltine), চারবার (quadrivoltine), এমন কি বহুবার (multivoltine) এই চক্রে ঘুরিতে থাকে। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায়, যাহাদের জীবনের ক্রিয়া সারা বৎসর ধরিয়া সাঙ্গ করিবার সুবিধা হয়, তাহাদের সকল কার্য্যই ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। অর্থাৎ ডিম্ব হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার পর হইতে গুটী বাঁধার কাল পর্য্যন্ত তাহারা যে সময় লয়, তাহা অপেক্ষা বংশের ধারায় বৎসরে যে কীট বহুবার আসা যাওয়া (multivoltine) করে তাহাকে শীঘ্রই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে হয়। বলা বাহুল্য, যে দেশে যত বার গুটী জন্মে, সে দেশের ততই সুবিধা। কীটের জাতিগত গুণ, ভক্ষ্য বস্তুর সুবিধা, পালনের জ্ঞান প্রভৃতি কারণ হইতে একই গুটী হইতে বেশী রেশম পাওয়া যাইতে পারে। যে কীট জন্ম হইতে প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া ডিম্ব প্রসব করিয়া মৃত্যুর কাল পর্য্যন্ত মাত্র তিন মাস সময় লয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার গুটী নির্ম্মাণ করে এবং ঐ গুটী হইতে প্রাপ্ত রেশমের পরিমাণ কম, এ কথা কোনও রকমে সত্য নহে।

জাতির বিভিন্নতা

ইহা ছাড়া পালিত ও বন্য বা জঙ্গলী হিসাবে গুটীর পার্থক্য আছে; আরও আছে বিভিন্ন ভক্ষ্য অর্থাৎ বৃক্ষের বা তাহার পত্রের গুণাগুণের উপর। গুটীর মধ্যে যে কীট তুঁতপাতার উপর জীবন নির্ভর করিয়া আছে, তাহাই প্রধান। নানা প্রকার বন্য কীটের মধ্যে তসর, মুগা এবং এড়ি বা এণ্ডি প্রধান। তসর-কীট মহুয়া, সিমুল, জাম, মাদার, অশ্বত্থ, এরণ্ড,

গুটীর নাম ও খাদ্য

শাল, সেগুন, অর্জ্জুন, সজিনা, কুল প্রভৃতি গাছে জন্মিতে দেখা যায়। মুগা কীটও তসরের ন্যায় বিভিন্ন গাছে জন্মে ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ইহা তসর অপেক্ষা অধিক মাত্রায় পালিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সেখান হইতেই মুগা সংগৃহীত হয়। রেড়ী গাছের পাতার উপর নির্ভর করে বলিয়া এড়ি বা এণ্ডি নামে এক জাতীয় রেশমের বহুল প্রচার আছে। ইহারাও পালিত কীটের মধ্যে পড়ে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুঁত-পাতার কীটই জগতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে; ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই এবং তুঁতগাছের চাষের সহিত এই কীট নানাস্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইত।

কীটের আবাস

বর্ত্তমানে বাঙ্গলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী ও বীরভূম জেলায়, আসামের স্থানে স্থানে, মদ্রের কইম্বাটুর জেলা (তন্মধ্যে (কেল্লোগল তালুক), মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোর, মহীশূর তুমকুড় ও কোলার জেলা, কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য, পঞ্চনদের কতকাংশ এবং ব্রহ্মে এই কীট নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

তসরের কীট প্রধানতঃ চীন, ভারতবর্ষ ও সিংহলে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা সম্পূর্ণরূপেই বন্য। পূর্ব্বে ভাগলপুর, হাজারিবাগ, পালামৌ, ছোটনাগপুর; উড়িষ্যার স্থানে স্থানে, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, জব্বলপুর, ছত্রিশগড় প্রভৃতি জেলায় এবং আসামের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে এই সকল স্থান ছাড়া যুক্তপ্রদেশের মির্জ্জাপুর জেলাও যোগ করিয়া দেওয়া উচিত। এতগুলি স্থানে তসর-কীট পাওয়া গেলেও, মুর্শিদাবাদ, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেই তসরের শিল্প বেশী মাত্রায় চলে। ধরিতে গেলে মুগা আসামের সম্পত্তি। এড়ি বা এণ্ডি ও আসামেই অধিক; কিন্তু বাঙ্গলায় জলপাইগুড়ি এবং রঙ্গপুর ও দিনাজপুরে, বিহারে পূর্ণিয়া এবং মদ্রেও সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

এণ্ডি সূতা সাধারণ রেশমের মত উঠাইয়া লইতে পারা যায় না; ইহা তুলার ন্যায় পিঁজিয়া চরকায় পাকাইয়া লইতে হয়।

মহীশূর এবং মদ্রের কইম্বাটুর জেলায় যত রেশম সংগৃহীত হয়, তাহার সহিত অপর কোনও স্থানের তুলনা হয় না। আন্দাজে বলা যায়, এই দুই স্থানে শতকরা চল্লিশ ভাগ রেশম জন্মে।

রেশমের উদ্ধার

গুটী হইতে রেশম পাইবার প্রণালী নিতান্ত কঠিন না হইলেও, অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন আছে। গুটীগুলি জলে সিদ্ধ করিবার সময় উহা হইতে রেশমের একটী বা দুইটী মুখ বা "খেই" বাহির করিয়া লাটাইয়ে জড়াইয়া লওয়া হয়; যাহারা এই কার্য্যে দক্ষ, তাহারা বুঝিতে পারে, কোন অবস্থায় খেই ধরাইয়া দিতে পারিলে অবিচ্ছিন্নভাবে রেশম পাওয়া যায়। জলেও এমন জ্বাল দেওয়া প্রয়োজন, যাহাতে অযথা তাপ নষ্ট না হয়। গুটীতে যে আঠাল পদার্থ থাকে, গরম জলে ধুইয়া গেলে তাহা হইতে তন্তু তুলিয়া লওয়া সম্ভব হইয়া পড়ে।

পৃথিবীর রেশম

এশিয়া মহাদেশেই রেশমের কীটের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থান, তাহার মধ্যে আবার জাপানই প্রধান। জাপানে যত রেশম উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর সকল দেশ মিলিয়া হয়ত তাহার সমান হইতে পারে। এশিয়ার মধ্যে জাপানের পরই চীনের স্থান। রপ্তানী বিষয়ে কোরিয়ার স্থান ভারত ও ইরাণের উপরে। জাপানে প্রতিবৎসর আন্দাজ ৯ কোটী পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। চীনের পরিমাণের কোন হিসাব নাই; তবে প্রতিবৎসর ১ কোটী ২৩ লক্ষ পাউণ্ড মাল রপ্তানী হইয়া থাকে। কোরিয়া, ইটালী, রুশ গণতন্ত্র, ফরাসী, স্পেন, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি স্থানেও কম বেশী রেশম উৎপন্ন হয়; পরিশিষ্ট (ক)।

সকল রকম মিলিয়া ভারতবর্ষে আন্দাজ ২৬ লক্ষ পাউণ্ড রেশম হয়। তাহার উপর আন্দাজ ২২ লক্ষ পাউণ্ড রদ্দি বা অব্যবহার্য্য রেশম পাওয়া যায়। তুঁতপাতাভোজী গুটীর রেশম (অব্যবহার্য্য রেশম বাদে) প্রায় ২১ লক্ষ পাউণ্ড হয়, তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জন্মে, আন্দাজ ১০ লক্ষ পাউণ্ড; আর রদ্দি রেশম মোট ১১ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ৫ লক্ষ পাউণ্ড। পরে পরে মহীশূর (৭,৫০,০০০) কাশ্মীর, জম্মু, মদ্র, আসাম ও পঞ্চনদের স্থান। বিহার উড়িষ্যায় তসর খুব বেশী হয়, অর্থাৎ আন্দাজ মোট ৪ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড। মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশের অংশ নিতান্ত মন্দ নয়। মুগা ও এণ্ডি প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড হয়, তাহার সবটাই আসাম হইতে প্রাপ্ত।

ভারতের রেশম

যতদূর সম্ভব কাঁচা রেশমের উৎপত্তিস্থানগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে। এখন সেখানে যাহাই হউক এক সময় বাঙ্গলা দেশ রেশমের জন্য সকল বণিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতি পুরাতন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কাম্বে ও মসুলিপট্টমের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলা সম্বন্ধে বার্ণিয়ারের মতে "এই স্থানের তূলা এবং রেশম হিন্দুস্থান বা মোগলসাম্রাজ্য ছাড়াইয়া নিকটবর্ত্তী সকল রাজ্যের এমন কি ইউরোপের অভাব দূর করিতে পারে।"

বাঙ্গলার স্থান—
পুরাতন ও নূতন

Foster সাহেব বলিয়াছেন মুর্শিদাবাদের কুঠীতে, নূতন গুটী হইতে প্রাপ্ত এবং গুণেও অপর স্থানের তন্তু হইতে উৎকৃষ্ট রেশম, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে শতকরা কুড়ি টাকা সস্তা দামে প্রচুর পাওয়া যায়। তাঁহার মতে ঐ সময় রেশম শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত লোক জন অপর স্থানের মজুর অপেক্ষা বহু সস্তায় ঐখানে পাওয়া যাইত বাঙ্গলার বাণিজ্যের পুরাতন পরিচয় পরিশিষ্টে (খ) রহিল।

কাঁচা রেশমের সঙ্গে শিল্পের কেন্দ্রগুলিরও পরিচয় থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ লোকে মনে করে ভারতের তন্তু এবং আমদানী করা রেশমী স্থতা হইতে প্রস্তুত মাল উভয়ে মিলিয়া আট কোটি টাকার বস্ত্রাদি প্রতি সনে প্রস্তুত হয়। অনেক স্থানের শিল্প ও শিল্পী নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বর্ত্তমানে যাহা আছে, তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নাম দেওয়া গেল :—

কেন্দ্রপরিচয়

বাঙ্গলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর; আসামের বহু স্থানে, বিহারে ভাগলপুর; যুক্তপ্রদেশে কাশী ও সাজাহানপুর; পঞ্চনদে অমৃতসর, জলন্ধর ও মুলতান; মধ্যপ্রদেশে নাগপুর; বোম্বাইয়ে সুরাট, আহম্মদাবাদ, পুণা, বেলগাঁ, ধারওয়ার, ইওলা, হুবলী, সোলাপুর, বাগালকোট, ইত্যাদি; মদ্রে বহরমপুর, ধরমভরম, কুম্ভকোণম্ কঞ্জীভরম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, সালেম; মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোর ও মহীশূর এবং কাশ্মীরে শ্রীনগর।

এখনও যে পরিমাণ রেশমী বস্ত্র দেশে উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমদানী করা বস্ত্রাদি অপেক্ষা বেশী; কিন্তু নকল রেশমী তন্তু এবং বস্ত্রাদি ধরিলে প্রায় সমান হইয়া পড়ে।

রেশমশিল্প বহু লোককে অন্নদান করিত; রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের একটা বিরাট বাণিজ্য ছিল। এই জাতীয় শিল্পী ছাড়া রেশমকীট পালন করিয়া বহুলোকে অন্নসংস্থান করিত। এই বিষয়ে বাঙ্গলা ও আসামের বিশেষ সুবিধা। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখানে লোকে চারবার পর্য্যন্ত গুটী পাইয়া থাকে। যাহারা বৎসরে একবার গুটী পায়, তাহারা শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের ফলে আমাদের শিল্পনাশ করিয়া দিয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্যের অবনতির কারণ

বৈদেশিক শাসনের ফলে নানা প্রকার শুল্ক বসাইয়া আমাদের বাজার

নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা ব্যতিরেকে নৈসর্গিক কারণেও ভারতের রেশম ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একপ্রকার জীবাণু রেশম কীটের প্রায় ধ্বংসসাধন করে। ভারতবর্ষে এই মারাত্মক জীবাণু এত দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে যে তাহাতে রেশম ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হয়। এই জীবাণু ইউরোপেও ছড়াইয়া পড়ে এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহার উপদ্রবে ফ্রান্সের রেশমকীট প্রায় লোপ পায়। ভারতবর্ষে এই জীবাণুর প্রভাব নিতান্ত কম নহে। বৎসরে চারটী 'বন্দ' বা গুটীর কাল হইতে এখানে প্রকৃতপক্ষে দুইটী বন্দে নামিয়াছে; তাহাও আবার রোগগ্রস্ত কীট হইতে জন্মে বলিয়া আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। প্রকৃতির লীলায় জাপানের কীটে এই জীবাণু সংক্রামিত হয় নাই এবং সেই স্থানের সুস্থ ডিম্ব বা কীট হইতে অন্যস্থানে চাষ হইতেছে।

রোগ বীজাণু

১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত এই জীবাণু ভয়ানকভাবে বাড়িতে থাকে এবং সারা পৃথিবীর রেশমকীট লোপ পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। কিন্তু ঐ সালে পাস্তর (Pasteur) অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা রেশমকীটের ব্যাধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জীবাণুর জীবনেতিহাস প্রকাশ করিয়া দেন এবং কি উপায়ে রেশম কীটগুলি রোগ-জীবাণুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহারও ইঙ্গিত দেন। ইহাতে অনেকেই লাভবান হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের কীট পালকেরা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" রহিয়া গেল। পাস্তর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করার কোনও লক্ষণই এখানে দেখা গেল না। তাহার পর বিদেশী বাণিজ্যে, প্রতি দেশে রক্ষণশুল্ক দ্বারা ভারতীয় শিল্প নষ্ট করা হইল; তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল পাওয়া গেল না। ইংরাজ আমাদের রাজশক্তি; কোনও স্বাধীন রাজ্যের সহিত

অপরাপর কারণ

বিতণ্ডা করিতে হইলে, তাহারই করা উচিত। সে তাহা ত করে নাই, উপরন্তু ফরাসী প্রভৃতি দেশে শুল্ক কম ছিল বলিয়া সেখানে যাহা বিক্রয় হইত তাহাও রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহা ছাড়া ফরাসী ও ইটালী প্রভৃতি দেশে গুটী পালন করা সম্ভব হওয়ায় তন্তুর চাহিদা কমিয়া যায় এবং রপ্তানী হ্রাস পাইতে থাকে। ১৮৫৭ সালে সাধারণভাবে অব্যবহার্য্য রেশমের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় মূল্যবান রেশমের পরিবর্ত্তে তাহাই ব্যবহৃত হইতে থাকে।

বাণিজ্য—রপ্তানী

এই সকল কারণের সহিত ভারতীয় রেশম বাণিজ্য ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত। ১৭৭২ সালে ইংলণ্ডে প্রথম ভারতীয় রেশম রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার পরিমাণ ঠিক জানা নাই। পরে পাঁচ বৎসর গড়ে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড করিয়া রেশম যায়। ১৭৯৩ সালে ইংলণ্ডে সাড়ে ১২ লক্ষ পাউণ্ড রেশম আমদানী হইলে এক বাঙ্গলা প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ পাউণ্ড সরবরাহ করে। বরাবরই বাঙ্গলার রেশম বিলাতের মোট আমদানীর প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮১২-১৩ সালে ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউণ্ড বাঙ্গলার রেশম ১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। ইহা কেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর *

* বাঙ্গলা দেশের স্থানে স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কুঠী স্থাপিত করে। এই সকল স্থানে রেশম হইতে "ছড়ি" তৈয়ারী হইত এবং ছড়ি রেশম সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। কুঠী গুলির নাম ছিল আড়ং বা আড়ত। এক একটী প্রধান কুঠীর তাঁবে অন্যান্য ছোট আড়ত ছিল। বাউলিয়া প্রধান কুঠীতে এবং তাঁহার তাঁবে মোট ৩৭টী ছড়ি জড়াইবার যন্ত্র বা উন্নত চরকা প্রভৃতি দশ খানি গ্রামে ছড়াইয়া ছিল। বাউলিয়ার অধীনে বুগোচি, সুরগু, ধরেশ্বর, ভবানীগাছি, হাজা, বহরমপুর, মধুময়ী, বেড়ালদা ও কাঁটালমারি কুঠী ছিল। কুমারখালি কুঠী ও তাহার অধীনে গালিমপুর, মনসিংপুর ও মিরপুর; কাশিমবাজার কুঠী; হরিপাল কুঠী ও তাহার অধীনে দরহাটা সদর, ধনিয়াখালি, ফুলেশ্বর, আমপাতা,

রেশম তাহা ছাড়া সাধারণ লোকের নিকট সংগ্রহ করা রেশমের স্বতন্ত্র অংশ ছিল। এই আমলে ১৮২৭-২৮ সাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর কুঠীর ১০ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড রেশম ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকায় কেবল মাত্র ইংলণ্ডে বিক্রীত হয়। ইহা ছাড়া এই সকল কুঠী হইতে বাঙ্গলা দেশেও রেশম বিক্রয় করা হইত। ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকেরা কত পরিমাণ রেশম লইত তাহার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। ১৮০৯-১০ হইতে ১৮৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর বাণিজ্যের হিসাব (খ) পরিশিষ্টে দিলাম। বিশ বৎসর বাদে (১৮৪৯-৫০) উহা কমিয়া ১ কোটী টাকা হয়। ১৮৬৯-৭০ সালেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানী হইয়াছিল; ২৫ লক্ষ ৯৪ হাজার পাউণ্ড রেশম, ২ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হয়। উহা ১৮৭৯-৮০ সালে ১৬ লক্ষ ৭৩ হাজার পাউণ্ড রেশম এবং চশম বা রদ্দি রেশম মিলিয়া মোট ৬০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০০-০১) ৫৬ লক্ষ টাকার রপ্তানী ছিল, এখন (১৯৩৮-৩৯) রেশম ৪২ হাজার টাকা এবং গুটী ও রদ্দি রেশম ২ লক্ষ টাকা, মোট আড়াই লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে; পরিশিষ্ট (গ)।

শিল্পজাত বস্ত্রাদি এক সময় খুব বেশী রপ্তানী হইত এবং বিদেশে গিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। ১৮৩৮ সালে কেবল ভারতীয় রুমাল এবং রুমাল জাতীয় বস্ত্রাদি একমাত্র ফরাসী দেশে ৩০ লক্ষ টাকার উপর রপ্তানী হয়। কেবল রুমাল প্রভৃতি ৩০ লক্ষ টাকার গিয়া থাকে, তাহাব সহিত অন্য

কটোরা; জঙ্গীপুর কুঠী ও অধীনে বড়গড়িয়া; মালদহ ও তাহার অধীনে টানোর; রাধানগর ও তাহার অধীনে ঘাটাল, গোপীগঞ্জ ও খানাকুল; রঙ্গপুর ও অধীনে নবাবগঞ্জ, গোমানিগঞ্জ; শান্তিপুর ও অধীনে রেণহাটী; সোণামুখী ও অধীনে রাঙ্গামাটী; এবং সরদা ও অধীনে পাইকপাড়া, ডাকরা ও সন্ধিখাঁ প্রভৃতি কুঠী ছিল—(পার্লামেণ্টে প্রদত্ত হিসাব হইতে সংগৃহীত)।

বস্ত্রাদি কিরূপ গিয়াছে, তাহার হিসাব করা প্রয়োজন। ফরাসীদিগের এই ভারতীয় বস্ত্রপ্রিয়তা ইংরাজের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৪৯-৫০ সালে ৬৬ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্রাদি রপ্তানী হয় এবং উহা কমিয়া ১৮৬৫-৬৬ সালে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকায় আসে। তাহার পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৮৯-৯০ সালে ৫২ লক্ষ টাকা হয়। ইহার পর হইতে এরূপ রপ্তানী আর হয় নাই। রপ্তানী বস্ত্রাদির পরিমাণের স্বতন্ত্র হিসাব ১৮৯৩-৯৪ সালের আগে রাখা হইত না। ঐ সালে ও ২৫ লক্ষ গজ রেশমী বস্ত্রাদি গিয়াছে এবং তাহাতে সাড়ে ৩১ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। এ সময় এবং ইহার বহু পরেও কেবল রেশমী বস্ত্রের হিসাব রাখা হইত। ১৯০০-০১ সালেও আন্দাজ সাড়ে ১২ লক্ষ টাকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি যায়, বর্ত্তমানে উহা দুই লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে খাঁটী রেশমী বস্ত্র মাত্র এক লক্ষ টাকার; পরিশিষ্ট (গ)।

কিন্তু আমদানীর অঙ্ক ঠিক এইরূপ নাই; বলা বাহুল্য ইহার নানা বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর নকল সিল্ক মিলিয়া ভারতের পক্ষে আমদানী বৃদ্ধিই পাইয়াছে। ১৮৪৯-৫০ সালে কাঁচা রেশম আমদানী

আমদানী

২৮ লক্ষ টাকা ছিল। ১৮৬৯-৭০ সালে তাহা ১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা (ওজন ২০ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড) হয়। ইহা কমিয়া ১৮৭৬-৭৭ সালে ৪৫ লক্ষ টাকা (ওজন ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড) হইয়াছিল। ১৮৯৩-৯৪ সালে উনবিংশ শতাব্দীর আমদানীর চরম ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকার মাল (ওজন ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার পাউণ্ড) আসে। এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক

রেশম

কাঁচা রেশম আরও অনেক আমদানী হইয়াছে; কিন্তু ১৯১৯-২০ সালের (২৩ লক্ষ ৪৩ হাজার পাউণ্ড রেশমের জন্য) ১ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকাই চরম। ১৯১২-১৩ সালে

৩৫ লক্ষ ৭৯ হাজার পাউণ্ড (১ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা) কাঁচা রেশমের পক্ষে আমদানীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ। ১৯৩৮-৩৯ সালে উহা ৬২ লক্ষ ১৭ হাজার পাউণ্ড ওজনে দাঁড়াইয়াছে।

রেশম হইতে নির্ম্মিত বস্ত্রাদির হিসাবে আমদানীর অঙ্ক বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৪৯-৫০ সালে ইহা ১৭ লক্ষ টাকার ছিল; ১৮৭৪-৭৫ সালে ইহা ১ কোটী ৬ লক্ষ টাকা (৭১ লক্ষ ৫৯ হাজার গজ) এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা ১ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা (২ কোটী ৭ লক্ষ গজ) হয়। মূল্য ধরিলে ১৯১৯-২০ সালে ৫ কোটী ৯২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা (৩ কোটী ১ লক্ষ ৪৯ হাজার গজ)* সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পর বৎসরও ৫ কোটী ৫৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার বস্ত্রাদি (২ কোটী ৪৩ লক্ষ ৪৬ হাজার গজ)† আসে। ১৯৩৩-৩৪ সালের ৫ কোটী ১০ লক্ষ গজ বস্ত্রাদি (২ কোটী ৮৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা) আমদানীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ; পরিশিষ্ট (ঘ) হইতে আমদানীর হিসাব বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার মধ্যে সূতা, বাণ্ডিল, গুলি প্রভৃতি কিছু কিছু প্রস্তুত দ্রব্যাদির হিসাব ধরা আছে।

বস্ত্রাদি

সর্ব্বপ্রকার মিলিয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে মাল আসিযাছে ১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকার; তন্মধ্যে কাঁচা রেশম ও গুটীব পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (৬২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা)। তাহার পর বস্ত্রাদি (৬৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা); সূতা প্রভৃতি (৩২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা) রেশম ও অন্যান্য তন্তু মিশ্রিত দ্রব্যাদি ৩১ লক্ষ টাকা; পরিশিষ্ট (ঙ)।

* ১৯১৯-২০ সালে জাপানের একার অংশ ছিল ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা; চীন ১ কোটী ৩৭ লক্ষ এবং হংকঙ ৯০ লক্ষ টাকার মাল দেয়। ক্রেতার মধ্যে বোম্বাই ৫ কোটী ৭ লক্ষ টাকার মাল লয়।

† জাপানের অংশ ২ কোটী ৯৬ লক্ষ, চীন ৮৪ লক্ষ ৭২ হাজার এবং হংকঙ ৮৯ লক্ষ টাকা।

জাপানই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান বিক্রেতা। চীনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাহার স্থান প্রথম। ইটালী, চীন, ইংরাজ বাকী অংশ ভাগ করিয়া লয়; পরিশিষ্ট (চ)।

রেশম এবং রেশমী বস্ত্র শতকরা ৭৫ ভাগ একা বোম্বাই ক্রয় করিয়া থাকে।

মূল্য

রেশমের মূল্যের বহু তারতম্য হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৭০ সালের প্রতি পাউণ্ডে ২৬ টাকা ছয় আনাই প্রধান। তাহার পর বরাবরই কমিয়া ১৯২০ সালে পূর্ব্ব হারে আসিয়া পৌঁছে। ১৯২৩ সালের ৩৬ টাকা ৮ আনা এবং ১৯৩৩ সালের ৯ টাকা, যথাক্রমে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন দাম; পরিশিষ্ট (ছ)।

কৃত্রিম রেশম

নকল সিল্কের কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বর্ত্তমানে ১ কোটী ৭২ লক্ষ পাউণ্ড তন্তু ৯৫ লক্ষ টাকাতে আসিতেছে এবং নিছক নকল সিল্কের প্রস্তুত বস্ত্রাদি প্রায় ২ কোটি ৮৬ লক্ষ গজ এবং তাহার মূল্য ৯৮ লক্ষ টাকা। তাহা ছাড়া নকল সিল্কের সহিত মিশ্রিত অন্যান্য যৌগিক তন্তুজাত বস্ত্রাদি আসিতেছে এবং ইহাদের সম্মিলিত মূল্য কিঞ্চিদধিক দুই কোটী টাকা।

নকল সিল্কের আন্দাজ ৯০ ভাগ জাপান দেয়। ১৯১৮-১৯ সালের সরকারী হিসাবে নকল সিল্ক স্বতন্ত্র আসন পায়, জাপান তখনও ভারতের ক্ষেত্রে আসিয়া পদার্পণ করে নাই। ১৯২৬ সালে জাপানের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা সুরু হয়, তখন ইটালীর স্থান ছিল প্রথম, এখন তাহা জাপানের বহু পিছনে পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই; এদিকে কত বড় বিরাট বাজার পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দখল করিবার কোনও চেষ্টা নাই।

রেশমের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; মোটামুটি ইহা সকলেরই জানা আছে। রেশমী বস্ত্র শুচি বলিয়া ইহা পূজাদির কার্য্যে পরিহিত হইয়া থাকে। টেঁকসই, মোলায়েম প্রভৃতি গুণের জন্য ইহার আদর খুবই বেশী। ধনীর ঘরে ইহার প্রচলন বেশী, কারণ ইহা অন্য তন্তু অপেক্ষা মূল্যবান। আমেরিকায় মহিলাদের পা-জামা এবং পোষাক করিতে বহু রেশম লাগে; তাহা ছাড়া এখন বর্ষাতি (waterproof) করিতে রেশমের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। পশমের সহিত মিশাইয়া গরম কাপড় হইতেছে এবং ইহা অমিশ্র পশমের কাপড় অপেক্ষা অপরিবাহী (non-conductor) বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জাপানে রেশম অত্যন্ত সস্তা হওয়ায় গরম কম্বলে লাগিতেছে। এই কম্বল নরম, গরম, ধূলাবিহীন এবং কীটের উপদ্রব হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত। মস্তক আবরণের দ্রব্যাদি, টুপী প্রভৃতি (silk Panama hats) তৈয়ারী হইতেছে। রেশমের সূতায়, নানা প্রকার আঠা (gelatin) লাগাইয়া রেশম কঠিন করিয়া লইয়া তাহাতে এই সকল প্রস্তুত হয়। মাছ ধরা জালে এমন কি বড় "টানা জাল" এবং দ্রব্যাদি ঢাকা দিবার জন্য ত্রিপল তৈয়ারী করিতে রেশম দেখা দিয়াছে। যদিও দাম বেশী পড়ে, তথাপি অধিক কাল স্থায়ী, হাল্কা এবং ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখিবার স্থান কম লাগে বলিয়া রেশমী জাল ও ত্রিপল প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। রেশম শীঘ্র শুকাইয়া যায় বলিয়া, ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগী। এ সকল কার্য্যের জন্য বরাবরই তূলা বা শণ ব্যবহৃত হইত। তাহার উপর এরোপ্লেন হইতে অবতরণের জন্ম প্যারাসুট (parachutte) এবং বারুদের জন্ম হাল্কা ব্যাগ ও তৈয়ারী হইতেছে। সুইজারলণ্ড হইতে পূর্ব্বে আটা ময়দা ছাঁকিবার জন্য যে চালনী ব্যবহার হইত, এখন রেশমী চালনী তাহা দূর করিতেছে।

ব্যবহার

রেশম অথবা রেয়ন হইতে নক্সা করিবার বস্ত্র বা কাগজ (tracing cloth), নানারূপ মোটা সূতা, দড়ি, মোটরের চাকা, জানালার খড়খড়ি, টেনিস র‍্যাকেটের 'তাঁত', টাইপরাইটের ফিতা, মশারির জালি-কাপড়, তোয়ালে, জুতা, ইলেকট্রিক তারের আবরণী প্রভৃতি সবই তৈয়ারী হইতেছে। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষত বাঁধিয়া দিবার জন্য রেশমী সূতার প্রয়োজন। একেবারে রদ্দি রেশম নানা প্রক্রিয়ায় একপ্রকার আকার ধারণক্ষম কৰ্দ্দম-কোমল পদার্থে (plastic material) পরিণত হইতেছে ; ইহা বিদ্যুৎরোধক বলিয়া বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বল্প ওজনের এবং অপেক্ষাকৃত কম দাহ্য করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে পারায়, ইহা নানারূপ কাজে লাগান সম্ভব হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ বা জান্তব তন্তুর মধ্যে রেশমই সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত বা দৃঢ় ; এমন কি ইহা সমস্থূল ইস্পাতের তারের এক তৃতীয়াংশ শক্তি ধারণ করে। বিদ্যুৎ-রোধক বলিয়া ইহা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি ও 'তার' (cable) প্রভৃতিতে লাগে।

রেশমকীট ও উন্নত ধরণের গুটী পালন সম্বন্ধে জগতে বহু প্রকার উন্নত শিক্ষা ও প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এ বিষয়ে এখনও বহু পিছনে পড়িয়া আছে। তাহা ছাড়া এই যে বিদেশী রেশম আসিয়া দেশের শিল্প নষ্ট করিয়া দিতেছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার ভার সরকারের উপর। যদি এখনও রক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হয় এবং সবল ও নীরোগ কীট আনিয়া দেশ মধ্যে তাহার আরও উন্নতি বিধানের চেষ্টা করে, তাহা হইলে বৎসরে চারিবার গুটী পাইয়া ভারতবর্ষ জাপান ও অন্যান্য দেশকে সহজেই হটাইয়া দিতে পারে।

উপসংহার

পরিশিষ্ট

(ক)

(১৯৩৮)

পৃথিবীতে উৎপন্ন রেশমের পরিমাণ

		পরিমাণ লক্ষ পাউণ্ড			পরিমাণ লক্ষ পাউণ্ড
জাপান	...	৮,৬৭	গ্রীস	...	৬
ইটালী	...	৪৪	তুরস্ক	...	৬
রুশ গণতন্ত্র	...	৪০	বুলগেরিয়া	...	৪
কোরিয়া	...	৩৯	ফ্রান্স	...	১

চীন ও ভারতবর্ষের উৎপন্ন রেশমের সঠিক পরিমাণ জানিবার উপায় নাই।

(খ)

১৮০৯-১০ হইতে কয়েক বৎসরে

বাঙ্গলা দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীতে সংগৃহীত এবং ইংলণ্ডে বিক্রীত

রেশমের পরিমাণ ও মূল্য

		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৮০৯-১০	...	২,৪৩৩·৩	...	৫৫,০২
১৮১১-১২	...	৩,৭৭৭·৪	...	৮০,৩১
১৮১২-১৩	...	৬,৩৩৩·০	...	১,২৬,৯৭
১৮১৩-১৪	...	৮,১১৯·০	...	১,৪২,১৯

(অনুসৃত)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৮১৪-১৫ …	৬,২৪·২ …	১,২০,৫৩
১৮১৬-১৭ …	৬,১৬·২ …	৮৫,১৪
১৮১৮-১৯ …	৬,৯২·৬ …	১,৩৪,৮৮
১৮২০-২১ …	৭,০৬·৩ …	১,০০,৩২
১৮২২-২৩ …	৮,৪৪·৫ …	১,২৬,৯৭
১৮২৪-২৫ …	৭,২৬·০ …	১,১৩,৯৯
১৮২৬-২৭ …	৯,৫৮·৬ …	১,১০,৬৬
১৮২৭-২৮ …	১০,৪৭·৯ …	১,৩৫,৯৯
১৮২৮-২৯ …	১০,১২·০ …	১,২৭,৫০
১৮৩০-৩১ …	১০,৭৯·৭ …	১,১৬,৮২

(গ)

রপ্তানী—রেশম ও রেশম জাত বস্ত্রাদি

১৮৪৯-৫০ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য

	রেশম		রেশমী বস্ত্রাদি	
	হাজার পাউণ্ড	(*) হাজার টাকা	হাজার গজ	(†) হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০		৯৯,৯১		৬৬,২৬
১৮৫৪-৫৫		৭৫,০২		৩৯,৫৩
১৮৫৯-৬০		১,২২,২৮		২৮,৭৩
১৮৬৪-৬৫	১৫,৮২	১,৭৪,৮৮		১৫,৯৯
১৮৬৭-৬৮	২২,২৬	২,৩৩,৪৩		১৪,৬০
১৮৬৯-৭০	২৫,৯৪	২,৩৪,২৩		২১,৩১

(অনুসৃত)

	রেশম		রেশমী বস্ত্রাদি	
	হাজার পাউণ্ড	(*) হাজার টাকা	হাজার গজ	(†) হাজার টাকা
১৮৭৪-৭৫	৪৭,৩১	১,১৯,৫০		৩৮,৩২
১৮৭৯-৮০	১৬,৭৩	৬০,৪৩		২৪,৮৮
১৮৮৪-৮৫	১৭,০৯	৫০,৯৩		৩৫,৯৫
১৮৮৯-৯০	২২,০৬	৬৭,৩৮		৫১,৮৫
১৮৯৪-৯৫	১৪,২৬	৫২,৭২	১৭,১৮	২৫,৭৩
১৮৯৯-০০	২০,৩১	৬৯,৮৬	১৪,৩৯	১২,৮৯
১৯০৪-০৫	১৩,৪৪	৪৯,৭০	৬,৯৮	৭,৩১
১৯০৯-১০	২০,৭৬	৫০,৭৬	৭,৮৭	৮,১৭
১৯১৪-১৫	৫,১৬	১১,৯১	৩,৬৭	৩,৪৫
১৯১৯-২০	১৪,৫১	৪১,৩১	৩,৭২	৫,৬২
১৯২৪-২৫	১৬,৪৬	৩৮,০৭	১,৮৭	২,৯৫
১৯২৯-৩০	১৩,৪১	৩০,০০	২,৮২	২,৩১
১৯৩৪-৩৫	৬,৮৭	২,৬০	২,০১	১,৯৯
১৯৩৬-৩৭	৬,৭৭	৪.১২	৭,১৬	২,৮৩
১৯৩৮-৩৯	৩,৬৩	২,৩৮	২,৪১	১,৮৯

ইদানীং এই পরিমাণের মধ্যে খাঁটী রেশমের অংশ অতি সামান্য; অধিকাংশই রেশম ও গুটী। গত পাঁচ বৎসরের মোট পরিমাণের মধ্যে খাঁটী রেশমের অংশ নিম্নে দিলাম :—

	মোট—হাজার পাউণ্ড	খাঁটী রেশম হাজার পাউণ্ড
১৯৩৪-৩৫	৬,৮৭	২৩
১৯৩৫-৩৬	৯,৭৯	৫৩
১৯৩৬-৩৭	৬,৭৭	৬৪

	মোট—হাজার পাউণ্ড	খাঁটী রেশম হাজার পাউণ্ড
১৯৩৭-৩৮	৪,৫০	১৬
১৯৩৮-৩৯	৩,৬৩	৩৮

† পূর্ব্বে অমিশ্র রেশমী বস্ত্র অধিক যাইত। পরে অন্য তন্তুর সহিত মিশাইয়া প্রস্তুত বস্ত্রাদির মোট পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে মোট বস্ত্র এবং অমিশ্র রেশমী বস্ত্রের পরিমাণ নিম্নে দেখান হইল :—

	মোট হাজার গজ	অমিশ্র রেশমী বস্ত্র হাজার গজ
১৯৩৪-৩৫	২,০১	১,১০
১৯৩৫-৩৬	৩,৯৪	৭১
১৯৩৬-৩৭	৭,১৬	১,০৩
১৯৩৭-৩৮	৫,০৩	১,৩৮
১৯৩৮-৩৯	২,৪১	৮৯

(ঘ)

আমদানী—রেশম ও রেশমজাত বস্ত্রাদি

১৮৪৯-৫০সাল হইতে বিশিষ্ট কয়বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য

	রেশম		রেশমী বস্ত্রাদি *	
	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	হাজার গজ	হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০		২৭,৬২		১৬,৮৯
১৮৫৪-৫৫		৩৯,১২		২৯,৬৩
১৮৫৯-৬০		৪৬,১৩		১২,৮৩
১৮৬৪-৬৫	১২,৭৬	৪৯,৪০		২৯,৫৮

* ইহার মধ্যে রেশমী সূতা, রেশম ও অন্যান্য তন্তু মিশ্রিত বস্ত্রাদি গেঞ্জি, মোজা, প্রভৃতি পড়ে। রেশমী সূতার (yarn) মূল্য :—১৯৩৬-৩৭ সালে ৬১ লক্ষ টাকা, ১৯৩৭-৩৮ সালে ৬১ লক্ষ এবং ১৯৩৮-৩৯সালে ৩২ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের জন্য জাপান পূর্ব্বের মত রেশম রপ্তানী করিতে না পারায় ১৯৩৮-৩৯ সালে অঙ্কের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে।

(অনুসৃত)

	রেশম		রেশমী বস্ত্রাদি	
	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	হাজার গজ	হাজার টাকা
১৮৬৯-৭০	২০,১৭	১,৩৫,১৭	২৭,১১	৬৯,৯৯
১৮৭৪-৭৫	২৪,০৯	১,৩০,৯৪	৭১,৫৯	১,০৬,৫৭
১৮৭৯-৮০	২০,০৫	৬৮,৩২	৮৫,০৩	৮৩,৭৯
১৮৮৪-৮৫	১৮,৩২	৭৪,৭৬	১,২০,৮০	১,২৭,৩৪
১৮৮৯-৯০	২৩,৬০	১,০৬,৭০	১,৫৪,০৫	১,৭৭,৮১
১৮৯৩-৯৪	২৯,৪৮	১,৩৬,০২	১,৬৪,১৯	১,৮২,৭৯
১৮৯৪-৯৫	২৪,৯৪	১,০৩,৬৫	১,৩৮,৮৮	১,২৭,৭৪
১৮৯৯-০০	১৬,৯৫	৫৭,৬১	১,১৮,৪৫	১,১২,৯৮
১৯০৪-০৫	১৮,৫৯	৭৩,৪১	২,৪৮,৫৭	২,১১,৮১
১৯০৯-১০	২৩,২০	৯৭,৭০	২,৬২,৩১	২,৭৬,৪৬
১৯১২-১৩	৩৫,৭৯	১,৬৬,৪৫	৩,১৩,৩৬	৩,০৫,৩১
১৯১৪-১৫	২৩,০৩	১,১৩,৩৫	৩,৫৫,০২	১,৯৬,৮৯
১৯১৯-২০	২৩,৪৩	১,৭৭,১৯	৩,০১,৪৯	৫,৯২,৪৩
১৯২০-২১	১৯,৩৮	১,৬৩,২২	২,৪৩,৪৬	৫,৫৯,৩১
১৯২৪-২৫	১৪,১৪	১,১৯,০০	১,৭৮,৯৮	৩,৭১,২০
১৯২৯-৩০	২১,৭৫	১,২৩,১৩	২,৫৯,১৫	৩,৩৫,৩০
১৯৩২-৩৩	৩১,৮৬	১,১৭,০৯	৪,৫০,৬১	৩,১৬,১০
১৯৩৩-৩৪	২৩,৭৯	৭১,৭৪	৫,০৯,৭৭	২,৮৬,৮৬
১৯৩৪-৩৫	২২,১৭	৫৭,৩৮	৪,৬৭,১১	২,৭৯,৭২
১৯৩৬-৩৭	১৯,৭৪	৬৪,৪১	২,৭৭,৯৫	১,৭৭,৪৫
১৯৩৭-৩৮	২৫,৩৫	৯৪,৬৭	২,৯৮,৯৯	১,৯০,৯০
১৯৩৮-৩৯	২২,৪৮	৬২,১৭	২,২৭,৬২	১,৩১,৯৬

(ঙ)

(১৯৩৮-৩৯)

আমদানী—রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি

মোট—১,৯৪,১৪,২৮৯ টাকা

(চীন ও জাপানের যুদ্ধের জন্য আমদানী হ্রাস পাইয়াছে)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	%.
রেশম, গুটী, ইত্যাদি ...	২২,৪৮ ...	৬২,১৭	৩২·০
রেশমী সূতা ...	১১,২০ ...	৩২,১৬	১৬·৬
রেশমী বস্ত্রাদি ...	১৩,৬৭ † ...	৬৭,৪৪	৩৪·২
রেশম ও অন্য তন্তু মিশ্রিত বস্ত্রাদি	৬,৮৫ ‡ ...	৩০,৯১	১৫·৪
গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি .	... ...	৯৫	—
সেলায়ের সূতা ...	... ...	২৮	—

† ১,৬৮,৭৩,০৫৬ গজ ... ‡ ৫৮,৮৮,৭৯৪ গজ

(চ)

আমদানী— বিক্রেতার নাম ও অংশ *

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
জাপান ...	৯৬,৭০ ...	৪৯·৮
চীন ...	৬১,৮৯ ...	৩১·৯

ইটালী, ব্রিটেন ও অপরাপর।

* সূতা, মোজা গেঞ্জি প্রভৃতি বিক্রেতার অংশ, এই অঙ্কে নাই। জাপানই সকলের প্রধান।

(ছ)

রেশমের মূল্য

১৮৬১ হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

(প্রতি সের—১'৮৬ পাউণ্ড—বিদেশী কুঠী ও কাশিমবাজারের ছড়ি)

সাল	টাকা	আনা	সাল	টাকা	আনা
১৮৬১	১৭	১২	১৯১০	১৩	১০
১৮৬৫	২১	০	১৯১৫	১৫	১২
১৮৭০	২৬	৬	১৯২০	২৮	০
১৮৭৫	১৩	৮	১৯২২	৩৩	৮
১৮৮০	১৯	১২	১৯২৩	৩৬	৮
১৮৮৫	১৩	০	১৯২৫	২০	১২
১৮৯০	১৮	৪	১৯৩০	১৫	৮
১৮৯৫	১৫	৬	১৯৩১	১০	১২
১৯০০	১৮	৪	১৯৩৩	৯	০
১৯০৫	১৬	০	১৯৩৭	১২	৮

শণ (Sann Hemp)

ভারতবর্ষে শণের ব্যবহার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেকে মনে করেন যখন তূলার বস্ত্র প্রচলিত হয় নাই, তখন হইতে শণের বিষয় লোকে অবগত ছিল। বর্ত্তমানে ভারতে যে জাতীয় শণ দেখা যায়, তাহা এই দেশেই প্রথম জন্মলাভ করিয়াছে। অপরাপর দেশে নানাপ্রকার শণ প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহার চাষও এই দেশে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে। ফলে, একই দেশে নানারকম শণের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

পুরাতন পরিচয়

বিদেশী বণিকের হিসাবে ১৭৭৪ সালের পূর্ব্বে ভারতীয় শণের উল্লেখ নাই। আয়রনসাইড নামে ভদ্রলোক শণবৃক্ষের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, উক্ত বৃক্ষের ছাল হইতে নানারূপ রজ্জু, প্যাকিং কাপড়, জাল প্রভৃতি তৈয়ারী হয় এবং পুরাতন হইলে ইহা হইতে দেশের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জাতির বিভিন্নতা

জগতের বাজারে নানা নামে শণের প্রচলন আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; (১) গাঁজা-ভাঙ্গ-সিদ্ধি গাছ—Cannabis sativa or True hemp; (২) শণ, ফুল শণ, ভাগা শণ, চুণ পাট ইত্যাদি—Crotalaria juncea or Sann hemp. ইহা ছাড়া শিশল—Agava sisalana এবং বিম্‌লিপট্টম পাট—Hibiscus cannabinus or Deccan sann এবং আরও অন্যান্য নামে শণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানিলা, মরিসস্‌, "ধনুর্গুণ" বা bowstring ইত্যাদি নামেও পণ্যের বাজারে শণের পরিচয় আছে।

চাষের প্রধান কেন্দ্র

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শণ ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি, কোথাও হইতে বীজ আমদানী করিয়া চাষ করিতে হয় নাই; ভারতের নানাস্থানে ইহা আপনা হইতেই জন্মলাভ করে। বর্ত্তমানে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মদ্র প্রভৃতি স্থানে প্রচুর শণের চাষ হয়। মদ্রের মধ্যে গোদাবরী, তিনেভেলী ও কৃষ্ণা জেলা এবং করদ রাজ্য হায়দ্রাবাদ—এই কয় স্থান মিলিয়া প্রায় দুই লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়। যুক্তপ্রদেশেও জমির পরিমাণ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গলা, পঞ্চনদ ও বিহার—সমস্ত প্রদেশ মিলিয়াও মদ্রের সহিত সমান হয় না।

বর্ষার প্রারম্ভে জমিতে খুব ঘন করিয়া বীজ ছড়াইয়া দিয়া ভাদ্র-আশ্বিনে চাষ উঠাইয়া লওয়া হয়। ইহাইপ্রধান চাষ; ইহা ছাড়াও প্রায়

সকল সময়েই চাষ করিতে পারা যায় ; চার পাঁচ মাসের মধ্যে গাছ পুষ্ট হইয়া উঠে। শণ গাছ কেবল যে চাষীকে তন্তু দান করে তাহা নহে, ইহাতে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। গো-জাতীয় পশুদিগের খাদ্যেও ইহার ব্যবহার আছে। পাটের ন্যায় জলে ভিজাইয়া বৃক্ষকাণ্ড হইতে তন্তু পৃথক করা হয়।

চাষের কাল

পৃথিবীর বহুস্থানেই শণ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ক্যানাবিস স্যাটাইভা বা ভাঙ্গ-শণ ছাড়া অন্য শণের হিসাব রাখা হয় না। ভারতবর্ষের রপ্তানী অধিকাংশই ফুল-শণ বা Crotalaria juncea. সেই সঙ্গে অবশ্য অন্য শণেরও রপ্তানী আছে ; কিন্তু তাহার পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। বর্ত্তমানে (১৯৩৮-৩৯) রপ্তানীর পরিমাণ ৮ লক্ষ ২০ হাজার হন্দর এবং মূল্য ৭২ লক্ষ টাকা ; পরিশিষ্ট (ক)। বাঙ্গলার চাষের জমির পরিমাণ জানা নাই, কিন্তু এই রপ্তানীর অধিকাংশই বাঙ্গলা বন্দর হইতে চলিয়া যায়। আমাদের দেশে খুব সামান্য পরিমাণ অসংস্কৃত বা কাঁচা শণের আমদানী আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানীর শণের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বাঙ্গলায় ঐরূপ নাম,—বেনারস (কাশী), গ্রীন (সবুজ) বা রায়গড় এবং বাঙ্গলা ; বোম্বাই প্রদেশ,—পিলিভট্, মধ্যপ্রদেশ, দেওগড় এবং গুলবর্গ ; আর মদ্রে,—কচ্চকিনাড়া (Cocanada), গোপালপুর, ওয়ারাঙ্গাল ও উত্তর গোদাবরী (Upper Godavari) নামে পরিচিত।

বাণিজ্যে বিভিন্ন নাম

কতক পরিমাণ শণ রপ্তানীর পূর্ব্বে কারখানায় চিরুণী দ্বারা "আঁচড়াইয়া" (hackled or combed) দেওয়া হয়। তাহাতে অনেক শণ বাদ পড়ে। কিন্তু ঐ মিহি শণের বিশেষ ব্যবহার আছে এবং উচ্চ দরে বিক্রীত হয়।

বোম্বাই ও মদ্র মিলিত হইয়া যত রপ্তানী হয়, বর্ত্তমানে একা বাঙ্গলার রপ্তানী তাহার পাঁচগুণ; পরিশিষ্ট (খ)। বেলজিয়ম ও যুক্তরাজ্য আমাদের প্রধান খরিদ্দার; প্রত্যেকেরই অংশ কুড়ি লক্ষ টাকার কিছু কম বেশী। অর্থাৎ মোট ৭৫ লক্ষ টাকার মালের রপ্তানীর উক্ত দুই দেশ ৪০ লক্ষ টাকার মাল লইয়া থাকে। জার্ম্মাণী, ফরাসী, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি অপরাপর অনেক দেশই ভারতের খরিদ্দার; পরিশিষ্ট (গ)। আমদানী শণের মধ্যে ফিলিপাইন হইতে মানিলা শণই প্রধান; পরিশিষ্ট (ঘ)।

বাণিজ্য

পাট অপেক্ষা সমধিক দৃঢ় হওয়ায় এবং পাট অপেক্ষা জল বা আর্দ্রতা সহনক্ষমতা বেশী থাকায়, পাট অপেক্ষা শণ মূল্যবান এবং অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্যে লাগিয়া থাকে। দড়ি-দড়া সূক্ষ্ম সূতালী, জালের দড়ি বা সূতা, ক্যানভাস কার্পেট প্রভৃতি কার্য্যে শণের বিশেষ প্রয়োজন। জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্যে সূক্ষ্ম শণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অব্যবহার্য্য শণ কাগজের কলে চলিয়া যায় এবং শক্ত কাগজ তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বলিয়া রাখা দরকার। এই শণ তিসি তন্তু (flax) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; প্রচলিত ভাষায় তাহাকেও শণ বলা হইয়া থাকে। রুশ গণতন্ত্র তিসি-তন্তু এবং ভাঙ্গ-তন্তু চাষে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

শণের রপ্তানী

১৮৬১-৬২ সাল হইতে শণ রপ্তানীর স্বতন্ত্র হিসাব রাখা আরম্ভ হয়, তখন ৬০ হাজার হন্দরের অধিক রপ্তানী ছিল না। ১৮৭৪-৭৫ সালে উহা ৮০ হাজার হন্দর হয় (১১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা)। ১৯০০-০১ সালে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার হন্দর

শণ ৩৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকায় পৌঁছে। পরের কয় বৎসরের হিসাব পরিশিষ্ট (ঙ) হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯২৮-২৯ সালের পর হইতে রপ্তানী ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যেরও ভীষণ তারতম্য লক্ষিত হয়। তুলনামূলক তিন বৎসরের হিসাব দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ৫৫ হন্দরের মূল্য গড়ে ৯০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা; পরিশিষ্ট (ঙ)। ১৯২৯-৩০ সালে প্রায় সমপরিমাণ (৪,৩৫ হাজার হন্দর) শণের দাম ৬৮ লক্ষ টাকা হয় এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার হন্দরের দাম ৩১ লক্ষ টাকা হইয়া যায়; পরিশিষ্ট (ক)।

পরিশিষ্ট

(ক)

১৯২৯-৩০ সাল হইতে রপ্তানীর হ্রাস ও বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯৩১-৩২ সালে সর্ব্বাপেক্ষা কম রপ্তানী হইয়াছিল। পরে বাড়িতে থাকে, কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালের পূর্ব্বে ঐ বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

		হাজার হন্দর		হাজার টাকা
১৯২৯-৩০	...	৪,৩৫	...	৬৮,৩৩
১৯৩০-৩১	...	২,৯৩	...	৩৯,৩০
১৯৩১-৩২	...	২,২৪	...	২৬,৯০
১৯৩২-৩৩	...	২,৮১	...	৩২,১৬
১৯৩৩-৩৪	...	৩,৮৮	...	৩৬,০৯
১৯৩৪-৩৫	...	৪,৩৭	...	৩৯,০৩

		হাজার হন্দর		হাজার টাকা
১৯৩৫-৩৬	...	৬,৪৩	...	৬০,৩৪
১৯৩৬-৩৭	...	৭,৬৯	...	৬৯,২৭
১৯৩৭-৩৮	...	৮,৩০	...	৭৪,৫০
১৯৩৮-৩৯	...	৮,১৬	...	৭১,৯৮

(খ)

প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ

	হাজার হন্দর	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	৭,০৭	৬০,১২	৮২·২
মদ্র	৬৮	৭,৩৫	৯·৯
বোম্বাই	৪২	৪,৫২	৭·৭

ইহা ছাড়া শণদ্রব্যজাত দ্রব্যাদি, স্বল্পমূল্যের হইলেও, রপ্তানী আছে এবং তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে :—

১৯৩৬-৩৭	...	৫,৬২৩ টাকা
১৯৩৭-৩৮	...	৫৭,৬০৬ „
১৯৩৮-৩৯	...	৪,২৮৩ „

আমদানী করা শণের একমাত্র বিক্রেতা ফিলিপাইন। ইহা ফুল-শণ কি ভাঙ্গ-শণ তাহার সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু বলা যায় না।

(গ)

ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

	হাজার হন্দর	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বেলজিয়ম	২,৫৩	২১,৯৮	৩০·৫
ব্রিটেন	২,০৫	১৮,২০	২৫·৩

	হাজার হন্দর	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ফ্রান্স	৮০	৭,১৩	৯.৯
জার্ম্মাণী	৫১	৪,৫০	৬.২
গ্রীস	৪৮	৪,১১	৫.৭
ইটালী	৩১	২,৪৬	৩.৪
অপরাপর	—	—	—

(ঘ)

আমদানী শণ (Hemp)

		হন্দর		টাকা
১৯৩৬-৩৭	...	৩৪,৭০৬	...	৫,৮৩,২৩৪
১৯৩৭-৩৮	...	৪৫,৮২৭	...	৮,২৩,১৬০
১৯৩৮-৩৯	...	২৯,৮৩৬	...	৩,৬৮,০০৫

আমদানী—দ্রব্যাদি (Flax)

১৯৩৬-৩৭	...	১৭,০১,৯৫৩ টাকা
১৯৩৭-৩৮	...	২২,৪৬,৯৯৩ ,,
১৯৩৮-৩৯	...	১৭,৯৬,০৩২ ,,

(ঙ)

পাঁচ বৎসরের গড়		হাজার হন্দর		হাজার টাকা
১৯০৯-১০—১৯১৩-১৪	...	৫০৯	...	৭৮,২৭
১৯১৪-১৫—১৯১৮-১৯	...	৫৬১	...	১,১৭,৮৭
১৯১৯-২০—১৯২৩-২৪	...	৪৫৫	...	৯০,৪৪
১৯২৪-২৫—১৯২৮-২৯	..	৫৫৩	...	১,১৬,৬৩

ভাঙ্গ শণ বা ইন্দ্র শণ (Cannbis Sativa)

ভারতবর্ষে যদিও ফুল-শণ (Crotalaria juncea) বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তথাপি ভাঙ্গ-শণ একেবারে উপেক্ষার মত নহে। ইউরোপ অঞ্চলে বিশেষতঃ রুশিয়া, জার্ম্মাণী, লিথুয়ানিয়া, পোলণ্ড, ল্যাটভিয়া, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে এই শণই বেশী এবং ইহাকে সে সকল দেশে True hemp নামে অভিহিত করা হয়।

ইন্দ্রশণ ভারতের প্রায় সকল স্থানেই জন্মিয়া থাকে। রুশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ, জাপান ও উত্তর চীন, হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সকল, বিশেষতঃ কাশ্মীর, কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে এই গাছ আপনা হইতেই জন্মায়। সিন্ধু প্রদেশেও কিছু কিছু চাষ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মনে করেন ইন্দ্রশণ গাছ ভারতের বাহির হইতে কোন সময়ে আনীত হইয়া থাকিবে।

প্রাপ্তি স্থান

এই গাছগুলির ত্বক, বীজ, পত্র ও আঠা সবই কাজে লাগে। মূলতঃ তন্তুর জন্য ইহার পরিচয় বেশী। বীজ ও বীজের তৈল মানুষের বিশেষ প্রয়োজনীয়; এ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ "ভারতের পণ্য" প্রথম খণ্ডে † দেওয়া হইয়াছে। ইহার নানা অংশ হইতে তিন প্রকার মাদক শক্তিসম্পন্ন বস্তু পাওয়া যায়। গাছের পত্র ও নূতন মুকুল শুষ্ক করিয়া ভাঙ্গ, সিদ্ধি বা বিজয় প্রস্তুত হয়। এই "বিজয়" নাম হইতে শারদীয়া দুর্গা পূজার বিজয়ার দিন ইহা খাইবার রীতি প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় *।

ব্যবহার

† ১৮৫ পৃষ্ঠা।

* সামান্য পরিমাণ সেবনে যে নেশা হয়, রাবণ বধের আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া হিন্দুরা ঐ দিন মৃদু উত্তেজনা দ্বারা আনন্দলাভের জন্য ব্যবহার প্রচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

সিদ্ধির পরই চরসের স্থান। পাতায়, ডালে, ফুলের ডাটায়, জটায় এবং ফলে যে আঠাল পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে চরস বলা হয়। গাছে ফুল আসিবার মুখে স্থানে স্থানে ঈষৎ সবুজ রঙের আঠা দেখা দেয় এবং লোকে তাহাই সংগ্রহ করে। স্ত্রী-বৃক্ষের ফুলের জটা শুষ্ক করিয়া লইলে গাঁজা পাওয়া যায়। ফুলের 'ঝুরির' গাত্রে যে আঠাল পদার্থ বাহির হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাই ইহার উগ্র মাদকতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সিদ্ধি, চরস, গাজা

গাছগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পাঁচ হইতে পনের ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং ইটালীতে কুড়ি ফুট লম্বা গাছও দেখা যায়। বিদেশীয় পণ্ডিতদের মতে পুং ও স্ত্রী পুষ্প স্বতন্ত্র গাছে ফুটিয়া থাকে এবং পুং-পুষ্পধারী বৃক্ষের তন্তু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হয়। ভারতবর্ষে যে সকল গাছে ফুল, মঞ্জরী প্রভৃতি বেশী পরিমাণে জন্মে, সেই সকল গাছ হইতে উৎকৃষ্ট তন্তু পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে এই বৃক্ষের তন্তু মোটেই বাণিজ্যোপযোগী পণ্য বলিয়া মনে করা হয় না।

বৃক্ষ পরিচয়

পাট ও ফুল-শণের ন্যায় ভাঙ্গ গাছ জলে ভিজাইয়া কাণ্ড হইতে তন্তু পৃথক করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

আমাদের দেশে মোটা দড়ি দড়া প্রভৃতি শাদাসিধা কাজের জন্য এই তন্তু ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের তন্তু উৎকৃষ্টতর এবং তাহা হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য, শক্তি এবং জল ও আর্দ্রতা সহ্য করিবার ক্ষমতা পাট অপেক্ষা বহু গুণে বেশী। কিন্তু তিসি-তন্তু হইতে ইহার আঁশ কঠিন এবং তাহার নমনীয়তা কম। ইটালীর তন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল; কোমল, উজ্জ্বল এবং সাধারণতঃ ছয় হইতে নয় ফুট দীর্ঘ হয়। যেখানে জলের সহিত

ব্যবহার

সর্ব্বদা যোগাযোগ আছে, সেখানে ভাঙ্গ তন্তুর দড়ি, দড়া, সুতালী প্রভৃতি উপযোগী। কার্পেট তৈয়ারী করিতে ইহার প্রয়োজন সমধিক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইউরোপ অঞ্চলে এই জাতীয় শণ বেশী জন্মায় তন্মধ্যে রুশ-গণতন্ত্রের স্থান সর্ব্বপ্রধান। অন্যান্য দেশের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

রুশ গণতন্ত্র	১,৪৮,৫০০ টন	...	যুগোশ্লাভিয়া	৫০,০০০ টন
ইটালী	১,০৭,০০০ ,,	...	রুমানিয়া	২৭,০০০ ,,

পোলণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি।

বোম্বাই বা দাক্ষিণাত্য শণ (Deccan Sann)

ইহার উল্লেখযোগ্য রপ্তানী নাই, তথাপি ইহা ভারতবর্ষের একটি প্রয়োজনীয় তন্তু মনে করিয়া সামান্য পরিচয় দেওয়া গেল। পণ্যের বাজরে ইহা বিমলি বা বিমলিপট্টম্ পাট বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। বোম্বাই এবং মদ্রে ইহা প্রচুর জন্মে অথচ ইহার জন্য বিশেষ যত্ন ও অর্থব্যয় করিতে হয় না।

ইহার তন্তু পাট হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ; ইহা সমধিক দৃঢ় এবং উজ্জ্বল। কাণ্ডের মূলের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তন্তু পাওয়া যায়। যখন বৃক্ষের ফুল পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই সময় গাছ কাটিয়া ফেলিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তন্তু পাওয়া যায়; ইহাই ইহার বিশেষত্ব। পাট হইতে ইহার এই স্থানে পার্থক্য রহিয়াছে। পাটের ফল পাকিয়া গেলে তন্তু স্বল্পগুণবিশিষ্ট হইয়া পড়ে ; সেই কারণে সবে মাত্র ফুল হইতে ফল ধরিলেই পাট কাটিয়া ফেলা দরকার।

এই শণ উজ্জ্বল কিন্তু মোটা ও কর্কশ এবং নানাকারণেই ইহা পাট হইতে অনেকাংশ ভাল। দড়ি, দড়া, ক্যানভাস প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয় এবং কাগজের কলেও অনেক চালান যায়।

তিসি-তন্তু (Flax fibre)

তিসি তন্তু জগতের একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু ভারতবর্ষে যে চাষ হয়, তাহা কেবল মাত্র বীজের জন্য। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বীজবহুল বৃক্ষে ভাল তন্তু হয় না।

ভারতবর্ষ হইতে তিসি তন্তু রপ্তানী হয় না। কিন্তু তন্তুজাত দ্রব্যাদির কিছু রপ্তানী আছে। বর্ত্তমানে ইহা নিতান্ত কম, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

১৯৩৬-৩৭	...	৪,০৪১ টাকা
১৯৩৭-৩৮	...	১১,৭০০ ,,
১৯৩৮-৩৯	...	২৫,৩১৬ ,,

আমদানী করা শণ তন্তুর দাম বেশী নহে; কিন্তু তন্তুজাত দ্রব্যাদি প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার আসে। উহার মধ্যে ক্যাম্বিস বা ক্যানভাসই বেশী, অর্থাৎ ৮ লক্ষ টাকা। সূতা, সূতালী, কাপড় থলে প্রভৃতি মিশিয়া বাকী দশ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।

১৯৩৬-৩৭	...	১০,১১,৯৫৩ টাকা
১৯৩৭-৩৮	..	২২,৪৬,৯৯৩ ,,
১৯৩৮-৩৯	...	১৭,৯৭,৩৫২ ,,

তিসি-তন্তুর উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে রুশ গণতন্ত্রের স্থান প্রধান। অপরাপর কয়েকটী দেশের নাম ও উৎপন্ন তন্তুর পরিমাণ দেওয়া হইল :—

রুষ গণতন্ত্র	...	৫,৪৪,০০০	টন
পোলণ্ড	...	৩৭,০০০	,,
জার্ম্মাণী	...	৩৪,০০০	,,
লিথুয়ানিয়া	...	৩১,০০০	,,
বেলজিয়ম	..	২২,৫০০	,,
ল্যাটভিয়া	...	২৩,০০০	,,

ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশেও তিসি-তন্তু উৎপাদিত হইয়া থাকে। একা রুশের অংশ শতকরা ৭০ ভাগ।

শিশল (Sisal Hemp)

শিশল বা শিশল শণ যথারীতি উৎপন্ন করিতে পারিলে ভারতের বিশেষ মঙ্গল। অনেক জমিতে অন্য চাষ না হইলেও শিশল হওয়া সম্ভব। মেক্সিকো, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, টাঙ্গানাইকা, যবদ্বীপ, প্রভৃতি দেশে উৎকৃষ্ট শিশল জন্মে। ভারতবর্ষে বোম্বাই, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে শিশল চাষের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু যে জাতীয় বৃক্ষ উৎকৃষ্ট তন্তু দান পারিতে পারে, মনে হয়, তাহার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। এই সকল স্থান অপেক্ষা মহীশূরে চাষ ভালই হইতেছে, এবং সেখানে উৎপন্ন তন্তুর পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। পতিত জমিতে এই চাষ হইতে পারে সুতরাং সে দিক দিয়া আবার বিশেষ সুবিধা আছে। বর্ত্তমানে রেল লাইনের ধারে বহু শিশল গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল পাতা অযত্নে নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের দেশে নানারকম তন্তু জন্মিয়া থাকে এবং চেষ্টা করিলে এবিষয়ে আরও উন্নতি করা সম্ভব এবং প্রয়োজন। ইহাতে যে কেবল বাহির হইতে অর্থ আনা সম্ভব হইবে তাহা নহে, এত টাকায় মালের আমদানী বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

৪

আবাদী ফসল

(Plantation Crops)

'আবাদী ফসল' মোটামুটী ইংরাজি Plantation Crops কথার বাঙ্গলা অনুবাদ। ভারতবর্ষে চাষ ও আবাদ বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র কথার সেরূপ বিভিন্ন অর্থ নাই। আমার মনে হয়, যাহা ওষধি নয়, প্রয়োজন হইলে যে উদ্ভিদকে বৎসরাধিক কাল বাঁচাইয়া রাখা যায় বা সাধারণতঃ যাহারা বাঁচিয়া থাকে, অর্থাৎ পণ্য হিসাবে যাহার মূল্য বুঝিয়া এক স্থানে অনেক বৃক্ষ উৎপাদন করা হয় এবং যাহাকে বাৎসরিক "চাষ" হইতে ভিন্ন করিয়া একটা পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাই আমার মতে 'আবাদী ফসল'। সাধারণতঃ ইক্ষু বা আক ও তামাক চাষ কেন যে বটজাতীয় বৃক্ষ রবারের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত হইল তাহা বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন। গতানুগতিকের ধারামত চা, তামাক, নীল, কফি, রবার, ইক্ষু বা আক, নারিকেল প্রভৃতি কয়েকটী পণ্যের বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইল।

নারিকেল সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় পুস্তকের প্রথম খণ্ডে * দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকটী পণ্যের মধ্যে আকের ব্যবহার বহু দিনের; তাহার পর নীলের স্থান। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যগুলির প্রচলন আধুনিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও পণ্যের তালিকায় টাকার পরিমাণ হিসাবে আবাদী ফসলের স্থান তন্তুর পরেই।

এই কয়টী বস্তু লইয়া ভারতের বাজারে প্রতিবৎসর ৩২ কোটী টাকার, এবং নারিকেল সহ ৩৩ কোটী টাকার, কারবার হয়। তন্মধ্যে রপ্তানী

---

* ১১০ পৃষ্ঠা।

২৮ কোটী টাকা, আমদানী তিন কোটী, সংশ্লিষ্ট চা'র বাক্স ধরিলে চার কোটী টাকা এবং আমদানী মালের পুনঃ রপ্তানী ছয় লক্ষ টাকা।

এই সকলের মধ্যে চা সর্ব্বপ্রধান, অর্থাৎ মোট রপ্তানী ২৮ কোটী টাকার মধ্যে সাড়ে ২৩ কোটি; তাহাব পরেই তামাক। আমদানীতে রবারকে প্রধান স্থান দিতে হয়, কারণ রবারজাত দ্রব্যকে উহার অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। কাঁচা রবার ও কফি রপ্তানীতে টাকার পরিমাণ প্রায় সমান, অর্থাৎ কম বেশ ৭৫ লক্ষ টাকা।

এই সকলের মধ্যে চা'র রপ্তানী এবং চা এবং চা'র বাক্স আমদানীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্য হওয়ায়, এই অধ্যায়েও বাঙ্গলার স্থান প্রধান।

ভারতের আবাদী ফসলের শত্রু চতুর্দ্দিকে, সুতরাং বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর শ্যেন দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় নীলের যে কদর ছিল, যৌগিক (synthetic) নীল তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়াছে।

তণ্ডুল, তৈল বীজ ও তন্তু—প্রত্যেক শ্রেণীর সকলগুলির মধ্যে একটী সাধারণ ব্যবহার আছে; তাহা ছাড়া একই শ্রেণীর পণ্যের বিশেষ গুণ হিসাবে তাহাদের পৃথক ব্যবহার দেখিতে পাওযা যায়। কিন্তু প্রচলিত ব্যবহার হিসাবে আবাদী ফসলের প্রায় প্রত্যেকটীই স্ব স্ব প্রধান। চা আর কফি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া একটীর সহিত অপরটীর কোনও যোগ নাই। সেই হিসাবেও এই অধ্যায়ের একটু স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

বিপদ থাকিলেও, যত্ন করিলে আবাদী ফসলের বাজার আরও বাড়াইতে পারা যায়। তামাক, কফি প্রভৃতি পণ্যগুলির গুণের উপর শ্রেণী বিভাগ করিতে পারিলে জগতের বাজারে আরও সমাদর পাইবার সম্ভাবনা। ভারতে আকের চাষ বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে, কিন্তু বিদেশীয়ের স্বার্থে বহির্ব্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ভারতীয় বণিকের

চেষ্টা যদি সফল হয়, তাহা হইলে শর্করা বাণিজ্যে ভারত আবার পূর্ব্ব স্থান দখল করিতে পারে।

মোট কথা, নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া থাকিবার কাল আর নাই। যেমন বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে আত্মরক্ষা করা দরকার সেইরূপ বিদেশে আপন পণ্যের বাজার বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।

চা (Tea)

বর্ত্তমানে চা ভারতের এক সম্পদ, অর্থাৎ প্রতি বৎসর বহু কোটি পাউণ্ড বাহিরে রপ্তানী হয় এবং তাহাতে বিদেশ হইতে টাকা আসে। ইহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে, অর্থাৎ ২০ কোটি টাকার উপর। প্রকৃতপক্ষে দেশ হইতে যে কয়টি কাঁচা হইতে সংস্কৃত বা প্রস্তুত (manufactured) মাল বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে চায়ের স্থান দ্বিতীয়; প্রধান—পাটজাত দ্রব্যাদি। সম্মিলিত রপ্তানীর হিসাবে পাট ও পাটজাত বস্তু এবং তূলা ও তূলাজাত বস্তুর পরেই চা'র স্থান।

চা'র এ সমৃদ্ধি খুব বেশী দিনের নয়, অর্থাৎ ইহার উন্নতির সুসংবদ্ধ ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তবে চীনদেশে বা ভারতবর্ষে কতকাল হইতে যে চা-গাছ জন্মিতেছে তাহার সঠিক হিসাব আজ আর পাওয়া যায় না।

পুরাতন ইতিহাস

বিদেশী ওলন্দাজ ও ইংরাজ জাতি এদেশে চা'র বিশেষ পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে চা'র ব্যবহার মাত্র চীন দেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল; অন্যত্র নহে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৩৭ সালের চৈনিক অভিধানে চা'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চিয়াং রাজবংশের ইতিহাসে পণ্যরূপে চা পরিচয় লাভ করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে টং

বংশের রাজত্বকালে চা'র উপর নিয়মিত কর ধার্য্য হইয়াছিল ; এ কারণে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃ এই সময় হইতে চা'র নিয়মিত বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন এই কালের পূর্ব্বে চীন দেশে ঔষধরূপেই চা'র প্রচলন ছিল, এবং উত্তেজক পানীয় হিসাবে চা'র ব্যবহার ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম আরম্ভ হয়। ৭৮০ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র চা উপলক্ষ্য করিয়া এক পুস্তক রচিত হয় (চা চিং অর্থাৎ চা কাব্য)। ৯৬০ হইতে ১২৮০ সালের মধ্যে চীনের সকল প্রদেশেই চা'র ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠে।

যতদুর জানিতে পারা যায়, ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে জাপানে চা প্রবেশলাভ করে এবং উহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ওলন্দাজেরা ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে চা লইয়া যায় এবং আনুমানিক ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড হইতে লর্ড আর্লিংটন (Lord Arlington) ইংলণ্ডে চা আমদানী করেন। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যভাবে ইংলণ্ডে চা বিক্রীত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে চা ব্যবহার সম্বন্ধে ম্যাণ্ডেল্‌স্‌স্লো (Albert de Mandelslo)র বিবৃতিই বোধ হয়, প্রথম পরিচয়। তাঁহার মতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে প্রায় একই সময় লোকে চা ব্যবহার আরম্ভ করে। সম্ভবতঃ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতীযদিগকে ব্যাপকভাবে চা ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

বহুদিন পর্য্যন্ত লোকের ধারণা ছিল, চা একমাত্র চীন দেশের সম্পত্তি এবং তথা হইতে নানাদেশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আদিবাস

এ ধারণা যে অমূলক তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে। চীন হইতে ওলন্দাজ কর্ত্তৃক চা রপ্তানী হয় বলিয়া লোকের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। যদি চীনের সহিত কোনও সময় গোলযোগ বাধে এবং ইংলণ্ডে চা আমদানী করিবার

অসুবিধা হয়, সেই আশঙ্কায় ভারতবর্ষে চা-বাগান প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, আসামের জঙ্গলে চা গাছ জন্মিয়া আছে। তাহা হইতে লোকে মনে করে চীন ও ভারতের সংযোগ স্থলে অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে যে স্থলে প্রচুর বারিপাত হয়, অথচ বৃক্ষমূলে জল জমিয়া থাকে না, সেই দেশই চা বৃক্ষের আদি জন্মস্থান। পরে একদিকে যেমন চীন দেশে ছড়াইয়াছে, অপর দিকে আসামের জঙ্গলে আসিয়া বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে, চীন রাজ্যের সহিত কোনও গোলমালের সম্ভাবনায় ভারতে চা'র আবাদ করিবার চেষ্টা হয়। সর্ব্বপ্রথমে ১৭৮৮ সালে ব্যাঙ্কস্ (Sir Joseph Banks) ভারতের উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশে, বিশেষতঃ রঙ্গপুর, কুচবিহার ও বিহারে চা-আবাদ করিবার কথা বলেন; কিন্তু সে কথা তখন চাপা পড়িয়া যায়। ১৮২১ হইতে ১৮২৬ সালের মধ্যে সম্ভবতঃ ১৮২৩ সালে ব্রুস্ (Robert Bruce) আসামের জঙ্গলে প্রবেশ করেন এবং বর্ত্তমান শিবসাগর জেলায় ভারতীয় চা গাছ দেখিতে পান। পরে স্কট্ (Scott) মণিপুরেও চা গাছ আবিষ্কার করেন। ইতিমধ্যে চীন হইতে বীজ আনিয়া ভারতে আবাদ করা সম্ভব কিনা, এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতে থাকে; এবং এই কার্য্যের ভার গর্ডন (J. G. Gordon) সাহেবের উপর পড়ে। কিন্তু চাল টন্ (Capt. Charlton) প্রমাণ করেন যে, চা গাছ ভারতের নিজস্ব সম্পদ এবং ইহা আমদানী করা যে কোনও প্রকার চা অপেক্ষা কোনও রকমে নিকৃষ্ট নহে, হয়ত বা তাহা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন। এই কার্য্যের জন্য ১৮৪২ সালে ভারতীয় কৃষি সমিতি (Agricultural & Horticultural Society of Bengal) হইতে তাঁহাকে সুবর্ণপদক প্রদান করা হয়। বলা বাহুল্য,

ভারতে চা'র প্রথম পরিচয়

ইহাতে কোম্পানীর বহু অর্থ ও ক্লেশ বাঁচিয়া যায়; এবং ভারতের চা বিক্রয় করিয়া চার্লটনকে প্রদত্ত পদকের সামান্য সুবর্ণের পরিবর্ত্তে বহু কোটি গুণ স্বর্ণমুদ্রা তাহারা আহরণ করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছে।

এই সকল অনুসন্ধানের সঙ্গে আসামে আবাদ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে এবং ১৮৩৬ সালে ব্রুস্‌কে (C. A. Bruce) আসামের বাগানের কর্ম্মাধ্যক্ষ বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়।

আবাদ প্রতিষ্ঠা

অনেক বিতর্ক ও বিবরণী লেখা চলিতে থাকে এবং আসামে কয়েকটি সরকারী বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৮ সালে ভারতীয় চা ইংলণ্ডে প্রথম রপ্তানী হয় এবং এই সময় স্থির হয় যে, সরকারী বাগান তুলিয়া দিয়া কোনও বে-সরকারী সাধারণ ব্যবসায়ীকে চা'র আবাদ করিতে সুযোগ দিলে অনেক অসুবিধার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। ১৮৩৯ সালে ৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে 'আসাম কোম্পানী' (Assam Company) স্থাপিত হয় এবং পর বৎসর তাহাদের নিকট শিবসাগর (জয়পুর) বাগান ও অন্যান্য সরকারী বাগান বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। দার্জ্জিলিঙ ও চট্টগ্রামে ১৮৪০ সালে, কাছাড়ে ১৮৫৫ সালে, তেরাই অঞ্চলে ১৮৬২ এবং ১৮৭৪ সালে পশ্চিম ডুয়ার্সে (Western Dooars) বহু বাগান আরম্ভ হয়। ১৮৫৩ সালে দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে আবাদ সুরু হয়। সেখানে এখনও অনেক আবাদ বাঁচিয়া আছে; পরে ইহার সমস্ত পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

নীল আবাদ করার সহিত এদেশীয় লোকের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার গিয়াছে, চা আবাদের সঙ্গেও অনুরূপ কাহিনী গ্রথিত আছে।

কলঙ্ক কাহিনী

এ ইতিহাস হয়ত আরও মসীলিপ্ত। নীলের আবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে লোকালয় ছিল, সুতরাং তাহাদের অত্যাচারের কাহিনী বাহিরের লোকেও জানিতে পারিত।

নীলকুঠীতে যে অত্যাচার চলিত, লোকে ফিরিয়া আসিয়া আবার অপরের নিকট গল্প করিত। নির্য্যাতনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণও লোক-সমক্ষে প্রচার হইয়া পড়িত। কখনও কখনও যে 'সত্য গোপন করা' হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু আসামের কুলীদের কাহিনী আরও করুণ, আরও হৃদয়বিদারক। 'আড়কাঠী' চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিকার ধরিয়া বেড়াইত। অর্থলোভে, সাহেবদের উৎসাহে, তাহাদের কোন কুকাজই অসাধ্য ছিল না। দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরক্ষর লোকদের ধরিয়া 'রাতারাতি' ধনী করিয়া দিবার প্রলোভনে অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করাইয়া বা তাহদের নাম জাল কবিয়া একবার চা-বাগানের পথে ঠেলিয়া দিতে পারিলে আড়কাঠিরা নিশ্চিন্ত; কিন্তু যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহাদের অনেকের ভাগ্যেই প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইত। প্রথমে চা-বাগান লাভজনক হয় নাই; ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। সেই কারণে কুলি মজুর-দিগের নিকট হইতে বেশী কাজ পাইবার আশায় তাহাদের উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা অমানুষিক। অস্বাস্থ্যকর আসাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে লোকে আসামের কালাজ্বরে বা কালজ্বরে পড়িত; বিনা শুশ্রূষায়, বিনা চিকিৎসায়, আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুর সহিত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত; তাহার সহিত কখন অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিত, তাহার হিসাব রাখিবার লোকও ছিল না, সুযোগও ছিল না। কুলী রমণীর উপর নানা অত্যাচারের কাহিনী দুর্ভেদ্য বনানীর মধ্য দিয়াও শহরে কচিৎ আসিয়াছে, কিন্তু বিদেশীর নিকট তাহাদের স্বজাতীয়ের বিচারে যে ফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। এমন প্রবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, আসামের কুলীদের প্লীহা বিবৃদ্ধিলাভ

করিতে করিতে স্বতঃই ফাটিয়া যায়, আর মিথ্যাবাদী ভারতবাসী দোষারোপ করিয়া ইউরোপীয় জাতির নামে অযথা কলঙ্ক দিয়া থাকে।

এই সকল ঘটনা এত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সাধারণ লোকে সুবিচারের কথনও আশা করিত না। লোকালয় হইতে দূরে বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা শহরে আসিয়া পৌঁছিত না। স্থানীয় জনমত বলিতে কিছুই ছিল না, কারণ ঐ সকল আবাদ জনবহুল স্থান হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং "নীলের বিদ্রোহের" মত কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। এক কথায় বলা যায়, চা-বাগানের কুলীর দুর্দ্দশার সহিত আর কোনও মজুরের দুর্দ্দশার তুলনা হয় না।

চা'র বীজ লইয়া "বীজতলা" বা হাপরে প্রস্তুত করিয়া তথা হইতে তুলিয়া প্রয়োজনানুসারে ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। এই বীজতলার জন্য বিশেষ উর্ব্বর জমির প্রয়োজন। যে সকল গাছ হইতে বীজ সংগৃহীত হয়, তাহাদিগকে ছাটিয়া দেওয়া হয় না বিনা বাধায় বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ সুযোগ পাইলে গাছগুলি পনেরো হইতে বিশ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ দশ হইতে বারো হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। উত্তর ভারতে সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ গাছে ফুল দেখা দেয় এবং বীজগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়া যায়। ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চ মাসে গাছে আর একবার ফুল ফুটিয়া থাকে। অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে নভেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত বীজগুলি সংগৃহীত হইলে মার্চ্চ মাস নাগাদ রোপণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ পরিপুষ্ট বীজ বেশী দিন পড়িয়া থাকিলে তাহার অঙ্কুরিত হইবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। নভেম্বর মাসের চারা সাধারণতঃ ছয় মাস বাদে স্থানান্তরে রোপণ করা হয়। কথনও কথনও এক বৎসর পর্য্যন্ত বীজতলায় চারা রাখিয়া দিতে দেখা যায়।

আবাদের কাল

চা আবাদের জন্য খুব ভাল জমি তৈয়ার করা প্রয়োজন এবং গাছও চার পাঁচ ফুট অন্তর রোপণ করা যুক্তিযুক্ত। নূতন গাছের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান জঙ্গল ও ঝোপ হইতে মুক্ত করিয়া রাখিতে হয়, নচেৎ গাছের বৃদ্ধির অসুবিধা ঘটে। বিশেষভাবে সার দিয়া গাছ সতেজ রাখিলে তবে অধিক পরিমাণে পাতা পাওয়া যায়।

গাছ ঝোপের মত হইলে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা বেশী হইলে কচি পাতা অধিক মাত্রায় পাইবার সম্ভাবনা। সেই কারণে গাছগুলি আন্দাজ এক বৎসরের হইলে তাহার শিরোভাগ ছাটিয়া দিলে, কাণ্ড হইতে তিন চার বা ততোধিক ক্ষুদ্র শাখা বাহির হয়। সেই গুলিকে দুই তিন বৎসর বাড়িতে দিলে, আবার ছাটিয়া দেওয়া হয়। পরে প্রতি বৎসরই পূর্ব্ব বৎসরের শাখার উপরিভাগ এক বা দুই ইঞ্চি বাড়িতে দিয়া উহা ছাটিয়া দেওয়া হয়। আট দশ বৎসরের গাছ হইলে তখন মাটির উপর হইতে কাণ্ডের দেড় বা দুই ফুট রাখিয়া সমস্ত অংশ কাটিয়া ফেলা হয়। যাহাতে খুব অধিক পরিমাণে পাতা জন্মিতে পারে, সেই কারণেই এইভাবে শাখা ছাটিয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

গাছ ছাটিয়া দেওয়ার পর দুই তিন মাস নূতন ডাঁটা ও পাতাগুলিকে বাড়িতে দেয় এবং তিন হইতে ছয় পাতার কচি প্রশাখা নির্গত হইলে

চা পাতা তৈয়ারী

মজুর দিয়া উহার দুই তিনটি পাতা ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়। ইহার দুই তিন মাস বাদে আবার দুই তিনটি পাতা সংগ্রহ করা হয়। এইভাবে কাজ চলিতে থাকে এবং সমস্ত বৎসরে বিশ হইতে ত্রিশবার পর্য্যন্ত পাতা সংগৃহীত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ মার্চ্চ মাসের শেষভাগ হইতে মজুররা কার্য্যারম্ভ করে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কাজ জোরে চলে এবং পাতার পরিমাণও খুব বেশী হয়।

পাতা তুলিয়া আনিয়া নিস্তেজ, অর্দ্ধ শুষ্ক বা অবসন্ন (withering) করিবার জন্য ছায়াযুক্ত স্থানে কাপড়, বাঁশ বা তারের "মাচানের" উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। কোথাও বা তপ্ত বায়ু দিয়া শুকাইয়া লয়; অর্দ্ধ শুষ্ক করিতে বেশী সময় লাগিলে চায়ের গুণ হ্রাস পায়। পাতাগুলি অর্দ্ধ শুষ্ক রাখিবার সময় তাহার মধ্যে যে রস থাকে তাহা গাঁজিয়া বা মাতিয়া (fermentation) উঠে; সুতরাং যাহারা এই কাজ ভাল পারে, তাহাদের চা অধিক গুণসম্পন্ন হয়।

ইহার পর চায়ের পাতাগুলি পাকাইয়া গোল করিয়া লওয়া দরকার। পূর্ব্বে হাতের তালুর মধ্যে পাকাইয়া লওয়া (rolling) হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় সমস্তই "রোলিং" যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। হাতের বা যন্ত্রের চাপে কতকটা রস নিঙ্‌ড়াইয়া উপরে উঠে এবং বায়ুর সহিত মিশিয়া গুণপ্রাপ্ত হয়। তখন পাতাগুলির বর্ণ ও গন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কোনও কোনও বাগানে এই সময় fermenting room-এ পাতাগুলি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে।

ইহার পরই পাতাগুলি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিবার (firing); জন্য যে রূপেই হউক উত্তপ্ত বায়ু পাতাগুলির উপর প্রবাহিত করা হয়। আজকাল এই কার্য্যে যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। তখন পাতাগুলি নানাভাবে (grading) বিভক্ত হয় এবং বিভিন্ন নামে বাজারে পরিচয় লাভ করে। পিকো (Pekoe) ও ছুচাং (Souchang) নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিভিন্ন গুণে Pekoe, Orange Pekoe, Broken Pekoe, Broken Orange Pekoe, Souchang, Pekoe Souchang প্রভৃতি এবং গুঁড়া চা মোটামুটি Broken Tea বলিয়া বিক্রীত হয়। Fannings, Dust প্রভৃতি ইহাদের অন্য আকার।

এ সমস্তই (Black Tea) কালা-চা। অন্যান্য ক্ষুদ্র বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিলেও হরিৎ চা (Green Tea) ও "ব্রিক্ টি" (Brick Tea) নামে আরও দুই প্রকার চার পরিচয় থাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে "গ্রীন্-টি" প্রধান। কালা-চা সহজেই বিক্রয় হওয়ার জন্য সবুজ-চা ভারতবর্ষে বেশী তৈয়ারী হয় না; ইহার মোট পরিমাণ আন্দাজ ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। সবুজ-চা তৈয়ারী করিতে হইলে পাতার রস গাঁজাইয়া (fermentation) উঠিতে দেওয়া চলিবে না। সেই কারণে পাতাগুলি তুলিয়া আনিবার পর শুষ্ক বায়ুতে অবসন্ন (withering) হইবার সুযোগ না দিয়া একেবারে উত্তপ্ত বাষ্পদ্বারা শুকাইয়া লওয়া হয়। চা-পাতার পরিমাণ কম হইলে পাত্রে ছাঁকিয়া লওয়ার (panning) ব্যবস্থা আছে; নচেৎ যন্ত্রাদির সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার পর প্রয়োজনমত সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া কৃষ্ণ-চা করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই পালিত হয়।

চায়ের বিভিন্নতা—সবুজ চা

সবুজ-চা উত্তর ভারতের সম্পত্তি, কারণ মোট পরিমাণের চার ভাগের তিন ভাগ পঞ্চনদ (কাঙ্ড়া উপত্যকা) এবং যুক্তপ্রদেশে উৎপাদিত হয়; তন্মধ্যে কাঙ্ড়ার স্থান সর্ব্বপ্রধান। বিহারের রাঁচি, আসামের নওগাঁ ও শ্রীহট্ট এবং বাঙ্গলার জলপাইগুড়িতে যে পরিমাণ সবুজ-চা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

সবুজ-চা "Young Hyson," "Hyson No. I" ও "Hyson No. II" প্রভৃতি নামে প্রচলিত আছে। "Tawnkay" ও "Gun-powder" সবুজ চায়ের অপর দুই নাম এবং এই সকল নামই বাজারে প্রচলিত।

কৃষ্ণ ও সবুজ চা'র যত বিভাগ আছে, তাহা সাধারণ লোকের

বোধগম্য নহে। যাঁহারা এই পার্থক্য বুঝিতে পারেন, এই ব্যবসায়ে তাঁহাদের খুবই কদর আছে।

"Brick" ও অন্যান্য চা

Brick Tea দার্জ্জিলিঙ ও কুমাউন প্রদেশে সামান্য পরিমাণ তৈয়ারী হইয়া তিব্বত ও ভোটরাজ্যে বিক্রীত হয়; ভারতের বাহিরে ইহার বিশেষ রপ্তানী নাই। কৃষ্ণ ও হরিৎ চা প্রস্তুত করিবার সম্মিলিত প্রক্রিয়া হইতে "ব্রিক্ টি" প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার সবিশেষ বিবরণ দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

লেট্‌পেট্ (Letpet Tea) ব্রহ্মে প্রস্তুত হয়, উলং (Oolong Tea) ফরমোসাতেই বেশী হয়; চীন জাপানেও ইহার বিশেষ প্রচলন। ভারতবর্ষে ইহা প্রচার করিবার চেষ্টা করা মন্দ নহে; কারণ জগতের বাজারে ইহার স্থান আছে।

চা তৈয়ারী হইবার পর কাঠের বাক্সের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যাহাতে বাহিরের বায়ুর সহিত কোনরূপ সংযোগ না থাকে এবং বাক্সের তক্তার গন্ধ চা'তে যুক্ত না হয়, তাহার জন্য সীসার পাত দিয়া বাক্সের অভ্যন্তরভাগ মোড়া থাকে।

দেশ বিদেশে চা'র ব্যবহার ছড়াইয়া পড়িলেও চা'র আবাদের প্রধান কেন্দ্রগুলি কয়েকটি দেশের মধ্যে নিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান প্রধান। অবশ্য কাহারও কাহারও মতে চীনের স্থান সর্ব্বোপরি; কিন্তু সেখানে নিয়মমত কোনও হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা নাই। তাহা ছাড়া স্থানীয় লোকে অতিরিক্ত মাত্রায় চা পান করার জন্য বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ পায় না। এই সকল কারণে ভারতের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা হয়।

ভারতের চাষ

ভারতবর্ষে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ একর্ জমিতে চা'র আবাদ হইয়া

থাকে; পরিশিষ্ট (ক)। তন্মধ্যে আসামের স্থান সর্ব্বপ্রথম; তাহার পরই বাঙ্গলা। ব্রিটিশ ভারতের অন্য প্রদেশের মধ্যে মদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। করদ রাজ্যের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর এবং ত্রিপুরাতেও চা'র আবাদ হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুর ও মদ্রে জমির পরিমাণ সমান, প্রায় ৭৮ হাজার একর।

শুষ্ক চায়ের পাতা পাওয়া যায়, ৪৩ কোটি পাউণ্ড; তন্মধ্যে ২৪ কোটি পাউণ্ড আসামে এবং ১১ কোটি পাউণ্ড পাওয়া যায় বাঙ্গলায়; পরিশিষ্ট (ক)। মদ্রে ও ত্রিবাঙ্কুরে জমির পরিমাণ সমান হইলেও মদ্রে ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ এবং ত্রিবাঙ্কুরে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড চা পাওয়া যায়।

বিহার, কুর্গ, মহীশূর, কোচিন প্রভৃতি স্থানেও আবাদ আছে; কিন্তু আসাম, বাঙ্গলা, মদ্র ও ত্রিবাঙ্কুরের সহিত কোনও তুলনা হয় না।

আসামে আবাদী জমির পরিমাণ আন্দাজ ৪ লক্ষ ৪০ হাজার একর। তন্মধ্যে লক্ষ্মীপুর ও শিবসাগর জেলায় যথাক্রমে ১ লক্ষ ১০ হাজার ও ১ লক্ষ ৪ হাজার একর পড়ে। তাহার পর শ্রীহট্ট, দারাং ও কাছাড়ের স্থান। এই কয় জেলাতেই ৪ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে আবাদ হইয়া থাকে।

জেলার চাষ

বাঙ্গলার দুই লক্ষ একরের মধ্যে এক জলপাইগুড়িতেই আন্দাজ ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি পড়ে। তাহার পরই দার্জ্জিলিঙ, কিন্তু আবাদী জমির পরিমাণ হিসাবে, ইহা জলপাইগুড়ির জমির অর্দ্ধেক মাত্র। চট্টগ্রাম জেলাতে সামান্য আবাদ হয়।

মদ্রের মধ্যে নীলগিরি, কইম্বাটুর এবং মালবার, যুক্তপ্রদেশে দেরাদুন, গাড়োয়াল, আলমোরা এবং পঞ্চনদের মধ্যে কাঙ্‌ড়া জেলাতেই ক্ষুদ্রবৃহৎ আবাদ আছে।

ভারতের মধ্যে সকল স্থানে সমান ফসল হয় না। আসামে যেমন অধিক পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে, সেখানে ফলনের পরিমাণও খুব বেশী। আসামের মধ্যে লক্ষ্মীপুরের স্থান সর্ব্বপ্রধান; প্রতি একরে প্রায় ৬৬৩ পাউণ্ড চা পাওয়া যায়। তাহার পরই গোয়ালপাড়ার স্থান। পরে পরে জলপাইগুড়ি (বাঙ্গলা), দারাং ও শিবসাগর জেলা। এখন কইম্বাটুর ও নীলগিরির নাম করা প্রয়োজন। শ্রীহট্ট, নওগাঁ গেলেই আসে মালবার, কোচিন ও কুর্গ। কুর্গের পরেও ত্রিবাঙ্কুরের ফলন কম; আর করদরাজের মধ্যে মহীশূর অনেক পিছনে, একরে মাত্র ২৩৩ পাউণ্ড; পরিশিষ্ট (খ)।

ফলন

১৮৩৯ সালে আসাম কোম্পানী (Assam Company) স্থাপিত হয় এবং ১৮৪০ সালে তাহারা সরকারী বাগানগুলি ক্রয় করিয়া বে-সরকারী আবাদ আরম্ভ করে—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী ইতিহাস, অর্থাৎ ভারতের অন্যান্য স্থানেও আবাদের বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৮৭৫ সাল নাগাদ দেখা গেল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে আবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ আন্দাজ তিন কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ১৯০০ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে ৫ লক্ষ একর জমিতে ১৯ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। ইহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া আজ সাড়ে ৮ কোটি একর জমি ও ৪.৩ কোটি পাউণ্ড চা'য় দাঁড়াইয়াছে; পরিশিষ্ট (গ)। শেষ তিন বৎসরের জমি ও ফলনের পরিমাণ প্রায় একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় আবাদের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা

বর্ত্তমানে ছোট বড় পাঁচ হাজারের উপর বাগান আছে; তাহাদের মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার উপর এবং তাহাতে কম বেশী নয় লক্ষ

লোক কাজ করে। তন্মধ্যে পৌনে ৮ লক্ষ লোক (৭,৭৭,০০০) স্থায়ী মজুর এবং উহারা বাগানে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই বাস করে। প্রায় ৪৫ হাজার (৪৪,১২০) লোক বাহির হইতে আসিলেও স্থায়ীভাবেই কার্য্যে নিযুক্ত আছে; আর ঠিকা মজুরের সংখ্যা ৫২ হাজার।

পৃথিবীতে চায়ের আবাদ

চীন ও ভারতে প্রথম স্থান লইয়া দ্বন্দ্ব আছে; বিশেষতঃ চীনের পরিমাণ সম্বন্ধে অঙ্ক পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। কলিকাতায় চীন রাজদূতের অনুমান গ্রহণ করিলে চীনকে প্রথম স্থান দিতে হয়, অর্থাৎ পরিমাণ প্রায় ৭০ কোটি পাউণ্ড এবং ভারতের অঙ্ক ৪৩ কোটি। অনেকে মনে করেন চীনের এই অঙ্ক ঠিক নহে। ইহার পরেই সিংহলের স্থান এবং পূর্ব্ব ভারত দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, ইন্দোচীন, ফরমোসা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের নাম করিলেই তালিকা শেষ করা যাইতে পারে। এই কয়েকটি দেশ মিলিয়া প্রতি বৎসরে আনুমানিক ১৭৮ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং দেশ বিদেশের লোকে মহানন্দে তাহার কাথ পান করিয়া থাকে; পরিশিষ্ট (ঘ)।

বাণিজ্য

চা'র সন্ধান হইবার পর ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় এক হন্দর চা ইংলণ্ডে আমদানী করা হয় এবং ঐ সময় হইতেই চা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে (John Company) দেওয়া হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে চীনের সহিত সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যের ভার উক্ত ব্যবসায়ীদের হাতে ন্যস্ত ছিল। কেবল চীনা চা হইতে যে লাভ হইতেছিল, তাহাই কোম্পানীর পক্ষে যথেষ্ট মনে হওয়ায় ভারতীয় চা আবাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন মোটেই ছিল না। সেই কারণে জগতে পরিচয় লাভ করিতে ভারতীয় চা'র অনেক বৎসর কাটিয়া যায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে তারিখে

ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে ৪৮৮ পাউণ্ড (কাহারও মতে ৩৫০ পাউণ্ড) চা ভারত হইতে প্রেরণ করা হয় এবং ১০ই জানুয়ারী ১৮৩৯ সালে উহা প্রকাশ্য নীলামে লণ্ডনের বাজারে বিক্রীত হয়।

১৮৪১ সালে ৪,৬১৩ পাউণ্ড ভারতীয় চা কলিকাতায় নীলামে বিক্রীত হয়।

ভারতের চা বাণিজ্যের ইহাই সূত্রপাত।

হয় ত ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ত্তমান প্রসঙ্গ খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়, তথাপি আমেরিকার সহিত চা'র উপর শুল্ক লইয়া যে ঘটনা ঘটে, তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রয়োজন। চা'র উপর শুল্ক ধার্য্যই আমেরিকা উপনিবেশকে স্বাধীনতালাভে সচেতন করিয়াছে। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সমরানল জ্বলিয়া উঠে। ফলে আমেরিকা শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের উপনিবেশ মাত্র না থাকিয়া স্বাধীন সাম্রাজ্যে পরিণত হয।

বাণিজ্যে বিপত্তি—আমেরিকার কাহিনী

১৭৬৫ সালে আমেরিকায় রপ্তানী করা চা'র উপর শুল্ক লইয়া সকল গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইল। ইহাতে আমেরিকাবাসী কেবল যে ঐ শুল্কের প্রতিবাদ করে, তাহাই নহে, তাহারা বলে যে, ঔপনিবেশিকদের জন্য কোনও আইন প্রণয়ন বা তাহাদের উপর কোনও কর ধার্য্য করিবার শক্তি ইংলণ্ডের নাই। ১৭৬৬ সালে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত আইন প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইল (Declaratory Act) যে ইংরাজ রাজশক্তির উভয় ক্ষমতাই আছে। ১৭৬৭ সালের (Trade and Revenue Act) নূতন আইনে চা, সর্ব্বপ্রকার তৈল, কাঁচ এবং সীসার উপর শুল্ক স্থাপিত হয়। ইহাতে আমেরিকায় দারুণ অশান্তি উপস্থিত হয় এবং ইংরাজের সমস্ত দ্রব্যাদি বয়কট বা বর্জ্জন সুরু

হয়। এই আইনও প্রত্যাহৃত হয় কিন্তু প্রতি পাউণ্ড চা'র উপর তিন পেন্স ট্যাক্স থাকিয়া যায়।

১৭৭৩ সালে যে আইন (Tea Act) হয়, তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ঔপনিবেশিকদের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা দান করে। ইহা দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেবলমাত্র প্রতি পাউণ্ড চা'র উপর তিন পেন্স করিয়া শুল্ক ইংলণ্ডকে দিয়া ঔপনিবেশিকদের সহিত বাণিজ্যের আর সমস্ত মালের উপর আদায়ীকৃত শুল্ক ফেরৎ পাইত; অর্থাৎ আমদানী শুল্ক দিয়া ইংলণ্ডে আনীত মাল ঔপনিবেশিকদের নিকট রপ্তানী করিতে পারিলে তাহারা ঐ আমদানী শুল্ক ফেরৎ পাইত। আমেরিকাবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা বলিতে থাকে এইরূপ গুপ্ত শুল্ক আদায় করিতে যাওয়াও ইংলণ্ডের ঘোরতর অন্যায়। তখন "স্বাধীনতার সেবক" ('Sons of Liberty') নাম দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদল বাহির হইয়া পড়িল এবং দেশে দারুণ অশান্তি বিস্তার করিতে লাগিল। অত সমাদরের চা পরিবর্জ্জনের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। নারীমহলে মহাসোরগোল পড়িয়া গেল এবং তাহারাও দলে দলে এই আন্দোলনে যোগদান করিল। গ্রামের ব্যবসায়ীরা আসিয়া ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। জনসাধারণ বুঝিতে লাগিল যে আমেরিকায় চা নামাইলে লণ্ডনে তাহার শুল্ক সংগৃহীত হইয়া থাকে। তখন তাহারা স্থির করিল তাহাদের উপকূলে চা নামাইতে দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য সামরিক আয়োজন চলিতে লাগিল।

ফিলাডেলফিলা এ বিষয়ে অগ্রণী হইল এবং দিকে দিকে অশান্তি প্রচার করিতে লাগিল। শিভোলা ("Left-handed" Scevola) এক আবেদন প্রচার করিয়া সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ জানাইলেন। নিউ ইয়র্ক শহর এই আন্দোলনে যোগ দিল। সংবাদপত্রগুলি সমস্বরে প্রচার

করিতে লাগিল ইংরাজ তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছে, এবং তাহাদের ক্রীতদাস করিতে চাহে। বোষ্টন শহরে প্রচারিত হইল—

"They would oppose with lives and fortunes, if need be, any attempt to land and sell the East India Tea".

১৭৭৩ সালে ১৭ই নভেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে আমেরিকা অভিমুখে চা'র জাহাজ ছাড়িবার সংবাদ পৌঁছে। ২৮ নভেম্বর তারিখে 'ডার্টমাউথ' (Dartmouth) জাহাজ বোষ্টন বন্দরে লাগে। মাসাচুসেট্‌স্‌-এর অধিবাসী দেশপ্রেমিক সামুয়েল আডামস-এর (Samuel Adams) আদেশে বন্দরে চা নামানো অসম্ভব হইল। অবস্থা বুঝিয়া চা সমেত জাহাজ লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিবার জন্য কাপ্টেন রথ (Capt. Roth) অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে দেওয়া হইল না।

১৭৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রিফিন্স জাহাজ ঘাটে (Griffin's Wharf) রাত্রিকালে কয়েকজন আমেরিকাবাসী ছদ্মবেশে আসিয়া সমস্ত চা জলে ফেলিয়া দিল।

ঐ জাহাজঘাটায় প্রতিষ্ঠিত এক প্রস্তরফলক * আজও সেই ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে।

---

* প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ :—

"Here formerly stood

Griffin's wharf

at which lay moored on December 16, 1773, three British ships with cargoes of tea. To defeat King George's trivial but tyrannical tax of 3d. a pound, about ninety citizens of Boston partly disguised as Indians, boardred the ship, threw the cargoes, three hundred and forty two chests in all, into the sea, and made the world ring with patriotic exploit of the

ইহার ফলে বোষ্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, মাসাচুসেট্স্-এর গভর্ণর নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা লোপ করা হয় এবং গতানুগতিক ধারায় তাহাকে দমন করিবার জন্য নানা প্রকার পন্থা অবলম্বিত হয়। কিন্তু আমেরিকাবাসী তাহাদের প্রতিবাদ সমভাবেই চালাইতে থাকে। ২২শে ডিসেম্বরে গ্রীনউইচ বন্দরে গ্রিফিন জাহাজঘাটার ঘটনা পুনরায় সংঘটিত হয়। ফিলাডেলফিয়া হইতে জাহাজ ফিরাইয়া লইয়া যাইতে দেওয়া হয়। নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি শহরেও চা'র ধ্বংসসাধনের নানা উপায় অবলম্বিত হয়। আনাপোলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের (Annapolis Tea Party) আদেশ অনুযায়ী কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Capt. Stewart) নিজ জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া সমস্ত চা দগ্ধ করিবার পর ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পান।

তাহার পরের ঘটনা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জয়লাভ। ১৭৭৬ সালে তাহারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে এবং ১৭৮৩ সালে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে আমেরিকাকে স্বাধীন জাতি বলিয়া ইংরাজ মানিয়া লয়।

ভারতীয় চা'র জয়যাত্রা—জলপথ

১৮৩৮ সালে রপ্তানী সুরু হইলেও ভারতীয় বাণিজ্যের খাতায় ১৮৬৩ সালে রপ্তানীর পরিমাণের স্বতন্ত্রভাবে হিসাব রাখা প্রয়োজন বোধ হয় এবং ঐ সালে ইংলণ্ডে ২৯ লক্ষ পাউণ্ড চা যায়। ১৮৪৮-৪৯ সালে বিক্রীত চা'র মূল্য ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ছিল। ১৮৭৪-৭৫ সালে বিদেশে রপ্তানী চা'র পরিমাণ ২ কোটি ১৪ লক্ষ পাউণ্ডে পৌছায়; তখন

Boston Tea Party

No ! never was mingled such a draught
In palace, hall or arbor,
As freemen brewed and tyrants quaffed
That night in Boston Harbor !"

ইহার দাম হইল ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। এই রপ্তানী ১৯০০-০১ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই আন্দাজ ১ কোটি টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়া ঐ সালে ১৯ কোটি পাউণ্ড চা সাড়ে ৯ কোটি টাকা মূল্য লইয়া আসে। ১৯০২-০৩ সালে হঠাৎ একেবারে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকায় নামে; উহা আবার বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০৬-০৭ সালে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ মূল্য ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকায় পৌছে। কিন্তু ১৯০০-০১ সালের অনুপাতে চা'র পরিমাণ অত্যন্ত বেশী দিয়া অর্থাৎ ২৩ কোটি ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড পাঠাইয়া তবে ঐ পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। ১৯০৭-০৮ সালে রপ্তানী ১০ কোটি টাকার সীমা পার হইযা যায় এবং ১৯১৫—১৬ সালে ২০ কোটি টাকায় (১৯ কোটি ৯৮ লক্ষ) পৌছে; ঐ বৎসর চা'র পরিমাণ ৩৩ কোটি ৮৪ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। যুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) রপ্তানী কিছু হ্রাস পায়, অন্যান্য কারণের সহিত, যুদ্ধোপকরণ লইয়া যাইবার জন্য জাহাজের মালের উপর বিশেষ ভাড়া বসাইয়া এই রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯১৯ সালে এই নিষেধ উঠিয়া যায়; আর ১৯১৯-২০ সালে যত চা রপ্তানী হয় ইহার পূর্ব্বে বা পরে এক বৎসরে এত চা কথনও প্রেরিত হয় নাই। পরিমাণ ৩৭ কোটি ৯১ লক্ষ পাউণ্ড এবং ২০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। এই কারণেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল; ইংলণ্ডে অধিক পরিমাণ চা জমিয়া যাওযায়, পর বৎসর রপ্তানী পড়িয়া গিয়া পূর্ব্ব বৎসরের ৩৮ কোটি পাউণ্ডের স্থলে সাড়ে ২৮ কোটি এবং সাড়ে বিশ কোটি টাকার স্থলে ১২ কোটি টাকা মূল্যে নামিল; বিলাতের বাজারে চা'র দামও অসম্ভবরূপে হ্রাস পাইল। কিন্তু "শাপে বর হইল"; ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চা'র ভাল পাতা নির্ব্বাচনে মনোযোগী হইলেন এবং অপেক্ষাকৃত কম চা "ঘরে" আনিলেন। তাহার ফলে আবার চাহিদা বৃদ্ধি পাইল এবং দরও চড়িয়া গেল এবং ১৯২৩-২৪ ও ১৯২৪-২৫ সাল, বিশেষতঃ ১৯২৪-২৫ সাল ভারতীয চা ব্যবসায়ীদের

"মাহেন্দ্রক্ষণ" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ৩৪ কোটি পাউণ্ড চা ৩৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইল। পরে ১৯২৭-২৮ সালে একবার ৩২½ কোটি টাকার চা রপ্তানী হইয়াছিল; কিন্তু অনেক বেশী পরিমাণ চা বিক্রয় করিতে হইয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সালে ৩৮ কোটি পাউণ্ড চা, মাত্র ১৭ কোটি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইল। রপ্তানীর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া এখন ৩৫ কোটি পাউণ্ড চা ২৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় রপ্তানী হইয়াছে (১৯৩৮-৩৯)। এ সম্বন্ধে সমস্ত অঙ্ক পরিশিষ্ট (ঙ) হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

স্থলপথে বাণিজ্য

ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে কিছু চা ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়; তন্মধ্যে ভারতের একেবারে সন্নিকটবর্ত্তী দেশগুলির সহিত যে বাণিজ্য ব্যবহার আছে তাহাকে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে ধরা হয় না। সাধারতঃ আফগানিস্থান, সিকিম, নেপাল, ভোটরাজ্য ভারতের চা ব্যবহার করে এবং এই সকল দেশের জন্য যে চা রপ্তানী হয়, তাহার উপর কোনও বিধিনিষেধ নাই। স্থলপথে ইরাণের সহিত ভারতের কিছু যোগ আছে; তাহাতে যে পরিমাণে চা যায় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯৩৫ সালের ১লা আগষ্টের ঘোষণা অনুযায়ী ইরাণে চা রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরে বলা হইতেছে। এখন (১৯৩৭-৩৮) স্থলপথে যত চা যায় তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড, তন্মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হিসাবে ধরিলে ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। পরিশিষ্ট (চ) হইতে গত কয়েক বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে ৩৪ কোটি ৯৯ লক্ষ পাউণ্ড চা জলপথে বিদেশে রপ্তানী

হইয়া থাকে ; ইহা ছাড়া ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার পাউণ্ড রদ্দি চা (**waste tea**) কেফিন (**caffeine**) প্রস্তুত করিবার জন্য বিদেশীয়েরা লয়। ভারতীয় চা'র প্রধান ক্রেতা ইংরাজ, মোটামুটি ৩৫ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে ৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড সে একা লইয়া থাকে। টাকার হিসাবে দেখা যায়, প্রতি একশত টাকার মালে তাহার অংশ ৮৭॥৴২·৪ পাই। অপর ক্রেতাদিগের মধ্যে কানাডা, ইরাণ, আমেরিকা, সিংহল, এরে (আয়র্লণ্ড), ব্রহ্ম, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশও কিছু কিছু লইয়া থাকে। তন্মধ্যে কানাডার অংশ সমস্ত টাকায় শতকরা ৪·১, আর ইরাণের ২ ; পরিশিষ্ট (ছ)।

ভারতীয় চা'র ক্রেতা

ইংরাজ যে চা আমদানী করে, তাহার মধ্যে অনেকটা আবার বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করিয়া দেয় ; তন্মধ্যে এরে (আয়র্লণ্ড) প্রধান, পরে জার্ম্মাণী ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের স্থান। ডেনমার্ক, নেদরলণ্ড, কানাডা, আর্জ্জেণ্টাইনা প্রভৃতি দেশে ইংলণ্ড হইতেই ভারতীয় চা অধিকমাত্রায় সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি কানাডা ও আমেরিকায় ভারতবর্ষ হইতে সরাসরিভাবে বহু পরিমাণ চা রপ্তানী হইতেছে।

বলা বাহুল্য রপ্তানী বাণিজ্যে বাঙ্গলার স্থান প্রথম অর্থাৎ শতকরা ৭৮·৯ ভাগ এখান হইতে যায় ; বাকী প্রায় সমস্তটাই (২১%) মদ্র সরবরাহ করে। বোম্বাই বন্দরের নাম আছে মাত্র ; কিন্তু পরিমাণ কিছুই নহে ; পরিশিষ্ট (জ)।

রপ্তানী—প্রদেশের অংশ

ভারতের এত বড় রপ্তানী বাণিজ্য থাকিলেও প্রতি বৎসর প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার চা (৪০ লক্ষ ৮২ হাজার পাউণ্ড) আমদানী হইয়া থাকে। এই সকল চা সাধারণতঃ ভারতে তৈয়ারী হয় না ; বিদেশী চা তৈয়ারী হইলেও বিশেষ গুণের জন্য আদৃত হয়। তাহা ছাড়া ইহা হইতে ভারতের সন্নিকটবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশসমূহে

আমদানী

পুনরায় রপ্তানী হইয়া যায়। যে সকল চা আসে তাহার মধ্যে হরিৎ চা (green tea) প্রধান; এমন কি মোট আমদানীর অর্দ্ধেকেরও বেশী; পরিশিষ্ট (ঝ)। এ স্থলে জাপান, সিংহল ও চীন আমাদের বিক্রেতা।

রপ্তানী—রদ্দি (waste) চা

চা ছাড়াও কতক পরিমাণ রদ্দি চা রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণের কোনও স্থিরতা নাই, তবে মোটামুটি এক লক্ষ টাকার অধিক। ১৯৩৮-৩৯ সালে কিছু বৃদ্ধি পাইয়া কমবেশী সাড়ে চার লক্ষ টাকায় (৪,৩৬,৫৮৩ টাকা, ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ) দাঁড়াইয়াছে। প্রধানতঃ আমেরিকা ও পরে কানাডা প্রভৃতি আমাদের ক্রেতা এবং সবটাই কেফিন (caffeine) প্রস্তুতের কাজে লাগে।

রপ্তানী—চা বীজ

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে চা বীজ রপ্তানী হইত, কিন্তু এখন আর হয় না। প্রথমতঃ অপর দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে; দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৩ সালের চুক্তি অনুযায়ী কেহ চা বীজ রপ্তানী করিতে পারে না। গত তিন বৎসর ইহার ফলাফল বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে ৭৭ হাজার টাকা, ১৯৩৭-৩৮ সালে ২০ হাজার টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ১৬০ টাকার বীজ রপ্তানী হইয়াছে। চা বীজ, তৈল ও ব্যবহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে ‘ভারতের পণ্য’ প্রথম খণ্ড * পাঠ করা প্রয়োজন।

ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী

ভারতবর্ষের চা অনেক দেশকে চা’র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করিয়াছে। চীনদেশীয় চা ইংলণ্ডে প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে, সেইখানে আজ ভারতীয় চা প্রধান; কোকো, কফি প্রভৃতি ফেলিয়া লোকে চা ধরিয়াছে। এখন জাভা ও সিংহল ভারতীয় চা’র বিপদ ঘটাইয়াছে। ১৯০৫-৬ সাল

---

* ১৮৬ পৃষ্ঠা।

হইতে জাভার রপ্তানীর হিসাব পাই। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় ঐ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত জাভার রপ্তানী শতকরা ৩৮০.৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সিংহলের ২১.৫% আর ভারতবর্ষের ৪৫.৪%।

ভারত হইতে রপ্তানীর মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। প্রথম, রপ্তানী সুরু হইয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ চা গিয়াছে ১৯৩২-৩৩ সালে (৩৭,৮৮,৩৬,৫৬৬ পাউণ্ড) দামও সর্ব্বাপেক্ষা কম গিয়াছে, প্রতি পাউণ্ড মাত্র ।/২ হইতে ।৶৩। দ্বিতীয়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা আসিয়াছে ১৯২৪-২৫ সালে (৩৩,৩৯,২৪,০০০ টাকা) কারণ ঐ সালে চায়ের দাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল, অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ড ৸৶৯ হইতে ৸৶১১ পাই; এরূপ আর কখনও হয় নাই।

রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ
(Tea control)

১৯৩২-৩৩ সালে যে মন্দা দেখা দিল, তাহাতে প্রকৃত ব্যবসায়ের দিকে সকল দেশের নজর পড়িল। ১লা এপ্রিল ১৯৩৩ সালে সকলে মিলিয়া আপোষ করিয়া (International Tea Agreement) চা'র মোট পরিমাণ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণে সম্মত হইল। এইরূপ স্থির হয় যে প্রথম অবস্থায় পাঁচ বৎসরের জন্য এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে। প্রথম পাঁচ বৎসর গত হইবার পর আবার পাঁচ বৎসরের জন্য ঐ চুক্তি অনুমোদন করা হইয়াছে। ইহাতে যথেচ্ছা চা রপ্তানী করা, আবাদ ফসল বৃদ্ধি করা প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ স্থাপিত হইল। যে বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চা রপ্তানী হইয়াছে, প্রতি দেশের সেই বৎসরকে মূল ধরিয়া চুক্তির পরই প্রথম বৎসর তাহার রপ্তানীর উপর শতকরা ৮৫ ভাগ রপ্তানী করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিবার জন্য এক কমিটি নির্ব্বাচিত আছে (Indian Tea Licensing Committee).

চুক্তির প্রথম বৎসর ভারতবর্ষ হইতে সাড়ে বত্রিশ কোটি পাউণ্ড চা

পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া হয়; তাহার পর কয়েক বৎসর প্রায় সম-পরিমাণ চা পাঠাইয়াছে; পরিশিষ্ট (ঞ)।

ব্যবহৃত চা'র পরিমাণ

প্রতি বৎসরই চা'র ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আন্দাজে ধরা হয় সকল দেশের লোক মিলিয়া প্রতি বৎসর ৯০ কোটী পাউণ্ড চা পান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ এই প্রয়োজনের শতকরা ৪০ ভাগ সরবরাহ করে, সুতরাং চা বাণিজ্যে ভারতের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত।

জগতের মধ্যে ইংরাজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চা পান করিয়া থাকে। নানা পুস্তিকায় প্রকাশিত দেশ বিদেশের হিসাব* হইতে দেখা গিয়াছে, ইংরাজ মাথা পিছু ৯·২ পাউণ্ড চা পান করে। পরে এরে (আয়ার্ল্যাণ্ড), অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, কানাডা, প্রভৃতি দেশের স্থান। আমেরিকা তামাক খুব বেশী ব্যবহার করে, চা'র নেশা এখনও তেমন ধরিয়া বসে নাই; মাথা পিছু ·৭২ পাউণ্ড ভাগে পড়িয়াছে। পরিশিষ্ট (ট) হইতে প্রতি দেশের জনপ্রতি চা'র প্রয়োজন বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রচারের ফলে চা'র কাটতি বৃদ্ধি পাইতেছে; আমেরিকা কৃষ্ণ চা (Black Tea) তেমন পছন্দ করিত না; এখন তাহারা উহার আমদানী বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতবর্ষে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৮ কোটী ৬৯ লক্ষ পাউণ্ড চা খরচ হইয়াছিল; প্রচারের ফলে উহা ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সওয়া নয় কোটী পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছে। সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য—ভারতের অনেক লোকই এখনও চা পান করে না; 'ভদ্র' সমাজে তাহারা অপাংক্তেয়, তাহাদের "সভ্য" করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

* ইহা Imperial Economic Committee কর্ত্তৃক সংগৃহীত অঙ্ক।

চা রপ্তানীর সমস্ত লাভ দেশে থাকে না, তাহার প্রধান কারণ, এই সকল ব্যবসায়ীদের অনেকেই বিদেশী এবং মূলধনের বহুলাংশ বিদেশ হইতে আনা। দেশী কোম্পানীগুলি ছোট এবং সংখ্যায় বেশী নহে। দ্বিতীয়তঃ, চা ভাণ্ডারজাত এবং রপ্তানী করিতে বাক্সের দরকার। এই সকল বাক্স তৈয়ারীর জন্য তক্তা এবং বাক্স বিদেশ হইতে আসে এবং প্রায় এক কোটী টাকা বিদেশে যায়; পরিশিষ্ট (ঠ)।

চা'র বাক্স

আমাদের দেশীয় নানা কাঠ দ্বারা বাক্স করিবার চেষ্টা হইয়াছে; বিশেষ ফল হয় নাই। কাঠের গন্ধ চা টানিয়া লয়; সেজন্য যে কোনও গন্ধযুক্ত কাঠ ব্যবহার করা চলে না। এক শিমুল দিয়া পরীক্ষা হইয়াছে; তাহাতে কাজও চলে, কিন্তু পরিমাণে বেশী পাওয়া যায় না। বহু চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সুমীমাংসা হয় নাই। বাতাস হইতে চা অতি সত্বর আর্দ্রতা টানিয়া লয় এবং এতদবস্থায় থাকিলে শীঘ্র "ছাতা" ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাহা না হইলে কাগজের বা কাপড়ের বা অন্য কোনওরূপ পাত্রে রাখা চলিতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। উপরন্তু বাহিরের বায়ুর সহিত সংযোগশূন্য করিবার জন্য ভিতরে ধাতুর, বিশেষতঃ সীসার, পাত দিতে হয়। এমন কি তপ্ত অবস্থায় চা এই আধারে ঢালিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিতে হয়।

আমদানী করা বাক্সের মোটা লাভ করে ইংরাজ, অর্থাৎ চার ভাগের তিন ভাগ তাহার অংশে পড়ে। ফিনল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া এবং অপরাপর দেশও কিছু কিছু সরবরাহ করে; পরিশিষ্ট (ঠ)।

শক্তিবর্দ্ধক, দুর্ব্বলতানাশক, পুষ্টিকর প্রভৃতি নানা গুণে চা'র বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার বিপক্ষে কিছু বলিতে গেলে হয়ত মহা কলরবের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলা যায়, শরীরের পুষ্টিকর পদার্থ ইহাতে কিছু নাই এবং অভ্যাস জন্মায় এই দুই

কারণে—তামাক সম্বন্ধে যে মতবাদ আছে, তাহা এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পুষ্টি যদি কিছু করে, তাহা চা'র দুধ ও চিনি; এবং গরম জল পানে শরীরের দুর্ব্বলতা ক্ষণিক দূর হয়, ইহা ছাড়া চা'র উপাদানের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি আছে, তাহার কাজ কিছুই নহে। ইহাদের অনেকের গুণ ভাল নহে, উপরন্তু ক্ষতিকারক। ট্যানিন আছে শতকরা ১৮'১৫ ভাগ; ইহা দেহের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। Theine বা Caffeine ৪'১০, Legumin ২৪'০০, Waxes and Gums ২'৮৮, Pectin প্রভৃতি ১২'৬, Cellulose fibre ২১'২, চা'র অপর কয়টি প্রধান উপাদান (Bamber-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী)। Theine বা Caffeine থাকায় চা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় এবং Tannin হইতে ইহার ঝাঁজ বা উগ্রতা এবং রঙ পাওয়া যায়।

নেশা হিসাবে এমন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে লোকে শিশু সন্তানের দুধ জোগাইতে পারে না, কিন্তু চা'র জন্য দুধ লয় এবং শিশুদের ঐ চা পান করাইয়া রাখে। পাঁচটি প্রাণীর এক পরিবারে কুড়ি টাকা আয় এবং তন্মধ্যে তিন টাকা হইতে চার টাকা পর্য্যন্ত মাসে চা'র জন্য খরচ করিতে দেখিয়াছি।

নেশার জিনিষ বলিয়াই ইহার খ্যাতি এবং বোধ হয় একমাত্র ব্যবহার। চা হইতে কেফিন প্রস্তুত হয়। চা-বীজের অন্য ব্যবহার আছে।*

ব্যবহার

ইহা হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা জ্বালানীরূপে এবং সাবান তৈয়ারীর জন্য কাজে লাগে। আগে বীজ হইতে তৈল পাইবার জন্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিত; এখন বাজারে হংকঙ চা-বীজ তৈল বিক্রয় করিতেছে, সুতরাং ভারতের দুর্দ্দশা।

---

* ভারতের পণ্য—প্রথম খণ্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট—চা

(ক)

জমি, ফলন ও প্রদেশের অংশ

(১৯৩৭)

মোট জমি	৮,৩৪,৪০০০ একর		
ব্রিটিশ ভারত	৭,৩৯,৮০০	,,	৮৮.৭%
করদ রাজ্য	৯৪,৬০০	,,	১১.৩%
মোট ফলন	৪৩,০২,৫০,০০০ পাউণ্ড		
ব্রিটিশ ভারত	৩৯,১৫,১৮,০০০	,,	৯১.৪%
করদ রাজ্য	৩,৮৭,৩২,০০০	,,	৮.৬%

ব্রিটিশ ভারত—

	হাজার একর	শতকরা অংশ	লক্ষ পাউণ্ড	শতকরা অংশ
আসাম	৪৪০	৫২.৭	২৪.১৫	৫৬.১
বাঙ্গলা	২০২	২৪.২	১০.৮৬	২৫.২
মদ্র	৭৮	৯.৪	৩.৫৪	৮.২
পঞ্চনদ	৯.৫	১.১	২৮	.৬
যুক্তপ্রদেশ	৬.৬	.৮	২০	—
বিহার	৪	—	১২	—

করদ রাজ্য—

ত্রিবাঙ্কুর	৭৮	৯.৪	৩.৪৫	৮.২
ত্রিপুরা	১০.৫	১.২	২৮	.৬
মহীশূর	৪	—	৬	—
কোচিন	২	—	৭	—

(খ)

প্রতি একরে গড়ে ফলন (শুষ্ক পাতা ও গুঁড়া)

লক্ষ্মীপুর	... ৬৬৩		মালবার	...	৪৭৯
গোয়ালপাড়া	...	৫৯৫	কোচিন	...	৪৫৬
জলপাইগুড়ি	...	৫৯১	কুর্গ	...	৪৫৩
দারাং	...	৫৮৪	কাচার	...	৪৪৫
শিবসাগর	...	৫৪৩	ত্রিবাঙ্কুর	...	৪১৮
কইম্বাটুর	...	৫৪২	দার্জ্জিলিঙ	...	৪১৫
নীলগিরি	...	৪৯৩	ত্রিপুরা	..	৩০১
শ্রীহট্ট	...	৪৯০	মাদুরা	...	২৮৮
নওগাঁ	...	৪৮৫	মহীশূর	...	২৩৩

(গ)

চা আবাদের ক্রমোন্নতি

		হাজার একর		লক্ষ পাউণ্ড
১৮৭৫—৭৯ গড়ে	...	১৭৩	...	৩,৪০
১৮৮৫—৮৯ ,,	...	৩০৭	...	৯,০০
১৯০০—০৪ ,,	...	৫,০০	...	১৯,৫০
১৯১০	...	৫,৩৩	...	২৪,৯০
১৯১৫	...	৫,৯৪	...	৩৫,২০
১৯২০	...	৬,৫৪	...	৩২,২০
১৯২৫	...	৬,৭২	...	৩৩,০০
১৯৩০	...	৮,০৩	...	৩৯,১০
১৯৩৫	...	৮,৩২	...	৩৯,৪২
১৯৩৬	...	৮,৩৪	...	৩৯,৪২
১৯৩৭	...	৮,৩৪	...	৪৩,০২

(ঘ)

পৃথিবীতে উৎপন্ন চা'র পরিমাণ

(১৯৩৭)

ভারতবর্ষ	...	৪৩,০২,৫০,০০০
সিংহল	...	২১,২৬,৮৫,০০০
ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জ	...	১৬,৪৭,৮০,০০০
জাপান	...	১১,৮৬,০৯,০০০
ইন্দোচীন	...	২,৪৪,০০,০০০
ফরমোসা	...	২,৪০,০০,০০০
চীন হইতে রপ্তানীকৃত চা	...	৯,০০,০০,০০০

চীনে আবাদী জমির পরিমাণ ৫,৩০,০০০ একর বলিয়া জানা গিয়াছে; সুতরাং ভারতবর্ষ অপেক্ষা চা'র পরিমাণ কম হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

(ঙ)

রপ্তানী চা—জলপথে

১৮৩৭-৩৮ হইতে বিশিষ্ট কয়েক সালের পরিমাণ ও মূল্য *

		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৮৩৭-৩৮		·৪৮৮		—
১৮৪৮-৪৯	...	—	...	৫,৩৩
১৮৫৪-৫৫	...	—	...	৬,০৮
১৮৬২-৬৩	...	২৯,৩০	...	৩৩,৫৫
১৮৭৪-৭৫	...	২,১৪,০০	...	২,৯৫,০০
১৮৮৫-৮৬	...	৬,৯৬,৬৬	...	৪,৯৪,৭০
১৮৯৫-৯৬	...	১৪,২০,৮০	...	৭,০২,৩০

* Statistical Abstract ও Tea Statistics এর অঙ্কে পার্থক্য আছে। শেষোক্ত অঙ্ক গ্রহণ করা হইয়াছে।

(অনুস্যূত)

		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৯০০-০১	...	১৯,২১,৯৩	...	৯,৫৫,০৯
১৯০৫-০৬	...	২১,৪২,২৩	...	৮,৮৪,৭৬
১৯০৭-০৮	...	২২,৭০,২২	...	১০,৩০,০৩
১৯১০-১১	...	২৫,৪৩,০১	...	১২,৪১,৬৪
১৯১৫-১৬	...	৩৩,৮৪,৭০	...	১৯,৯৮,১১
১৯১৬-১৭	...	২৯,১৪,০৩	...	১৬,৭৭,১০
১৯১৯-২০	...	৩৭,৯১,৬৫	...	২০,৫৬,৫০
১৯২০-২১	...	২৮,৫১,৫২	...	১২,১৪,৯৮
১৯২১-২২	...	৩১,৩৮,৭৮	...	১৮,২২,০২
১৯২২-২৩	...	২৮,৮২,৯৬	...	২২,০৪,০০
১৯২৩-২৪	...	৩৩,৮৭,৫৫	...	৩১,৬৪,৬১
১৯২৪-২৫	...	৩৪,০১,০৭	...	৩৩,৩৯,২৪
১৯২৫-২৬	...	৩২,৫৭,৩৩	...	২৭,১২,১৭
১৯২৬-২৭	...	৩৪,৯২,৬৪	...	২৯.০৩,৭৮
১৯২৭-২৮	...	৩৬,১৬,১৪	...	৩২,৪৮,৪৯
১৯২৯-৩০	...	৩৭,৬৬,৩৪	...	২৬,০০,৬৪
১৯৩২-৩৩	...	৩৭,৮৮,৩৭	...	১৭,১৫,২৮
১৯৩৩-৩৪	...	৩১,৭৮,১৬	...	১৯,৮৪,৪৯
১৯৩৪-৩৫	...	৩২,৪৮,৩৩	...	২০,১৩,১৯
১৯৩৫-৩৬	...	৩১,২৭,০৬	...	১৯,৮২,৪১
১৯৩৬-৩৭	...	৩০,১৮,৩৮	...	২০,০৩,৮১
১৯৩৭-৩৮	...	৩৩,৪২,২৬	...	২৪,৩৮,৬৯
১৯৩৮-৩৯	...	৩৪,৯৯,১২	...	২৩,৪০,৫০

(চ)

রপ্তানী—স্থলপথে

	হাজার পাউণ্ড		হাজার পাউণ্ড
১৮৯৬-৯৭	১৫,১৩	১৯১৭-১৮	১৪,৪৮
১৯০৫-০৬	২৫,৪৭	১৯১৯-২০	১,২৮,৪৫
১৯১৩-১৪	২২,৪১	১৯২৪-২৫	৮৩,৬৯
* ১৯৩০-৩১	...	৫৮,৫৫	
১৯৩১-৩২	৫৯,৩১	১৯৩৪-৩৫	১,৮৬,৯৮
১৯৩২-৩৩	৫৫,৬৭	১৯৩৫-৩৬	১,২৮,০৮
১৯৩৩-৩৪	১,০৮,৬২	১৯৩৬-৩৭	১,২৪,৬০

* ১৯৩০-৩১ পর্য্যন্ত যে চা যায়, তাহার সমস্ত পরিমাণ "বহির্ব্বাণিজ্য" বলা চলে না; অতি সন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির হিসাব বাদ দেওয়া হইত। ইহার পর হইতে অ-ভারতীয় সমস্ত রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের হিসাব রাখিতে চেষ্টা করা হয় এবং একটী অনুমানিক পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়।

(ছ)

রপ্তানী—জলপথে—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

পরিমাণ—৩৪,৯৯,১২,০০০ পাউণ্ড

মূল্য— ২৩,৪০,৫০,০০০ টাকা

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন	৩০,৬৩,৭২	২০,৫৩,৭৫	৮৭.৭
কানাডা	১,৫২,৬৯	৯৬.৬৮	৪.১
ইরাণ	৫১,১১	৪৬,৮৪	২.০
আমেরিকা	৭৯,৫২	৪৬,২৮	১.৯
সিংহল	৩৯,৩৩	২৬,২০	১.১
এরে (আয়ার্ল্যান্ড)	৩২,৯৫	১৯,৩৭	.৮

ব্রহ্ম, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মানী, তুরস্ক, আরব, মিসর, দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাজ্য প্রভৃতি।

(জ)

রপ্তানী—বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	২৯,৩৩,৬৮	১৮,৪৭.৬৭	৭৮·৯
মদ্র	৫,৬৩,০৩	৪,৯১,৭১	২১·৯
বোম্বাই	২,৪২	১	—

(ঝ)

(১৯৩৮-৩৯)

আমদানী—চা'র নাম ও অংশ

	পাউণ্ড	টাকা	শতকরা অংশ
হরিৎ (Green) চা	২৪,৮১,৬৯৬	৯,৯৮,৮৯৭	৬৩·৪
"ব্রিক" (Brick),,	১২,০০,৮৯৬	৩,১৪,৬৬৯	২০·০
কৃষ্ণ (Black) ,,	৩,৯৯,৭৪৪	২,৫৯,৪৭৩	১৬·৪

(ঞ)

রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ (১)

রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সমিতির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি প্রধান

দেশের জন্য অনুমোদিত (Overseas Export Allotment) পরিমাণ

	ভারতবর্ষ	সিংহল	যবদ্বীপ প্রভৃতি (২)
	হাজার পাউণ্ড	হাজার পাউণ্ড	হাজার পাউণ্ড
১৯৩৩-৩৪	৩২,৫০,০৫	২১,৩৭,৯৫	১৪,৭৫,৫৭
১৯৩৪-৩৫	৩৩,৪৭,৭০	২২,০৮,৮৩	১৫,১৮,৯৭
১৯৩৫-৩৬	৩১,৫৬,৪১	২০,৭৫,০৬	১৪,৩২,১৮
১৯৩৬-৩৭	৩১,৫৬,৪১	২০,৭৫,০৬	১৪,৩২,১৮

(১) Tea & Coffee Mail হইতে গৃহীত। Indian Tea Statistics পুস্তকে প্রদত্ত অঙ্ক হইতে কিছু পার্থক্য আছে।

(২) Netherland Indies—ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জ।

(অনুসৃত)

	ভারতবর্ষ	সিংহল	যবদ্বীপ প্রভৃতি
	হাজার পাউণ্ড	হাজার পাউণ্ড	হাজারপাউণ্ড
১৯৩৭-৩৮	৩৩,৪৭,৭০	২২,০০,৮২	১৫,১৮,৯৭
১৯৩৮-৩৯	৩৫,৪৫,০০	২৩,২৭,১৯	১৬,০৫,৭৭
১৯৩৯-৪০	৩৪,৪৯,১৯	২২,৬৪,২৯	১৫,৬২,৩৭

(ট)

জনপ্রতি ব্যবহৃত চা'র পরিমাণ

		পাউণ্ড			পাউণ্ড
ইংলণ্ড	...	৯·২	হল্যাণ্ড	...	২·৪৯
এরে (আয়ার্ল্যাণ্ড)	...	৮·১৬	মিসর	...	১·০
অষ্ট্রেলিয়া	...	৭·০	আমেরিকা	...	·৭২
নিউজীল্যাণ্ড	...	৬·৭৩	রুশগণতন্ত্র	...	·২০
কানাডা	...	৩·৫৬	জার্ম্মাণী	...	·১৭
(ফরাসী) মরক্কো	...	২·৮১	ভারতবর্ষ	...	·২৫

(ঠ)

আমদানী—চা'র বাক্স—টাকা

	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
ব্রিটেন	৩০,২৬,১৫৩	৪৮,০২,৪০৯	৬৫,১৬,৭৮২
ফিনল্যাণ্ড	৩,৩০,৪২৫	৪,৭১,৭৯১	৫,৪০,১০৮
এস্টোনিয়া	৮,৪২,৯০৬	৯,২২,৪৯৬	৭,০১,৯৬৭
অপরাপর	৫,৭২,৩২৮	৯,৭৩,১৭৭	১২,৭১,১৮২
মোট	৫৬,২৬,৮১২	৭১,৭০,১৭৩	৯০,৩০,০৩৯

প্রতি দেশের শতকরা অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

ইংলণ্ড	...	৭২·১৬	ফিনল্যাণ্ড	...	৬·০
এস্টোনিয়া	...	৭·৭	অপরাপর	...	১৪·১৪

(ড)

চা—প্রতি পাউণ্ডের দাম*

১৮৭১ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

সাল		আনা	পাই	সাল		আনা	পাই
১৮৭১	...	১১	৮	১৯২২	..	১০	৪
১৮৭৫	...	১২	১০	১৯২৩	...	১৫	১½
১৮৭৬	...	১৩	০	১৯২৪	...	১৪	৭
১৮৮০	...	৮	৯	১৯২৬	...	১৩	৮½
১৮৮৫	...	৬	১০	১৯২৭	...	১১	১০
১৮৯০	...	৬	৩	১৯২৮	...	১২	১
১৮৯৫	...	৭	৬	১৯৩০	...	৮	০½
১৯০০	...	৫	১	১৯৩১	...	৬	৫½
১৯০১	...	৩	৫	১৯৩২	...	৪	৯
১৯০৫	...	৪	১১	১৯৩৩	...	৫	১০½
১৯১০	...	৬	১০	১৯৩৪	...	১০	৭
১৯১৫	...	৯	৭	১৯৩৫	...	৮	৭
১৯২০	...	৬	৬½	১৯৩৬	...	৯	৯
১৯২১	...	৩	৭	১৯৩৭	...	১০	৫

১৯৩৮ ... ১০ আনা ২½ পাই

* সর্ব্বপ্রকার চা'র গড়ে দাম।

নীল (Indigo)

ভারতের পণ্যের তালিকায় নীল আজ এক নগণ্য বস্তু। কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্য আজও লোক সমাজে ইহার পরিচয় আছে মাত্র, কিন্তু এ অবস্থাও আর বেশী দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

নীলের দিন ঠিক এইরূপ ছিল না। যে কারণেই হউক, ভারতে নীল প্রচুর পরিমাণে জন্মিত এবং বিদেশে রপ্তানী হইত; সারা সভ্য জগত ভারতের নীল পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত।

কতকাল পূর্ব্বে লোকে নীলের সন্ধান পাইয়াছিল তাহা বলা কঠিন; ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার বহুদিন প্রচলিত ছিল। ৮০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু নদের তীরে কোনও শহর হইতে নীল রপ্তানী হইত বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। ১২১৮ সালে কুইলন শহরে নীল সংক্রান্ত শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে বহু পুস্তকাদিতে বিশেষতঃ বিদেশীয়দের ভ্রমণবৃত্তান্তে বা তৎকালীন ভারতীয় পণ্যের তালিকায় নীলের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপীয় দেশসমূহে ইহা রপ্তানী হইয়া যাইত এইরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে। হয়ত ভারতবর্ষীয় বস্তু বলিয়া নীলের প্রথম নাম "ইণ্ডিকম" (Indicum) হইয়াছিল।

ইতিহাস

১৬০০ খৃষ্টাব্দে বিদেশীয়দের বাণিজ্যের ইহা একটি বিশেষ লাভের পণ্য ছিল। পর্ত্তুগালের বণিকেরা সুরাট হইতে লিসবনে চালান দিলে সেখান হইতে হল্যাণ্ড-এর রঙ ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিত। যাহাতে নীল নিয়মিত পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে ১৬৩১ সালে Dutch East India Company (ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) সৃষ্ট হয়। ইতিমধ্যে পোর্ত্তুগীজদের প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া আসে।

ইউরোপীয় বণিকদিগের মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিতে থাকে এবং স্থানীয় রঙ ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভারতীয় নীলের আমদানী রোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এ সময় তাহারা woad হইতে প্রাপ্ত রঙ ব্যবহার করিত। তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে প্রায় সকল দেশেই নীলের ব্যবহার আইনের চক্ষে অপরাধ বলিয়া গৃহীত হয়। ১৬০৮ সালে ইংলণ্ডে নীলের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইলেও বিদেশী দ্রব্য বলিয়া আমদানী ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ম হইতে লোক আনিয়া পুনরায় নূতন করিয়া ইংলণ্ডের বস্ত্ররঞ্জনকারীদের নীলের রঙ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ভারতের নীলের আদর হওয়ায় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিরা তাহাদের উপনিবেশসমূহে নীল চাষ আরম্ভ করে; ইহার ফলে পশ্চিম ভারতীয় (আমেরিকা) দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) নীল জন্মিতে থাকে। তখন ভারতীয় নীল চাষের এক পরীক্ষার কাল উপস্থিত হয়। এই সময় ইংরাজ ভারতীয় নীল বেশী মাত্রায় লইয়া যাইত, কিন্তু তাহারাও শ্বেতচর্ম্মধারী উপনিবেশবাসীদের উৎসাহ দিবার জন্য পশ্চিম ভারত দ্বীপজাত নীল ক্রয় করিতে থাকে এবং ভারতীয় নীলের বাজার সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে থাকে। কিছুকালের মধ্যেই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। ইউরোপীয়দের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক গোলমাল, উচ্চশুল্ক এবং ইক্ষু প্রভৃতি অন্যান্য লাভজনক আবাদের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ক্রমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নীল ব্যবসায় লোপ পাইল।

ভারতের চাষ

ভারতের নীল চাষের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হইল। নীল বাণিজ্যের ইতিহাসে বাঙ্গলা ও বিহারের, বিশেষতঃ বাঙ্গলার, ইহা এক অতি দুর্দ্দিনের স্মরণীয় কাহিনী। আশ্চর্য্যের বিষয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নীল চাষ বাঙ্গলায় স্থানান্তরিত হইল। ১৭৭৯ সাল

পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ হস্তে নীলের বাণিজ্য রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহাদের খাতাপত্রের হিসাবে দেখা গেল আন্দাজ ৮০ হাজার পাউণ্ড বা ১২ লক্ষ টাকা লোকসান গিয়াছে। তখন তাহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের হাতে ব্যবসা ছাড়িয়া দেয়। যাহাতে তাহাদের কাজের কোনও অসুবিধা না হয় সে কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আরও দেড় কোটী টাকা এই কর্ম্মচারীদের অগ্রিম দিয়াছিল। এই টাকার ছড়াছড়ি এবং আবাদের নূতন সাহেবদের বা মালিকদের কর্ত্তৃত্ব বাঙ্গলার নীলকে জগতের সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করে।

চাষ বিস্তারের চেষ্টা

নীল হইতে যাহাতে লাভ হইতে পারে তাহার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে থাকে; ইহার কতকগুলি আইন-সঙ্গত এবং তাহার অধিকাংশ বে-আইনী। লোককে দাদন দিয়া বংশানুক্রমে দায়ী করিয়া রাখা হইত, প্রাপ্যের অধিক আদায় করা হইত, অনিচ্ছায় লোককে জোর করিয়া দাদন গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইত। যেখানে মাত্র দেওয়ানী আইনের দ্বারা প্রতিকার সম্ভব সেখানে দেওয়ানী ছাড়া ফৌজদারী আইনের আশ্রয় লইয়া কুঠীওয়ালারা দাদনের সর্ত্ত অনুযায়ী নীল ও অর্থ আদায় করিত। এই সকল নীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে, দরিদ্র সহায়হীন রায়ত প্রজাদের যে দারুণ আর্ত্তনাদ উঠে, তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে।

অত্যাচার

১৮১০ সালের পূর্ব্বে নীল চাষ বিস্তার উপলক্ষ্যে যে অমানুষিক অত্যাচার সংসাধিত হয়, সার এ্যাস্‌লি ইডেন (Sir Ashley Eden) Indigo Commissionএর সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে তাহা বিবৃত করেন। সার জন পিটার গ্রাণ্ট (Sir John Peter Grant) কুঠীওয়ালাদের অত্যাচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

নীলকরদের অত্যাচার নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :—

"1st,—Acts of violence, which, although they amount not in the legal sense of the word to murder, have occasioned the death of natives.

2nd,—The illegal detention of natives in confinement, especially in stocks with a view to recovery in balances alleged to be due from them or for other causes.

3rd—Assembling in a tumultuary manner, the people attached to their respective factories, and others, and engaging in violent affrays with other indigo-planters.

4th,—Illicit infliction of punishment, by means of a '*rattan*' or otherwise, on the cultivators or other natives."

এ সময়ে অন্যান্য ইংরাজ রাজপুরুষদের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. E. De-Latour বলেন যে, নররক্তে রঞ্জিত না হইয়া এক বস্তা নীলও ইংলণ্ডে পৌছায় নাই; সামান্য ব্যবসা সম্পর্কে লোককে বর্শাবিদ্ধ করা হইয়াছে; আইনের চক্ষু এড়াইবার জন্য আহতকে নিরুদ্দেশ করা হইয়াছে এবং শৃগাল কুকুরের ন্যায় গুলী করিয়া মারা হইয়াছে।*

তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে :—

"There is one thing more I wish to state; that considerable odium has been thrown on the Missionaries for saying that—"not a chest of indigo reached England without being stained with human blood." That has been stated to be an anecdote. That expression is mine, and I adopted it in the fullest and broadest sense of its meaning. As the result of my experience as Magistrate in the Fureedpore district, I have seen several ryots sent to me as a Magistrate, who have been speared through the body. I have had ryots before me who have been shot down by Mr. Forde (a planter). I have put on record, how others have been first speared and then kidnapped; and such a system of carrying on indigo, I consider to be a system of blood-shed."

একদিকে যেমন বিদেশী নীলকরদের অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে, অপর দিকে সদাশয় হৃদয়বান্ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী বিড়ম্বিতের পক্ষে প্রবল আন্দোলন করিয়াছেন। এইরূপ বহু মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু এক মেকলে (Lord Macaulay) সাহেবের কথা কয়টি তুলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়—

"That great evils exist, that great injustice is frequently committed, that many ryots have been brought, partly by the operation of law, and partly by acts committed in defiance of the law, into a state not far removed from that predial slavery, is I fear, too certain."

ইডেন, গ্রাণ্ট, মেকলে প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদের লেখার ফলে Indigo Commission বসে এবং ১৮ই মে ১৮৬০ সালে কার্য্যারম্ভ করে। এই কমিশনের সমক্ষে ইডেন সাহেবের সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে নির্য্যাতিতের পক্ষে যায় এবং লোক সমক্ষে সমস্ত অবস্থা প্রকট হইয়া পড়ে। তৎপূর্ব্বে কুঠীওয়ালা সাহেবদের ভয়ে, সামান্য মাত্র প্রতিবাদ না করিয়া বাঙ্গালীরা সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত।

প্রতিকারের চেষ্টা

১৮৬০ সালে আগষ্ট মাসের শেষভাগে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং নীলকরের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ১৮৮৫ সালে বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেট R. L. Mangles প্রথম রব তোলেন, "নীল চাষ করিবার জন্য অগ্রিম লইতে কাহাকেও কোনরূপে বাধ্য করা যায় না।" রায়তরা এই সংবাদ পাওয়া মাত্রেই নীলের দাদন লওয়া ত্যাগ করিবার উপক্রম করে এবং উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় লইয়া সরকার এবং নীলকরমহলে বিতণ্ডা বাধিয়া যায়; ফলে কিছুকাল পর্য্যন্ত Mangles-এর মত একপ্রকার চাপা পড়িয়া যায়।

১৮৬০ সালের কমিশনের রিপোর্টে ম্যাঙ্গল্সের মত সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে ইডেন এবং গ্রাণ্টও ম্যাঙ্গল্সের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ্যভাবে বলা হয় যে, এই চাষ রায়তদের পক্ষে কোনও রকমে লাভজনক নয়; উপরন্তু নানাপ্রকারে উহাদের লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইবার বহু আশঙ্কা রহিয়াছে। যে কোনও চুক্তি উভয় পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সুতরাং এক পক্ষের অসম্মতি থাকিলে, কখনও সে চুক্তি কার্য্যকরী হওয়া বিধেয় নহে।

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, প্রজাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কোনও কোনও ইংরাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া রায়তের অত্যাচার দমন করিতে চেষ্টান্বিত হন; এ কথা আংশিক সত্য মাত্র। রায়তরা এবং রায়তের পক্ষে বহু সহৃদয় ব্যক্তি বিরাট আন্দোলন করেন এবং স্থানে স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৮৫৯ সালের এপ্রিল ও নভেম্বরে এবং ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রজা ও নীলকরের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হইয়া যায়। এই সময় প্রজা এবং তাহাদের সমব্যথী সাধারণ বাঙ্গালী ত্যাগ, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সৎসাহসের যে পরিচয় দিয়াছিল তাহার ইতিহাস জগতে অতুলনীয়। কিন্তু সে কথা আর কেহ স্মরণ করে না; তাহা না হইলে আজ বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের কথা লোকে ভুলিয়া যাইত না। তাঁহাদের আদিবাস নদীয়ার চৌগাছায় ছিল। নীলকুঠীর দেওয়ানের পদে ইস্তফা দিবার পর তাঁহারা অর্থ ও লোকবল দিয়া নিজেদের সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া রায়তের পক্ষ গ্রহণ করেন। বাঙ্গলার স্থানে স্থানে বিদ্রোহ বিকটরূপ ধারণ করে এবং নীলকর সাহেবরা বুঝিতে পারেন যে, লোকের সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। সরকারী নীতি পরিবর্ত্তিত না হইলে অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিত। নীলকরেরা যখন ফৌজদারী কোর্টের সাহায্য লইয়া দেওয়ানী

নীল বিদ্রোহ

চুক্তির প্রতিকার চাহিলেন, তখন বাঙ্গলা সরকার তাহা নামঞ্জুর করিয়া দেন।

প্রজাদের নিজ চেষ্টার সহিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" প্রভৃতি সংবাদপত্র এবং দুর্ব্বলের আশ্রয় দীনবন্ধু মিত্রের মতন তেজস্বী ও চিন্তাশীল লোকের রচনা এইকালে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার কোনও ছাপাখানা হইতে দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" বাহির হয়। "নীল দর্পণ" সত্য সত্যই নীলকর ও নীলচাষের দর্পণস্বরূপ—সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিচ্ছবি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তক পাঠ করিবার পর লোকের মনে যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার আরও এক অধ্যায় প্রকাশ পাইল ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে। সারা বাঙ্গলাদেশ বিক্ষুব্ধ আলোড়িত হইয়া পড়িল; লোকের মুখে মুখে এ বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল, প্রতিকারের জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সাধারণের সহানুভূতি

"নীলদর্পণ"

এই অঙ্কের ইহাই শেষ নয়। বাঙ্গলার পাদ্রীরা রায়তের দুঃখে ম্রিয়মাণ ছিলেন; তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশবাসীর আচরণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। "নীল দর্পণ" প্রকাশিত হইবার পর পাদ্রী জেমস্ লঙ (Rev. James Long) উহার এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইহার দ্বারা তিনি সরকার এবং তাঁহার দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন। ১৮৬১ সালে লঙ সাহেবের পক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই অনুবাদকার্য্যের ভার লন। পুস্তক ছাপা হইবার পরও সরকারী মহলে ইহার কোনই প্রতিবাদ হয় নাই, উপরন্তু সরকারপক্ষ লঙকে প্রশংসা করিয়া রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু নীলকরেরা ইহাতে বিশেষ

পাদ্রীদের সহায়তা

বিরক্ত হন ; তাঁহাদের স্বজাতির মধ্যে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন এবং এক মামলা রুজু করেন। ১৮৬১ সালে ৬ই জুন মুদ্রাকরের নামে সমন বাহির হয় ; তথনও গ্রন্থকারের নাম প্রকাশিত হয় নাই। ১১ই জুন তারিখে লঙের অনুরোধে মুদ্রাকর তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া দিয়া দশ টাকা জরিমানা দিয়া অব্যাহতি পান। তখন লঙের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা স্থানান্তরিত করা হয়—for libelling the Editor of "The Englishman" and libelling the Indigo Planters of Lower Bengal in Nil Darpan. ১৮৬১ সালের ১৯শে জুলাই মামলা আরম্ভ হইয়া চার দিন বিচার চলে এবং লঙ সাহেবের হাজার টাকার জরিমানা ও এক মাস কারাবাসের আদেশ হয়। স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সেই মামলায় উপস্থিত ছিলেন এবং রায় বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই টাকা জমা দিয়া দেন। বলা বাহুল্য, লঙের পক্ষে ও বিপক্ষে লোক মিলিয়া বাঙ্গলায় এক প্রচণ্ড আন্দোলন চলিতে থাকে এবং বিচারপতির রায় সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পর হইতে নীলকরের উপদ্রব কতক পরিমাণে হ্রাস পায়।

বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য যত প্রকার বৃক্ষলতাদির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা এই স্থানে দেওয়া সম্ভব নহে, কারণ প্রকৃতপক্ষে এ হিসাব রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। নীল জাতীয় প্রায় তিন শত প্রকারের বৃক্ষলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে কেবল ভারতবর্ষে আন্দাজ চল্লিশ রকমের গাছ আছে। ইউরোপে এই জাতীয় বৃক্ষকে woad (ওয়াড) বলে এবং নীল আমদানী হইবার পূর্ব্বে তাহারা ইহার দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করিত। ভারতীয় নীল আমদানী হইলেও তাহারা অনেক সময় আমদানী করা নীলের সহিত তাহাদের ওয়াড মিশ্রিত করিয়া লইত।

পরিচয়

নীলের চাষ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা বড় কঠিন। স্থান ও ঋতু ভেদে ইহার চাষের সময় এবং বৃক্ষের অবস্থানকাল বিভিন্ন। কোনও কোনও গাছ তিন মাসের মধ্যে পুষ্ট হইয়া উঠে আবার কেহ বা দেড় বৎসরকাল সময় লয়। কোনও কোনও গাছ প্রতি বৎসর নষ্ট করিয়া দিতে হয়; আবার কাহাকেও বা তিন বৎসর ধরিয়া ছেদন করিয়া লওয়া হয়। মোটামুটি, এখন আর দীর্ঘকালস্থায়ী বৃক্ষের চাষ হয় না, প্রতি বৎসরই নূতন গাছ জন্মাইয়া তাহার ডাল-পালা কাটিয়া লওয়া হয়।

পুষ্টির কাল

নানা প্রদেশে নীল চাষের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু প্রধানতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে জমি পাট করিতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র-বৈশাখে বীজ রোপণ করা হয়; এই সময়ের সামান্য তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কোথাও বা আশ্বিনে বীজ রোপণ করিতেও দেখা যায়।

চাষ

নীল গাছ হইতে কি ভাবে নীল পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে অনেকেরই হয়ত কোনও ধারণা নাই; সে কারণে এই স্থানে এ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

ক্ষেত হইতে নীল গাছের ডাল-পালা কাটিয়া আনিয়া প্রকাণ্ড এক চৌবাচ্ছায় ভিজাইতে দেওয়া হয়। সেখানে ১২ হইতে ১৫ ঘণ্টা ভিজিয়া সমস্ত জিনিষটা পচিয়া গাঁজিয়া উঠে। তখন সমস্ত জল অপর এক পাত্রে আনা হয়। প্রথম পাত্র (fermenting vat) অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় পাত্র (beating vat) তাহারই সন্নিকটে নিম্নস্থানে অবস্থিত হওয়ায়, প্রথম পাত্রের সমস্ত জল আপনা হইতেই দ্বিতীয় পাত্রে আসিয়া জমিতে পারে। নীলের ডাঁটা পাতা কয়েক ঘণ্টা জলে ডুবিয়া থাকিবার পর জলের

নীল উদ্ধার

উপর বৃহদাকার বুদ্বুদ উঠিতে থাকে। যতক্ষণ বুদ্বুদের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ জলকে স্থিরভাবে থাকিতে দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা বুঝিতে পারেন, কতক্ষণ গাঁজাইতে দেওয়া চলিতে পারে; কারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত এই কাল গত হইতে দিলে নীলের গুণ হ্রাস পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পাত্রে (beating vats) জল আসিবার পর লোকে কাঠ দিয়া জলে "বাড়ি" মারিতে থাকে। জল ঘন ঘন আন্দোলিত হইলে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং নিজ আকার ধারণ করিয়া পাত্রের তলদেশে গিয়া নীল জমিতে থাকে। সাধারণতঃ এক ঘণ্টা হইতে দেড় ঘণ্টা ধরিয়া লোকে জল আন্দোলিত করে। কালের গতির সহিত লোকে যন্ত্রের সাহায্যে কাঠের চাকা দিয়া জল তোলপাড় করিয়া লয়। কোথাও বা জলের মধ্যে নলের সাহায্যে বাষ্প বা আমোনিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু ইহার চলন খুব বেশী নাই।

জল থিতাইয়া গিয়া পাত্রের নীচে নীল আসিয়া জমে; তখন উপর হইতে ধীরে ধীরে জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ঝাঁট দিয়া সমস্ত নীলকে চৌবাচ্চার এক কোণে জমা করে। উহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত পাতলা অংশকে ভিন্ন পাত্রে গড়াইয়া যাইতে দেয় এবং তথায় ছাঁকিয়া লইয়া তাপাধারে (boiler) রাখিয়া অনেক পরিমাণে জলহীন করিয়া লয়। এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত বুদ্বুদ লোপ পায় এবং এক প্রকার তৈলাকার পদার্থ উপরে জমিতে থাকে। ইহাতে কেবল যে রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, সমস্ত বস্তুর ওজনও কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন তাপাধার হইতে সমস্ত নীলকে নিকটস্থ আর এক পাত্রে (dripping vat) লইয়া যাওয়া হয়। এই পাত্রের তলদেশে ছিদ্র থাকায় বাকী জল চুয়াইয়া যাইবার সুবিধা হইয়া থাকে। যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে ততক্ষণ তাহাকে

বারে বারে সংগ্রহ করিয়া এক আধারে দেওয়া হয়। এই আধারের তলদেশে পশমী বা অন্য জাতীয় বহুল ছিদ্রযুক্ত কাপড় পাতা থাকে এবং তাহাই ফিল্টারের কাজ করে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন একখানি ক্যাম্বিসের উপর সমস্ত নীল ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চাপ দেওয়া হয় এবং সমস্ত জল চুয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। সাধারণতঃ এই নীলই বাজারে চলে। কেহ কেহ বা বহুছিদ্রযুক্ত বাক্সের মধ্যে পাতলা কাপড় পাতিযা সমস্ত নীলকে ৮ বা ৯ ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালে এবং উপরের আবরণী বা ঢাকনী বন্ধ করিয়া চাপ দিতে থাকে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা অন্তর উপর হইতে পুনঃ পুনঃ চাপ দিবার ফলে সমস্ত জল নিঃশেষে চলিয়া যায় এবং তিন হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ পুরু নীলের "বরফি" (cake) পাওয়া যায়। তখন এই বাক্সের ধারের কাঠগুলি খুলিয়া নীল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখা হয় এবং সূতা বা তার দিয়া তিন ইঞ্চি পরিমাণ ঘন-চাকৃতি (cube) কাটিয়া রৌদ্রহীন স্থানে শুকাইতে দেওয়া হয়। রৌদ্রে শুকাইলে চাকতিগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া ছায়ায় শুকাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

এই প্রক্রিয়া ছাড়া শুষ্ক পত্রাদি হইতে নীল বাহির করিবার আর এক পন্থা আছে। ইহাতে লতাপাতা একেবারে ভিজাইতে না দিয়া ডাঁটা প্রভৃতি সমস্ত রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। তাহার পর কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া পাতাগুলি পৃথক করিয়া এই পাতার পরিমাণের ছয় গুণ জল ঢালিয়া দেয় এবং যতক্ষণ না সমস্ত পাতাগুলি জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়, ততক্ষণ জল আন্দোলিত করা হয়। এই অবস্থায় দুই ঘণ্টাকাল থাকিলেই জলের রঙ পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার পর ইহা দ্বিতীয় পাত্রে দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে উপরে বর্ণিত প্রথম পন্থানুযায়ী সকল প্রক্রিয়া পালন করিয়া নীল উদ্ধার করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নীলের সে কদর নাই; আজ তাহার স্থান অপরে দখল করিয়াছে। সুতরাং আগে যত আবাদ হইত, এখন আর তত হয় না, এমন কি তাহার শতকরা তিন ভাগ জমিতে চাষ হয় না।

আবাদ হ্রাস

তাহা ছাড়া এখন নীলের আবাদ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গলা ও বিহারে (বিশেষতঃ চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ ও সারণ) অধিক মাত্রায় চাষ হইত; বর্ত্তমানে মদ্রে এবং পঞ্চনদে হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশে সামান্য চাষ হয়; পরিশিষ্ট (ক) ও (খ)।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় উল্লেখযোগ্য চাষ নাই; বিহারে এখনও দ্বারবঙ্গ ও চম্পারণে নীলের আবাদ বাঁচিয়া আছে; প্রত্যেকের অংশে ছয় শত একর পড়ে। যুক্তপ্রদেশে আলিগড়, বুলন্দসর, মীরাট (১৫০ একর) এবং পঞ্চনদে মজঃফরগড় ও মূলতানের নাম বিশেষে উল্লেখযোগ্য; তথায় যথাক্রমে সাত

জেলা পরিচয়

হাজার ও দুই হাজার একরের অধিক জমিতে নীলের আবাদ হয়; তৎপরে ডেরা গাজি খাঁর নাম জানা দরকার। মদ্রের চাষই বেশী; দক্ষিণ-আর্কট (৬ হাজাব একরের অধিক জমি), কর্ণূল, কদ্দাপা, চিত্তুর, চিংগ্লপুট প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাষ হয়। কিন্তু এই আবাদের পরিমাণের কোনও স্থিরতা নাই; হঠাৎ সামান্য কারণে ইহার তারতম্য হইয়া পড়ে। অন্যান্য অনেক প্রদেশে একেবারেই চাষ হয় না।

করদ রাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ এবং সিন্ধু প্রদেশের খয়েরপুর রাজ্যে নীলের চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে হায়দরাবাদেই বেশী।

বর্ত্তমানে যবদ্বীপ এবং নাটাল ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই সকল স্থান

ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী

হইতে নীল রপ্তানী হওয়ায় ভারতের রপ্তানীর আর কোনও স্থিরতা নাই। এক সময়ে জাভা প্রভৃতি স্থানে নীল আবাদের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিয়াছিল এবং সে চেষ্টার

মূলে ওলন্দাজ প্রভৃতির অর্থলিপ্সা ও বাণিজ্য-প্রবৃত্তি বলবান ছিল; কিন্তু কালের গতিতে সে পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া যায়।

বাণিজ্য

বিদেশী বণিকেরা ভারতবর্ষে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেও নীল একটী প্রধান পণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং ঐ সময় ভারত বাণিজ্য যতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে সকল দেশেই ভারতীয় নীল চালান যাইত। ইংরাজ আসিয়া যে সকল বস্তু রপ্তানীযোগ্য মনে করে, নীল তাহার মধ্যে অন্ততম। তাহারা ইংলণ্ডে ভারতীয় নীল লইয়া গিয়া, তথা হইতে দেশ বিদেশে চালান দিত। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দেই এইরূপে রপ্তানীর পরিমাণ কমবেশী ৯ হাজার হন্দর হইয়াছিল। ঐ সালে ভারত হইতে মোট নীল রপ্তানীর হিসাব পাওয়া দুরূহ। ১৮৪৮ সালে ঘরোয়া ব্যবহার ছাড়াও ৩ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার নীল রপ্তানী হয়। এখন হইতে ১৯০০-০১ সাল পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর বরাবরই ২ কোটী টাকার উর্দ্ধমূল্যে নীল বিদেশে গিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার অধিকাংশ বৎসরই ৩ কোটী হইতে ৫ কোটী টাকার রপ্তানী ছিল। মূল্য হিসাবে ১৮৭১-৭২ সালেই রপ্তানীর চূড়ান্ত অর্থাৎ ৫ কোটী ৫৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৩০ টাকা (১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪১৪ হন্দর) হইয়া যায়। ১৮৬২-৬৩ সালের পূর্ব্বে রপ্তানীর পরিমাণের হিসাব পাওয়া যায় নাই। তাহার পর হইতে ১৮৯৫-৯৬ সালই পরিমাণ হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৩৭ হন্দর নীল (মূল্য ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা) রপ্তানী হয়। উহা ১৯০১-০২ সালে প্রথম দুই কোটী টাকার নীচে (১৮৯,৭৫০ হন্দর) এবং ১৯০৪-০৫ সালে (৪৯,২৫২ হন্দর) এক কোটী টাকারও নীচে নামে। যুদ্ধের পূর্ব্বে (১৯১৩-১৪) মাত্র সওয়া ২১ হাজার টাকা (১০,৯৩৯ হন্দর) হয়। যুদ্ধ বাধিলে আবার ভারতীয় নীলের প্রয়োজন কিরূপ বাড়িতে পারে, উহার মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পায় তাহা পরের কয়

বৎসরের অঙ্ক হইতে বুঝিতে পারা যায়; পরিশিষ্ট (গ ও ঘ)। ১৯১৫-১৬ এবং ১৯১৬-১৭ সালে প্রতি বৎসর দুই কোটী টাকার উপর এবং ১৯১৭-১৮ হইতে ১৯১৯-২০ এই তিন বৎসর প্রতি সনেই প্রায় দেড় কোটী টাকার নীল রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধ নিবৃত্তি হইলেই (১৯২০-২১) আবার ৪১ হাজার টাকা (১০,৬৫০ হন্দর) হয়। বর্ত্তমানে নামমাত্র রপ্তানী আছে, অর্থাৎ ৩৪১ হন্দর এবং ৪১ হাজার টাকা দাম; পরিশিষ্ট (ঘ)।

আমদানী

যেমন রপ্তানী বাজারে ভারতীয় নীল হটিতে আরম্ভ করিল, বিদেশী যৌগিক নীল এদেশে তদনুপাতে বেশী আমদানী হইতে চলিল। ১৮৯০ সালেই বিদেশী যৌগিক নীল আমদানীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; তাহার আরও কত আগে আসিয়াছে, এখন তাহা বলা কঠিন। বর্ত্তমানে (১৯৩৮-৩৯) ৭ লক্ষ হন্দর নীল ১০ লক্ষ টাকার আমদানী হয়; পরিশিষ্ট (ঙ)।

সাধারণের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে নীলের এ দুর্দ্দশার কারণ কি? রায়তদের দুঃখে নীলকুঠীর সাহেবরা দয়া করিয়া কি নীলের আবাদ বন্ধ করায় নীলের বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে? এরূপ ধারণা করিবার কোনও কারণ নাই। একপ্রকার প্রজাবিদ্রোহ হইয়া আবাদের হানি হইয়াছিল এবং রায়তরা তখন সরকারী সহায়তা পাইয়া কতকটা বলশালী হইয়াছিল। কিন্তু আসল বিপদ হইল রসায়ন শাস্ত্রের উপদ্রবে। ১৮৫৬ সালে পার্কিন আলকাতরা হইতে বহু প্রকার রঙ আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে

যৌগিক নীল আবিষ্কার

১৮৭৯ সালে জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক যৌগিক নীল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ভারতীয় উদ্ভিজ্জ নীলের প্রকৃত বিপদ দেখা দেয়। দশ বৎসরের মধ্যেই রপ্তানীতে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল; পরিশিষ্ট (ঘ)।

বরাবরই ইংরাজ ভারতীয় নীলের প্রধান খরিদ্দার ছিল; এখনও যাহা যায়, তাহা ইংলণ্ডই বেশী যায়; অপরাপর দেশ যে পরিমাণ লয়, তাহা উপেক্ষা করা চলে।

ক্রেতা

রঞ্জন কার্য্যেই নীলের ব্যবহার এবং সেই কারণে ইহার আদর। এখন ঐ সমস্ত কাজ যৌগিক নীল দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই যৌগিক নীলের মধ্যে কেবল অবিমিশ্র ইণ্ডিগোটিন আছে এবং উদ্ভিজ্জ নীলের মধ্যে যে "indigo red" এবং "indigo brown" পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত যৌগিক নীলের মধ্যে নাই। রঞ্জনকার্য্যে "indigo red" ও "indigo brown" উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে কারণে উদ্ভিজ্জ নীল অপর যৌগিক নীল হইতে গুণে শ্রেষ্ঠ। উদ্ভিজ্জ নীল দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রাদি জলীয় বাষ্পের উপর ধরিলে একটি সুগন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু যৌগিক নীল দ্বারা রঞ্জিত পশমী বস্ত্রাদি হইতে আলকাতরার একটা তীব্র গন্ধ নির্গত হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা পশমী বস্ত্রাদি কিরূপ নীলে রঞ্জিত হইয়াছে তাহা ধরা যাইতে পারে। রেশমী বস্ত্রাদি উদ্ভিজ্জ নীল দ্বারা রঞ্জিত হইলে আরও বেশী সুফল পাওয়া যায়, কাপড় শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং রঙও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই সকল কারণে মূল্যবান বস্ত্রাদির জন্য এখনও উদ্ভিজ্জ নীলের প্রয়োজন আছে; কিন্তু ইহা আব বেশী দিন নহে।

উদ্ভিজ্জ বনাম যৌগিক নীল

নীলের গাছ জমির ভাল সার, সুতরাং নীল বাহির করিয়া লইবার পর তাহা মাটীতে মিশাইয়া দেওয়া হয়।

পরিশিষ্ট—নীল

(ক)

জমি, ফলন ও প্রদেশের অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট জমি	৪০,০০০	একর	
ব্রিটিশ ভারত	৩৮,৫০০	"	৯৬·২%
করদ রাজ্য	১,৫০০	"	৩·৮%
মোট ফলন	৬;৭০০	হন্দর	
ব্রিটিশ ভারত	৬,৬০০	,,	৯৮·৩%
করদ রাজ্য	১০০	,,	১·৪%

প্রদেশ	জমি একর	শতকরা অংশ	ফলন হন্দর	শতকরা অংশ
মদ্র	২৩,২০০	৫৮·০	৩,৯০০	৫৮·২
পঞ্চনদ	১১,৩০০	২৮·২	২,০০০	২৯·৮
যুক্তপ্রদেশ	২,৬০০	৬·৫	৩০০	৪·৪
বিহার	১,৪০০	৩·৫	৪০০	৫·৯
করদরাজ্য				
হায়দরাবাদ	১,৩০০	৩·২	১০০	১·৪
খয়েরপুর	২০০	·৫	১০০	১·৪

উপরোক্ত অঙ্কে শুষ্ক নীলের ওজন দেওয়া হইল।

(খ)

যৌগিক নীল আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে ভারতে জমি ও ফলনের পরিমাণ

সাল		হাজার একর		হাজার হন্দর
১৮৯২-৯৩	...	১,৭৯,০৫৬	...	১২,১৯
১৮৯৪-৯৫	...	২,৩৭,৪৯৪	...	১৬,৮৯

(অনুসৃত)

সাল		হাজার একর		হাজার হন্দর
১৮৯৬-৯৭	...	১,৬৮,৬৭৩	...	১৬,০৯
১৮৯৮-৯৯	...	১,৩৯,৩২০	...	১০,১০
১৯০০-০১	...	১,৪৮,০২৯	...	৯,৯০
১৯০২-০৩	...	৭৯,২০৭	...	৬,৪৬
১৯০৪-০৫	...	৫৬,২০০	...	৪,৭৪
১৯০৫-০৬	...	৪৬,৫০০	...	৫,৮৪

গত তিন বৎসরের ফলনের পরিমাণ

সাল		একর		হন্দর
১৯৩৫-৩৬	...	৪০,৪০০	...	৬,৮০০
১৯৩৬-৩৭	...	৪৪,৩০০	...	৭,২০০
১৯৩৭-৩৮	...	৪০,০০০	...	৬,৭০০

(গ)

নীলের দাম

১৮৬১ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

প্রতি মণ (৭৪'৬৭ পাউণ্ড) নীলের দাম

সাল		টাকা	আনা	সাল		টাকা	আনা
১৮৬১	...	২৪০	—	১৮৯৫	...	২৭৫	—
১৮৬২	...	২৯৫	—	১৮৯৮	...	২০০	—
১৮৬৫	...	২৪০	—	১৮৯৯	...	১৫০	—
১৮৭০	...	৩১৭	—	১৯০০	..	১৯৫	—
১৮৭৫	...	২৮৫	—	১৯০৫	...	১৪০	—
১৮৮০	...	৩১৭	—	১৯১০	...	১৫৫	—
১৮৮৫	...	২৭০	—	১৯১৪	...	১৬৫	—
১৮৯০	...	২০০	—	১৯১৫	...	৬৫০	—
১৮৯২	...	১৯৫	—	১৯১৬	...	৬৫০	—
১৮৯৩	...	৩০০	—	১৯১৭	...	৫৩৭	—

সাল		টাকা	আনা	সাল		টাকা	আনা
১৯১৮	...	২৮২	৮	১৯৩০	...	১৯৭	—
১৯১৯	...	৩৭২	৮	১৯৩৫	...	১৩২	৮
১৯২০	...	৪১২	৮	১৯৩৭	..	১৩২	৮
১৯২৫	...	২৩৬	৪	১৯৩৮	...	১৩২	৮

(ঘ)

রপ্তানী—নীল

১৮৪৮-৪৯ হইতে বিশিষ্ট কয়েক সালের রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য :—

সাল	হন্দর	হাজার টাকা
১৮৪৮-৪৯	...	৩,১৪,০২
১৮৫৪-৫৫	...	২,৫৫,২৭
১৮৫৯-৬০	...	৩,০৩,১৩
১৮৬৪-৬৫	৮৭,০১০	২,৭৯,৬২
১৮৬৯-৭০	৯৮,০৮৫	৪,৭৬,৭১
১৮৭১-৭২	১,১৫,৪১৪	৫,৫৩,১৬
১৮৭২-৭৩	১,১৫,৩১২	৫,১৩,০২
১৮৭৩-৭৪	১,১৫,৯৮০	৫,৩৩,৩০
১৮৭৪-৭৫	৮১,৪৬৬	৩,৮৬,৪৫
১৮৭৯-৮০	১,০০,৯৩৫	২,৯৪,৭৪
১৮৮৩-৮৪	১,৬৮,৫৯০	৪,৬৪,১০
১৮৮৯-৯০	১,৫৭,১৬৬	৩,৮৬,৩১
১৮৯৪-৯৫	১,৬৬,৩০৮	৪,৭৪,৫৯
১৮৯৫-৯৬	১,৮৭,৩৩৭	৫,৩৫,৪৫
১৮৯৯-০০	১,১১,৪২০	২,৬৯,৪০
১৯০১-০২	৮৯,৭৫০	১,৮৫,২৩
১৯০৪-০৫	৪৯,২৫২	৮৩,৪৬
১৯০৯-১০	১৮,০৬১	৩৫,১৮
১৯১৩-১৪	১০,৯৩৯	২১,২৯

(অনুসৃত)

সাল	হন্দর	হাজার টাকা
১৯১৪-১৫	১৭,১৪২	৮৯,৯৫
১৯১৫-১৬	৪১,৯৩২	২,০৭,৮৭
১৯১৬-১৭	৩৪,২৩০	২,১১,২৬
১৯১৭-১৮	৩১,০৬২	১,৫২,৮১
১৯১৮-১৯	৩২,৭০৭	১,২৪,৮৫
১৯১৯-২০	৩২,৬৮৭	১,৩২,৭৬
১৯২০-২১	১০,৬৫০	৪১,২১
১৯২৪-২৫	৩,৩০৮	১০,৯২
১৯২৯-৩০	৮৬৭	২,৪১
১৯৩৪-৩৫	৫৪৪	১,০৭
১৯৩৬-৩৭	৪৭৮	৭৭
১৯৩৭-৩৮	৪২৫	৭২
১৯৩৮-৩৯	৩৪১	৪১

(ঙ)
আমদানী—যৌগিক নীল

		হন্দর		টাকা
১৯৩৬-৩৭	...	৭,৯৯,৮৫১	...	১০,৫৮,৬৮৮
১৯৩৭-৩৮	...	৯,০৪,৯০৯	...	১২,৬৭,৬৩০
১৯৩৮-৩৯	...	৬,৯৭,৮৩৫	...	১০,০৯,৩৪৮

কফি (Coffee)

আজ কফি গাছের আদি জন্মস্থান অনুসন্ধান করিতে গেলে বিফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আবিসিনিয়া এবং আরব, সুদান, মোজাম্বিক, নিউগিনি প্রভৃতি সকল দেশের সহিত কফি গাছের উৎপত্তি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে আবিসিনিয়াকে এই সম্মানের স্থান দিতেই তাঁহারা ইচ্ছুক।

আরব হইতে আবিসিনিয়ায় নীত হইয়া কফি গাছ সেখানকার জল-হাওয়ার গুণে বিশেষভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এরূপ মতও আছে।

মিসর ও আরবের নানাস্থানে কফি ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ত্তমান কালে কফি পানের রীতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা তখন জানা ছিল না। কেহ কহ বলেন সেঁকা বা ভাজা কফি চূর্ণের কাথ পান করা এদেনে সুরু হয়; পরে ঐ স্থান হইতে মক্কা, মদিনা, কনষ্টান্টিনোপল প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

কফি পানের সূত্রপাত

১৬৭৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কফি আসিয়া পৌছে নাই, অন্ততঃ বিশেষ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ১৬৯০ সাল পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কফিই আরব ও আবিসিনিয়া হইতে সরবরাহ হইত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাবা বুদন নামে কোনও ফকির মক্কা হইতে ফিরিবার পথে ভারতবর্ষে প্রথম কফির দানা লইয়া আসেন এবং মহীশূরের কাদুর জেলায় ঐ বীজ রোপণ করেন, ইহাই কিম্বদন্তী। ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে নিয়মিত কফির আবাদ হয় নাই এবং চিক্‌মুগলুরে ক্যানন (Mr. Cannon) সাহেবের আবাদই হিসাব মত প্রথম বলা চলে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে অন্যান্য আবাদ গড়িয়া উঠে এবং ১৮৫৬ সালে নীল-গিরিতে বহু আবাদ স্থাপিত হয়।

পরের ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মহীশূর, কুর্গ, নীলগিরি ও সেভারয় পাহাড় (সালেম), ওয়াইনাদ (মালবার জেলা) ও ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচুর কফির আবাদ সৃষ্টি হয়। ১৮৬২ সালে দক্ষিণ ভারতে কফি আবাদের চূড়ান্ত প্রসারলাভ ঘটে। ১৮৬৫ সালে বৃক্ষের কাণ্ড ছিদ্রকারী কীট ওয়াইনাদ ও কুর্গে আসিয়া দেখা দেয় এবং তাহার পরই পাতার পোকা আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৮৭৭ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল স্থানের বহু আবাদ

আবাদ বৃদ্ধি

পরিত্যক্ত হয়। তাহা হইলেও অন্য স্থানের আবাদগুলি ভারতে তৎকালীন উৎপন্ন কফির পরিমাণ বহুলাংশে বজায় রাখে।

এই স্থানে সিংহলের কফি আবাদের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যখন ভারতে কফির আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং রপ্তানীর সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখন সিংহলে দ্রুত কফির আবাদ প্রবর্ত্তিত হয়। হিসাবমত ভারতবর্ষ হইতে কফির বীজ স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই আরবেরা সিংহলে কফির বীজ লইয়া আসে। পরে ওলন্দাজদিগের অধিকারকালে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে নূতন করিয়া আধুনিক প্রথা অনুযায়ী আবাদের পত্তন হয়।

সিংহলের আবাদ

ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে চা আবাদ বিশেষ প্রসারলাভ করে এবং বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। ঘটনাচক্রে সিংহল আসিয়া এখানে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়া যায়। ১৮৬৯ সালে সিংহলের কফির আবাদে গাছের প্রবল রোগ দেখা দেয়। ১৮৭৪ সাল নাগাদ কফি আবাদের ভীষণ ক্ষতি হয় এবং ১৮৮৭ সালে কফি আবাদ একেবারে উৎসন্ন বা নির্ম্মূল হইয়া যায়। তখন সিংহল চা আবাদ করিতে উৎসাহ-সহকারে লাগিয়া যায় এবং বর্ত্তমানে উহাই জাভার সহিত মিলিয়া ভারতীয় বাণিজ্যের বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে কফি গাছকে নানাভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আরব্য (Arabian) এবং লাইবিরীয় (Liberian) এই দুইটি প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গাছগুলি বহু পরিমাণে অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে, কিন্তু লাইবিরীয় জাতি বৃক্ষে অত্যধিক সেচের প্রয়োজন।

চাষ

কফির চারা আতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অন্য বৃহত্তর বৃক্ষের

ছায়ার প্রয়োজন আছে। সুতরাং কফির আবাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় অন্য গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বড় গাছগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তলদেশে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া বীজতলা প্রস্তুত করিতে হয়। বীজতলার জন্য জমি গভীরভাবে খুঁড়িয়া ফেলা দরকার। চারার জন্য খুব ভাল বীজ রোপণ করিতে হয়; কাহারও কাহারও মতে মূল বৃক্ষ হইতে খুব পাকা ফল তুলিয়া আনিয়া কয়েক দিনের মধ্যে বীজতলায় বা হাপরে রোপণ করিলে চারা ভাল হয়।

অন্তত: এক বৎসরের চারা হইলে তুলিয়া লইয়া কোনও মেঘলা বা বর্ষণোন্মুখ দিনে স্থায়ী আবাদে রোপণ করে। প্রতি চারা হইতে অপর একটি চারা সকল দিক হইতে অন্তত: সাত আট ফুট পৃথক করিতে হয়। গাছ বেশী ঘন হইলে আবাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। চারাগুলি বসাইবার জন্য গভীর গর্ত্ত করিয়া পরে তাহার মধ্যে শিকড়সমেত গাছ বসাইয়া দেয়। গাছের শ্রেণীর মধ্যে সেচের জল দিবার ব্যবস্থা করা দরকার; তাহা না হইলে শীঘ্র গাছের গোড়া শুকাইয়া উঠিলে আবাদের ক্ষতি হয়। এই সময় নানাপ্রকারে জমিতে সার দিয়া উর্ব্বর করিয়া লয়; কাহারাও বা জমিতে কোনও প্রকার বৃক্ষাদি বসাইয়া উহার সাহায্যে বায়ুর নাইট্রোজেন জমিতে স্থিতিবান্ করিতে চেষ্টা করে। গাছগুলি দুই তিন বৎসরের হইলে তাহার শীর্ষভাগ ছাঁটিয়া দেওয়া (topping) প্রয়োজন; ঐ ছিন্নস্থান হইতে আবার নূতন শাখা বাহির হইয়া উপর দিকে উঠিতে থাকে। এই ভাবে আন্দাজ দুই ফুট উঠিলে আবার ডগা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; কখনও কখনও বৃক্ষটি কমবেশ চার হাত লম্বা হওয়া পর্য্যন্ত আরও একবার ভাঙ্গিয়া দেয়; এবং গাছের শীর্ষভাগে একটি ডেলা বা গাঁইটের মত হইয়া যায়। উহারই নীচের শাখাগুলি রৌদ্র ও আলোকের সহায়তা পাইয়া বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহাতে

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল ধরে। সময় সময় ফলের ভারে গাছের অগ্রভাগ চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং নীচের দিকে ঐ ফাটা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় সমস্ত গাছটিকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

গাছগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার এবং বিশেষ ফলদায়ক করিবার জন্য অপ্রয়োজনীয় সমস্ত ডালপালা কাটিয়া দেয় (handling)। ঐ বৎসর ফল হইয়া যাইবার পর আবার পুরাতন শাখা প্রভৃতি দূর (pruning) করিয়া নূতন ফল দিবার উপযুক্ত প্রশাখাগুলির বৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দিতে হয়। এইভাবে গাছ ছাঁটিয়া দিবার সমস্ত কাজ ফুল আসিবার পূর্ব্বেই শেষ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, কফি গাছের pruning বা ছাঁটাই, চা গাছের ছাঁটাই হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয় ডালপালাগুলি দ্বিতীয়বার কাটিয়া দেওয়া হয় এবং যাহাতে বৃক্ষত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

বিভিন্ন অংশ

কফি ফলের প্রতি অংশের এক একটি নাম আছে এবং ব্যবহারের যোগ্য কফি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইলে ঐ অংশগুলি স্বতন্ত্র করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সুপক্ক কফি ফলকে "চেরী" (cherry) এবং তন্মধ্যস্থিত দুইটি বীজকে "বেরী" (berries) বলে। যদি দুইটির পরিবর্ত্তে একটি মাত্র বীজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে "পি-বেরী" (pea berry) বলে। বীজ বা দানার উপরের নরম শাঁসযুক্ত আবরণীকে "পাল্প" (pulp) এবং অন্তর্ভাগের বা শাঁসের নিম্নভাগের দৃঢ়সংযুক্ত ছদ বা ছালের নাম "পার্চ্চমেণ্ট" (parchment)। পার্চ্চমেণ্টের মধ্যে বীজের গাত্রে সংযুক্ত আবরণী "সিলভার স্কিন" (silver skin) নামে পরিচিত। নরম শাঁস বা pulp প্রায়ই আবাদে (plantation) দূর করে, কিন্তু বীজের

উপর পার্চ্চমেণ্ট থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ এই পার্চ্চমেণ্ট-আচ্ছাদিত কফি বীজ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মার্চ্চ মাসে গাছে ফুল দেখা যায় এবং অক্টোবর মাস নাগাদ ফল পাকিতে আরম্ভ করে এবং জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলে। ভারতবর্ষে গাছ হইতে হাতে করিয়া ফল তুলিয়া আনে। আরবে বৃক্ষ-নিম্নে মাটী হইতে উপরে কাপড় পাতিয়া ধরে এবং গাছ নাড়া দিয়া ঐ কাপড়ে ফল সংগ্রহ করে। মাটীতে ঝরিয়া পড়া ফলকে "Jackal Coffee" (জম্বুক কফি) বলে।

ব্যবহারোপযোগী কফি প্রস্তুত প্রণালী

যন্ত্র সাহায্যে প্রথমে বীজের উপরের শাঁসগুলি দূর করে। কোথাও বা পরিমাণ অল্প হইলে, জলে ভিজাইয়া গাঁজাইয়া লয় এবং আঘাত দ্বারা বীজ হইতে পৃথক করে। পরে বীজগুলি খুব ভাল করিয়া জলে ধুইয়া সমস্ত আঠাল অংশ দূর করে এবং ভাল করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দেয়।

তাহার পর "পার্চ্চমেণ্ট" ও "সিলভার স্কিন" বা বীজগাত্রের পাতলা আবরণীগুলি দূর (hulling) করিবার পালা। তাহার পর মাপ হিসাবে সমস্ত বীজগুলি বিশেষভাবে পৃথক করিয়া সেঁকিয়া ফেলে। যদি ক্ষুদ্রাকারের বীজ থাকে, সেগুলি পুড়িয়া কয়লার মত হয় এবং তাহা হইতে সঙ্গের সমস্ত কফিতে পোড়া, কটু গন্ধ মিশিয়া তাহার দাম হ্রাস করিয়া ফেলে।

কফি সেঁকা হইলে খুব যত্ন সহকারে, পাত্রের মধ্যে বন্ধ করা হয়। বাক্সের কাঠে যদি কোনও গন্ধ থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কফিতে ঐ গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে পারে ; সুতরাং এই আধার নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে, দক্ষিণে পশ্চিমঘাটের ঢালু প্রদেশ, প্রায় কুমারিকা

অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মদ্রের মধ্যে নীলগিরি সর্ব্বপ্রধান। তাহার পর সালেম, মাদুরা, মালবার, কইম্বাটুর ও তিনেভেলী জেলা প্রধান। ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে অপর একটি স্থানের নাম করা প্রয়োজন এবং তাহা হইল কুর্গ। এখানে আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৪০,০০০ একর। করদরাজ্যের মধ্যে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন পড়ে। করদরাজ্য মহীশূরের মধ্যে কাদুর, হাসান ও মহীশূর প্রধান। কাদুর ও হাসান সকল দিক হইতেই ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবাদ।

ভারতের কফি আবাদ

করদরাজ্যগুলিতে আবাদী জমির পরিমাণ অধিক হইলেও (৫৬'৪%), উৎপন্ন কফির পরিমাণে ব্রিটিশ ভারতের স্থান অনেক উপরে (৫৪·৩%)। কুর্গ-এ জমির অনুপাতে ফলন খুবই বেশী। ভারতবর্ষে মোট জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৯০ হাজার একর এবং ব্যবহারযোগ্য ফসলের পরিমাণ (cured coffee) ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। কুর্গ-এ জমির পরিমাণ ৩৯,১০০ একর (২০·৬%) আর ফসলের হিসাবে ১ কোটি ১১ লক্ষ পাউণ্ড (৩২·৫%)। করদ রাজ্য হিসাবে মহীশূরের নামই উল্লেখযোগ্য; পরিশিষ্ট (ক)।

ভারতবর্ষে (১৯৩৮) মোট আবাদের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। তন্মধ্যে করদরাজ্যে বেশী অর্থাৎ ৩,৫০০ এবং ব্রিটিশ ভারতে ২,৫০০। ইহাতে স্থায়ী মজুর সংখ্যা ৬০ হাজারেরও অধিক; ইহা ছাড়া ঠিকা মজুরও আছে।

আবাদের সংখ্যা

কফি প্রস্তুত করিবার জন্যও আন্দাজ কুড়িটি কারখানা আছে। ইহার অধিকাংশই কইম্বাটুর, টেলিচেরী, ক্যালিকট, ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। চেরী (cherry) ও আবাদী কফি (plantation coffee)

নামে দুই প্রকার কফি প্রস্তুত হয়। A. B ও C. অক্ষর দ্বারা রপ্তানী কফির মাপ নির্দ্ধারিত হয়; তাহা ছাড়া বিভিন্ন মাপের চূর্ণিত কফি "triage" নামে পরিচিত।

বাণিজ্য

আন্দাজ ১৮০৭ সালে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে কফি রপ্তানী হইয়াছিল। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মারফত ২,৭২১ হন্দর যায়; আর বে-সরকারী কফি যায় নাই। দুই বৎসরের মধ্যেই (১৮০৯) সালে, ব্যবসায়ীতে ২১৩ হন্দর কফি লইয়া যায় এবং সরকারী রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৯-৫০ সালে ১১ লক্ষ টাকার কফি রপ্তানী হয়। অতি শীঘ্র ভারতের কফি ইউরোপে প্রিয় হইয়া উঠে এবং ১৮৬০-৬১ সালে ৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে চলিয়া যায়। এই বৃদ্ধির ক্রমানুগতিক ধারা পরিশিষ্টে (খ) দিলাম। উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৯৫-৯৬ সাল এবং বর্ত্তমানে ১৯২৭-২৮ সালই কফি রপ্তানীতে বিশেষ স্থান অধিকার করে করে। ঐ দুই বৎসরে যথাক্রমে ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার (২,৯৮,৪৩৫ হন্দর) এবং ২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার (২,৭৬,৬৬৮ হন্দর) কফি বিদেশে যায়। কিন্তু ১৮৭৫-৭৬ সালে যে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা (৩,৭৩,৪৯৯ হন্দর) রপ্তানী হয়, আজ পর্য্যন্ত আর সেরূপ হয় নাই। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহা নামিয়া ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকায় আসে; ১৮৬০-৬১ সাল হইতে এত কম রপ্তানী আর কখনও হয় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে আজ এই কফি ব্যবসায়েও ভারত এক বিপদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। গত বৎসরে কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে কিন্তু এখন অন্যান্য দেশে যেভাবে কফি আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পূর্ব্বের দিন ফিরিয়া আসা সম্ভব নহে। রপ্তানীর পরিমাণ হিসাবে ১৮৭১-৭২ সাল (৫,০৭,২৯৬ হন্দর) প্রধান; পরিশিষ্ট (খ)।

বহুদিন হইতেই ইংরাজ আমাদের প্রধান ক্রেতা ; সে অবস্থা আজও আছে। তাহার অংশ ৭৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৩ লক্ষ টাকা (৪৬'৮%)। নরওয়ে, বেলজিয়ম, ইরাক, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি আমাদের অপর ক্রেতা ; পরিশিষ্ট (গ)।

ক্রেতা

পৃথিবীতে আন্দাজ পাঁচ কোটী হন্দর কফি উৎপন্ন হয়। কফির আবাদ এবং ফলনের হিসাবে ব্রেজিল সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে এবং কম বেশ তিন কোটি পাউণ্ড কফি সেখানে জন্মে। কলম্বিয়া, সালভাডর, গুয়েটামালা প্রভৃতি দেশ কফি উৎপাদনে খ্যাতি লাভ করিয়াছে ; পরিশিষ্ট (ঘ)। কফির বাজার ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ আগে অনেক কফি লইত, এখন সামান্যই লয়। ব্রেজিলের উৎপন্ন সমস্ত কফির উপযুক্ত বাজার ও ব্যবহার না থাকাতে, তাহারা বহু পরিমাণ কফি দগ্ধ করিয়া ফেলে।

প্রতিদ্বন্দ্বী

মৃদু উত্তেজক পানীয় রূপেই কফির ব্যবহার আছে ; অন্য ব্যবহার বিশেষ নাই। কফি পানে সাধারণতঃ সামান্য অনিদ্রা ঘটে, সেই কারণে হোমিওপ্যাথিতে নিদ্রা-হীনতায় 'কফিয়া' দেওয়ার রীতি আছে।

ব্যবহার

বর্ত্তমানে অনেক কফি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয় বলিয়া তাহার অন্য ব্যবহার আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ব্রেজিলের ঐ জাতীয় কফি হইতে জমির সার এবং আকৃতিধারণক্ষম কর্দ্দমকোমল বস্তু (plastic material) প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা সম্ভব হইলে প্রচুর কফি কাজে লাগিয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট—কফি

(ক)

১৯৩৭-৩৮

মোট জমি	১,৯০,০০০	একর	
ব্রিটিশ ভারত	৮২,৮০০	,,	৪৩·৬%
করদ রাজ্যসমূহ	১,০৭,২০০	,,	৫৬·৪%
মোট ফলন	৩,৪০,০৮,০০০	পাউণ্ড*	
ব্রিটিশ ভারত	১,৮৪,৯২,০০০	,,	৫৪·৩%
করদ রাজ্যসমূহ	১,৫৫,১৬,০০০	,,	৪৫·৭%

ব্রিটিশ ভারত	একর	শতকরা অংশ	লক্ষ পাউণ্ড	শতকরা অংশ
মদ্র	৪৩,৬০০	২২·৯	৭৪	২১·৭
কুর্গ	৩৯,১০০	২০·৬	১,১১	৩২·৫
উড়িষ্যা	১০০	—	—	—
করদ রাজ্য				
মহীশূর	১০৪,২০০	৫৪·৮	১৪,৯·৪	৪৩·৫
কোচিন	১,৯০০	১·০	৪·৩৪	১·২
ত্রিবাঙ্কুর	১,১০০	·৫	১·৩৮	·৪

(খ)

রপ্তানী—কফি*

১৮৪৯-৫০ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য

		হন্দর		হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০	...	—	...	১০,৯৬
১৮৫৪-৫৫	...	—	...	১২,৪২
১৮৫৯-৬০	...	—	...	২৮,২৮
১৮৬০-৬১	...	—	...	৫০,৬১
১৮৬৩-৬৪	...	২,৩৮,৮৭২	...	৯৮,৬৫
১৮৬৪-৬৫	...	২,৮৯,১০০	...	১,২০২৯

*Cured Coffee.

	হন্দর	হাজার টাকা
১৮৬৯-৭০ ...	৩,২২,১৬০ ...	১,৩০,৫৩
১৮৭১-৭২ ...	৫,০৭,৩০০ ...	২,০৭,০৬
১৮৭৪-৭৫ ...	৩,১২,৮৭৪ ...	১,৯৬,১৯
১৮৭৫-৭৬ ...	৩,৭৩,৪৯৯ ...	২,৪৫,০০
১৮৭৯-৮০ ...	৩,৬১,০৩৭ ...	১,৬৩,৩০
১৮৮৪-৮৫ ...	৩,৪২,৬৮২ ...	১,২৮,৮০
১৮৮৯-৯০ ...	২,৪১,৬৮৮ ...	১,৫৬,০০
১৮৯৪-৯৫ ...	২,৯৪,৭৪৪ ...	২,১২,২৪
১৮৯৫-৯৬ ...	২,৯৮,৪৩৫ ...	২,১৯,৮২
১৮৯৯-১৯০০ ...	২,৪৬,৪৩১ ...	১,৪৮,৪৭
১৯০৪-০৫ ...	৩,২৯,৬৪৭ ...	১,৬৬,১০
১৯০৯-১০ ...	২,৩২,৬৪৫ ...	১,০৯,৬৩
১৯১৪-১৫ ...	২,৯০,৩৯৪ ...	১,৬৫,৩৮
১৯১৯-২০ ...	২,৭২,৫৬১ ...	১,৭১,৩৯
১৯২৪-২৫ ...	২,৪২,১৭০ ...	২,০৮,৯৫
১৯২৭-২৮ ...	২,৭৬,৬৬৮ ...	২,৩১,৯২
১৯২৯-৩০ ...	১,৮৪,২২০ ...	১,৪৫,৪০
১৯৩৪-৩৫ ...	১,৪০,৯৬৩ ...	৭২,৭১
১৯৩৫-৩৬ ...	২,১৫,৯৫১ ...	১,০২,২০
১৯৩৬-৩৭ ..	২,১০,৬২৯ ...	৮৩,৬৭
১৯৩৭-৩৮ ...	১,৩৫,১৪২ ...	৫৪,৫৯
১৯৩৮-৩৯ ...	১,৮৪,৮০০ ...	৭৫,১১

(গ)
রপ্তানী—কফি—ক্রেতার নাম ও অংশ
(১৯৩৮-৩৯)

মোট—৭৫,১০,৮৫৭

	হন্দর	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
ব্রিটেন ...	৭৪,৫১০	৩৫,২৫	৪৬'৮
ফ্রান্স ...	৩৭,৯২৬	১১,৯৮	১৫'৯

(অনুস্থত)

		হন্দর	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
নরওয়ে	...	২২,৫০১	৮,২৫	১০·৯
বেলজিয়ম	...	৯,৯২৪	৩,৭৬	৪·৯
ইরাক	...	৭,২৩০	২,৯৭	৩·৯
অষ্ট্রেলিযা	...	৫,৮৫৯	২,১২	২·৮
নেদারল্যাণ্ড	...	৫,০৬৬	১,৯৬	২·৬

জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি।

(ঘ)

পৃথিবীতে দেশ হিসাবে কফির আবাদ ও মোট ফলনের পরিমাণ

	হাজার একর		হাজার হন্দর	
		...	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮*
ব্রেজিল	৮৫,৫৫	...	৩,১০,৪২	৩,০৪,২৯
কলম্বিয়া	৮,৮৫ (১)	...	৫২,৫৬	৫০,৭৯
সালভাডর	২,৫৯	...	১৪,৮২	৯,০৫
ভেনেজুয়েলা	২,৪৭	...	১৪,০৯	১৩,১৯
ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জ	২,৭৮	...	৯,৯২	১২,০৪
গুযেটামালা	২,৬৭ (২)	...	১৩,১৯	১১,০২
মেক্সিকো	২,৪৩	...	৯,২১	৭,২৮
কিউবা	১,৫৩	...	৬,১৬	৬,১০
মাডাগাস্কর	২,৩২	..	৫,৫১	৫,৯০

* ১৯৩৭-৩৮ সালের ফসলের আনুমানিক পরিমাণ।

(১) ১৯৩২-৩৩ সালের হিসাব, (২) ১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব,

(অনুসৃত)

	হাজার একর	হাজার হন্দর	
		১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
কষ্টারিকা	১,২০	৫,২২	৪,৩৩
হাইতী	৩,৫০	৪,৮৮	৬,৩০
কেনায়া	১,০৪ (১)	৩,২৩	৩,২০
ভারতবর্ষ	১,৯০	৩,০৪	৩,১৫
টাঙ্গানাইকা	১,১১	২,৭২	—

ইহা ছাড়া আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো, উগাণ্ডা, আঙ্গোলা, কেনায়া, মধ্য আমেরিকার ডোমিনিকান গণতন্ত্র, নাইকারগুয়া, দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর প্রভৃতি দেশে প্রচুর কফির আবাদ আছে।

তামাক (Tobacco)

ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহার খুব বেশীদিন প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই লোকের নেশা ধরিয়াছে, অর্থাৎ ভারতে যত তামাক চাষ হয়, তাহার অধিকাংশই ভারতবাসী ব্যবহার করিয়া ফেলে। তাহার উপর "বাজার ধরিয়াছে", অর্থাৎ ইহার প্রচুর রপ্তানী আছে এবং চেষ্টা করিলে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ব্যবহারের ইতিহাস

কতকাল হইতে আমেরিকার জঙ্গলে তামাক জন্মিত এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তাহা ব্যবহার করিত আজ আর তাহা বলা সম্ভব নহে; তবে অধুনা সভ্য জগতের পরিচয় ১৪৯২ সালে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে। কলম্বসের সঙ্গীরা আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই তামাকের ব্যবহার দেখিতে পান এবং তথা হইতে ইউরোপে তামাক আনীত হয়।

(১) ১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব।

আন্দাজ ১৫১৮ সালে Oviedo স্পেনে তামাকের পাতা এবং পরে ১৫৩৯ সারে Hernandaz ইউরোপে তামাকের বীজ লইয়া আসেন। Jean Nicot পর্ত্তুগালে ফরাসী রাজদূত ছিলেন এবং ১৫৬০ সাল নাগাদ তিনি সেখানে তামাকের চাষ দেখিতে পান এবং স্বদেশে বীজ পাঠাইয়া দেন। তাহার নাম হইতে তামাকের নাম "নিকোটিন" হইয়াছে।

হারিয়ট (Thomas Hariot) ইংলণ্ডে প্রথম তামাক আমদানী করেন; কিন্তু ড্রেক (Sir Francis Drake) ফিরিয়া আসিবার পর, ড্রেক, র‍্যালে (Sir Walter Raleigh) প্রভৃতি কর্ত্তৃক তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে নূতন কর, পাদ্রীদের আপত্তি এবং নানারূপ আন্দোলন দ্বারা তামাকের প্রসার রোধ করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলই হয় না; ক্রমে ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে তামাকের ব্যবহার অতি দ্রুতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ভারতে আমদানী

পর্ত্তুগীজদের কৃপায় ভারতে এই বিষের প্রথম আমদানী হইয়াছিল। আন্দাজ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তামাকের চাষ সুরু হয়; ক্রমে তাহা ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু তামাক সম্বন্ধে লোকের ধারণা ভাল না হওয়ায় উত্তর ভারত পর্য্যন্ত তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হইতে প্রায় এক শত বৎসর লাগিয়া যায়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে তামাক চাষ আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য স্থানেও চাষের নানারূপ পরীক্ষা চলিতে থাকে। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, ভারতবর্ষে তামাক চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া সম্ভব।

বলা বাহুল্য, এ দেশেও তামাকের বিপক্ষতা করিবার লোকের অভাব ছিল না। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া তামাকের ব্যবহার

প্রসারলাভ করে। আকবর বাদসাহের জন্য যখন "ছিলিম" প্রস্তুত হইয়া আসে তখন তাঁহার বৈদ্য বন্ধুরা উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। পরে জাহাঙ্গীর ১৬১৭ সালে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও নানারূপে তামাক ব্যবহার যে ভাবে ছাইয়া পড়িয়াছে, তাহা কতকটা বিস্ময়ের বিষয়।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত ৪১ রকম তামাক গাছের সন্ধান মিলিয়াছে, অবশ্য চাষের জন্য সকলগুলি কাজে লাগে না। ইহার মধ্যে অধিকাংশই আমেরিকায় জন্মিয়াছে। ফিলিপাইন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন জাতির তামাক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যোপযোগী তামাকের কথা ধরিতে গেলে তিন চার রকমের বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তামাকের আবার বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় চুরুট, চুরুটের নানা অংশ, সিগারেটের মশলা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জল, হাওয়া, মাটী প্রভৃতি নানা কারণের জন্য তামাকের নানা গুণের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

পরিচয়

তামাকে এক প্রকার বায়ী তৈল এবং নিকোটিন নামক উত্তেজক পদার্থ থাকে। এই দুইটি কারণে তামাকের আদর। সাধারণতঃ সকল পাতাতেই এই দুই বস্তু অল্পাধিক পরিমাণে থাকে এবং তাহা হইতেই তামাকের নিজস্ব গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ছাড়া বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা এই গুণ এবং গন্ধ হ্রাস বৃদ্ধি এবং উগ্র মৃদু করিতে পারা যায় এবং যাঁহারা এই কার্য্যে যত দক্ষ তাহাদের তামাক অপেক্ষাকৃত তত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ শ্রাবণ ভাদ্র এমন কি আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তামাকের "বীজতলা" প্রস্তুত করিয়া প্রায় এক মাসকাল গাছগুলিকে

বড় হইতে দেওয়া হয়। তামাকের বীজ আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ইহার আবরণ অত্যন্ত কঠিন। অঙ্কুরোদ্গমের সুবিধার জন্য দানাগুলি কোনও খস্‌খসে স্থানে কিম্বা বালি বা গুঁড়া পাথরের সহিত ঘষিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। গাছগুলি স্থানান্তরে রোপণ করিবার উপযুক্ত হইলে, অর্থাৎ তিন হইতে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হইলে, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আন্দাজ দুই হাত অন্তর পুতিয়া দেয়। গাছের মূলে মাটী দিয়া আইল করিয়া জল দিবার সুযোগ করিয়া দিতে হয়। গাছগুলি বড় হইয়া "ফুল আসিবার" উপযুক্ত হইলে, উপর হইতে কুঁড়ি এবং নিম্নভাগের পুরাতন পাতাগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। যাহাতে ডাল পাতা প্রভৃতি ভাঙ্গার জন্য গাছের রস অতিরিক্ত মাত্রায় বাহির হইয়া না যায়, সে কারণে চাষীরা ভাঙ্গা স্থান-গুলিকে মিহি করিয়া চূর্ণ মাটী দ্বারা ঢাকিয়া দেয়। যখন পাতাগুলি স্বল্প হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে এবং উহা স্পর্শে সামান্য আঠালভাব পাওয়া যায়, তখন উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিয়া কেহ কেহ সমস্ত গাছটি কাটিয়া ফেলে, কেহ কেহ বা পাতাগুলি বৃক্ষকাণ্ড হইতে তুলিয়া লয়।

চাষ

তামাক পাতা তুলিয়া লইলেই সকলপ্রকার ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না; নানা প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার সুগন্ধ ও ধূম্রের স্বাদ লাভ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে curing বলে এবং তামাক ব্যবসায়ীর পক্ষে এই বিষয় সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

তামাক প্রস্তুত প্রণালী

তামাক পাতা বা গাছ উঠাইয়া আনিয়া একটি প্রশস্ত ঘরে বাঁশ প্রভৃতি কোনও কাষ্ঠের আলনার গাত্রে ঝুলাইয়া শুষ্ক হইতে দেওয়া হয়। প্রথম দুই তিন দিন আল্‌নার ন্যায় ব্যবহৃত কাষ্ঠগুলি আন্দাজ তিন ফুট অন্তর রাখিয়া দেয় এবং যতদিন না মধ্যের ডাঁটা এবং শিরগুলি শুষ্ক হইয়া

উঠে তত দিন ঐভাবে রাখে। স্থানীয় বায়ুর তাপের উপর এই কাল ১৫ দিন হইতে আরও দীর্ঘ হয়। শীঘ্র শুকাইয়া না গেলে পাতার রঙ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে রৌদ্রে শুকাইবার ব্যবস্থা করে। পরে এই পাতাগুলি স্থানে স্থানে স্তুপাকারে জমাইয়া, গাঁজাইতে বা মাতাইতে (fermentation) দেওয়া হয়। এই সময় পাতাগুলি হাতপাখার মত পুরাপুরিভাবে চেপ্টা করিয়া সাজাইতে হয়, যাহাতে খুলিলে পাতাগুলি সমানভাবেই পাওয়া যায়।

পাতাগুলির মধ্যে রস গাঁজিয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন; স্বাভাবিক তামাক পাতার গন্ধ অত্যন্ত কটু; সুতরাং এই প্রক্রিয়া দ্বারা তামাক 'প্রস্তুত' করিতে না পারিলে, কোনই কাজে লাগার সম্ভাবনা নাই। অনেকে মনে করেন, তামাকপাতা স্তুপাকারে থাকার ফলে যে অত্যধিক তাপ সৃষ্টি হয়, তাহাতে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া পাতার মধ্যে যে নূতন রস সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাই তামাকের নূতন গন্ধের কারণ। অনেকে বলেন বিশেষ জীবাণুর দ্বারা এই ক্রিয়া সংঘটিত হয়, এবং বিভিন্ন তামাকপাতার প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র জীবাণু আছে।

কোনও কোনও স্থানে অগ্নির তাপ দ্বারা পাতা শুষ্ক করিবার পদ্ধতি আছে। কয়েকদিন ঘরে থাকিবার পর পাতাগুলি হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে ঐ ঘরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার উপরে ধীরে ধীরে পাতাগুলি শুকাইয়া লইবার চেষ্টা করে। এইভাবে শুষ্ক করিতে কয়দিন কাটিয়া যায়। কেহ কেহ আরও কয়দিন বাদে পুনরায় আগুনের তাপে শুষ্ক করিয়া লয়। তাহার পর ইহাকে গুণানুযায়ী নানা ভাগে বিভক্ত করে। এই অবস্থায় গাদা বা ঢিপিগুলি বাতাস চলাচলের সুযোগপূর্ণ এবং তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ও আর্দ্রতার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী ঘরে আরও কয়দিন থাকিবার পর ব্যবহারের উপযোগী গুণ ও গন্ধ আসিয়া উপস্থিত

হয়। কোনও কোনও তামাকপাতা দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত হইবার পর, বিশেষ সমাদরের সহিত বিক্রীত ও ক্রীত হইয়া থাকে।

ব্যবহারের উপযোগী তামাক প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী দেওয়া হইল, প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা ভেদে তাহার নানা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এ বিষয়ে পারদর্শী, তাঁহাদের পণ্য-বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ তত বেশী।

ভারতের চাষ

তামাক ভারতবর্ষের কৃষিজাত এক প্রয়োজনীয় পণ্য; উহার রপ্তানীর পরিমাণ তিন কোটী টাকায় পৌছিয়াছে। জগতে যত দেশে তামাক জন্মায়, তাহাদিগের মধ্যে, কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারতের স্থান প্রথম ছিল। এখন আমেরিকা প্রথম; ভারতের স্থান তৃতীয়।

করদ রাজ্য লইয়া ভারতবর্ষে ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে; ফলনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ১১ হাজার টন।

করদ রাজ্যের জমির পরিমাণ আন্দাজ দেড় লক্ষ একর, মোট জমির শতকরা ১০˙৩ আর ফলনের বেলায় ২৯ হাজার টন বা শতকরা ৫˙৬ ভাগ। জমির তুলনায় ব্রিটিশ ভারতে ফলনের পরিমাণ খুব বেশী, অর্থাৎ শতকরা ৮৯˙১ ভাগ জমিতে (মোট পরিমাণ ১১ লক্ষ ২৭ হাজার একর), ৯৪˙৪% (মোট পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮২ হাজার টন) তামাক পাতা পাওয়া যায়; পরিশিষ্ট (ক)।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তামাক চাষ হয়; অর্থাৎ মোট জমির সিকির সামান্য কম এবং মোট ফলনের সিকির বেশী। ফলনের পরিমাণ হিসাবে, বাঙ্গলার পরে মদ্র, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, পঞ্চনদ প্রভৃতির স্থান। করদরাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ প্রধান, বরদা এবং মহীশূরের স্থান তাহার পরে।

বাঙ্গলাদেশের মধ্যে জেলা হিসাবে রঙ্গপুরের স্থান সর্ব্বপ্রধান ; এমন কি সমস্ত তামাক চাষের জমির তিন ভাগের দুই ভাগ একা রঙ্গপুরে আছে ; অর্থাৎ ৩ লক্ষ ১৩ হাজার একরের মধ্যে রঙ্গপুরের অংশ দুই লক্ষ একরের বেশী। পরে জলপাইগুড়ি (মাত্র ২১ হাজার একর), ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, রাজসাহী, ত্রিপুরা প্রভৃতির স্থান।

মদ্রের ২ লক্ষ ১৪ হাজার একরের মধ্যে গণ্টুর জেলাতেই আন্দাজ অর্দ্ধেক জমি পড়ে, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর। পরেই ভিজাগপট্টম্ (মাত্র ৩০ হাজার একর) ; তাহার পর কইম্বাটুর, পূর্ব্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী, ত্রিচিনপল্লী, সালেম, আনন্দপুর, কৃষ্ণা, কর্ণুল প্রভৃতি জেলার স্থান।

মদ্র ছাড়িয়া দিলে জমির পরিমাণ হিসাবে বিহারের এবং ফলনের অনুপাত হিসাবে যুক্তপ্রদেশের স্থান পড়ে। বিহারে তিনটি জিলা, যথা পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর ও দ্বারবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

যুক্তপ্রদেশে ফরক্কাবাদ, এটা, মণিপুর, বুদাওন, মীরাট, বুলন্দসর প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য চাষ হয়।

বোম্বাই প্রদেশে কয়রা, বেলগাঁ, সেতারা, আহম্মদাবাদ, সোলাপুর, বিজাপুর এবং পঞ্চনদে সিয়ালকোট, জলন্দর, লায়ালপুর, গুজরাট, ঝঙ্গ জেলায় কম বেশ চাষ হইয়া থাকে। এই সকল এবং অন্যান্য সকল প্রদেশের আরও প্রায় প্রতি জেলায় কিছু কিছু চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

পৃথিবীর তামাক চাষ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকায় চাষ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; তাহার পরই চীনের স্থান। সারা পৃথিবীতে আন্দাজ ২৭ লক্ষ টন তামাক জন্মে ; তন্মধ্যে আমেরিকায় প্রায় সাত লক্ষ টন। তাহার পর চীন, এবং তাহার পর ভারতবর্ষের স্থান। রুশ, ব্রেজিল, গ্রীস, তুরস্ক, নেদারল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি

দেশেও তামাক চাষ হয়, অবশ্য ইহাদের মধ্যে রুশের স্থান প্রধান; পরিশিষ্ট (খ)।

আমেরিকার মধ্যে মেরীল্যাণ্ড, ভার্জিনিয়া, কেন্টকী, উত্তর ক্যারোলিনা, উইসকনসিন, ওহিও প্রভৃতি স্থানে প্রচুর চাষ হয়; কিউবার হাভানা ও সাণ্টাক্লারা, ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, জাভা এবং ফিলিপাইনের মধ্যে ইসাবেলা ও কাগেয়ান প্রদেশ প্রসিদ্ধ।

তামাকের ব্যবহার যেরূপ প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার বাণিজ্যের বিষয় সবিশেষ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। যতদূর সন্ধান

পুরাতন বাণিজ্য

পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে লোহিত সাগরের বন্দরে তামাক চালান যাইত। পণ্যের হিসাবে—১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ মসুলীপট্টমে খুব ভাল তামাক পাওয়া যাইত এবং তথাকার নস্য ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত। ১৮০৯-১১ সালে লিখিত পুস্তকে প্রকাশ (বুকানন হ্যামিণ্টনের "দিনাজপুরের ইতিহাস") ১৮৩০ বা ১৮৩৫ সালে তামাক ভারতের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং তাহার বাণিজ্য বিশেষভাবেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

১৮৪৮-৪৯ সালে আন্দাজ ছয় লক্ষ টাকার তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়। ১৮৭৪-৭৫ সালে 'কাঁচা তামাক, সিগার

রপ্তানী

এবং নানাবিধ" এই তিন ভাগে তামাক চালান যাইতে থাকে এবং মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকায় পৌছে। তাহার পরই হঠাৎ রপ্তানী ভীষণ হ্রাস পায়। দশ বৎসরে (১৮৮৪-৮৫) কমিয়া মাত্র ১৫ লক্ষ টাকায় আসে। পরের দশ বৎসরে (১৮৯৪-৯৫) বিশেষ তারতম্য হয় নাই। ১৯০১-০২ সালে সিগারের রপ্তানী হঠাৎ খুব বৃদ্ধি পায়। ১৯০০-০১ সালে মাত্র সাড়ে আট লক্ষ টাকার ছিল;

উহা পর বৎসর সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকায় পৌছে এবং মোট রপ্তানী প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। মহাযুদ্ধের পর রপ্তানী প্রায় এক কোটী টাকায় পৌছে (১৯১৮-১৯ সালে ৯৬ লক্ষ ৩৬ হাজার; ১৯১৯-২০ সালে ৯২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা)। ১৯২৩-২৪ সালে এক কোটী টাকা ছাড়াইয়া যায় এবং ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। তাহার পর কয় বৎসর, ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৬-৩৭ পর্য্যন্ত, বরাবরই রপ্তানীর মূল্য কম থাকে এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে রপ্তানীর অঙ্কে ব্রহ্মের অংশ পড়ায় এবং ব্রিটেন কাঁচা তামাক অধিক লওয়ায় রপ্তানী একেবারে দুই কোটী টাকায় দাঁড়ায়। পরিমাণ ও মূল্য হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সালই সর্ব্বপ্রধান; পরিশিষ্ট (গ, গ-১, গ-২)।

আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া ও ভারতের তামাক-বাণিজ্যের অন্য বিপদ রহিয়াছে। ক্রেতা যে রকম গুণের পাতা চায় এবং তাহার জন্য পূর্ণ দাম দিতে প্রস্তুত, তাহা সে অনেক সময় পায় না। সুতরাং মূল্য নির্দ্ধারণের সময় ক্রেতা কম দাম বলে এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই দরেই বিক্রয় করিতে হয়। পাতার গুণানুসারে ভাগ করা এবং বিদেশের বাজারে কোন্ জাতীয় পাতা চড়া দরে বিক্রয় হইতে পারে চাষীকে সেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য চেষ্টাও হইতেছে, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নহে।

ভারতীয় তামাকের গুণহীনতা

চাষীর আরও অন্য বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। যাহাতে ভাল পাতার চাষ হয়, তাহার জন্য বীজ সংগ্রহ করা এবং আবহাওয়া, জল, মৃত্তিকাব গুণাগুণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা দরকার। গতানুগতিকের ধারা অনুযায়ী চাষ হওয়ায় বহুদিন হইতে তামাক চাষে কোনই উন্নতি হয় নাই।

উন্নতির সন্ধান

স্থানবিশেষে নানাপ্রকার তামাকের চাষ হইতেছে। উত্তর বঙ্গে এবং উত্তর বিহারে হুঁকার তামাক বা ছিলিম তামাক এবং অন্যান্য প্রকারের তামাক পাতা হয়; গুর্জ্জরের চারতোয়ার এবং বোম্বাইয়ের নিপানী প্রদেশে বিড়ির উপযোগী তামাক হয় এবং মন্দ্রে গণ্টুর প্রদেশে "golden leaf" নামে সিগারেটের উপযুক্ত ভাল তামাক জন্মে। বাঙ্গলার বাজারে "রঙ্গপুর" নামে পরিচিত তামাক সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহাকে আবার "পুলা" এবং 'বিষপাত' রূপে ভাগ করা হয়; তন্মধ্যে 'পুলা'ই শ্রেষ্ঠ।

ভারতবর্ষে যে তামাক জন্মে, তাহার অধিকাংশই দেশের মধ্যে খরচ হইয়া যায়। এখানে হুঁকার জন্য যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশই অতি সাধারণ পাতা হইতে প্রাপ্ত।

পূর্ব্বাপেক্ষা রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিবার বিশেষ কিছু নাই। দেশ হইতে কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইয়া তাহার পর দশ গুণ অথবা বিশ গুণ মূল্যে তাহাই ক্রয় করার অভ্যাস যে আমাদের আছে, তামাকের বাণিজ্য তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৮৭৬-৭৭ সালে সাড়ে নয় লক্ষ টাকার সিগার, সিগারেট আমদানীর পরিচয় পাইয়া থাকি। পরের দশ বৎসরের মধ্যে (১৮৮৬-৮৭) সালে তাহা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়া যায়। ১৮৯৬-৯৭ সালে সামান্য কম অর্থাৎ ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা হইলেও ১৯০৭-০৮ সালে তাহা ৮৪ লক্ষ টাকা হইয়া যায়। বিলাতী তামাকের নেশা তখন ভারতবাসীকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, প্রতি বৎসরই আমদানী বাড়িয়া চলিল। ১৯১৬-১৭ সালে ১ কোটী ২৫ লক্ষ এবং ১৯১৮-১৯ সালে ২ কোটী ১৫ লক্ষ টাকায় বিলাতী তামাকের আমদানী হয়। ১৯২০-২১ সালে হঠাৎ ৩ কোটী হয়। তখন হইতে

আমদানী

১৯২৫-২৬ সাল পর্য্যন্ত কম বেশ দুই কোটী টাকায় নিবদ্ধ থাকিয়া ১৯২৬-২৭ সালে আড়াই কোটী এবং পর বৎসর আবার তিন কোটী টাকায় আসে। পরের দুই বৎসর (১৯২৭-২৮ ও ২৮-২৯) এই অবস্থায় চলিতে থাকে; ১৯৩০-৩১ সালে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়; তাহাতে সুফল দেখা যায়, অর্থাৎ আমদানী দেড় কোটী টাকায় নামে, তাহার পর কম হইতে সুরু করিয়া মোট ৬৬ লক্ষ টাকায় আসিয়াছে। যদি কেহ মনে করেন, ইহাতে ভারতবাসী লাভবান্ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত, কারণ ইত্যবসরে বিদেশী কোম্পানী দেশী পোষাক পরিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সমস্ত 'লাভের গুড়' বিলাতী 'পিঁপড়ায় খাইতেছে" ; পরিশিষ্ট (জ)।

এই সঙ্গে আমাদের গ্লানির আর এক অধ্যায় লোকের সমক্ষে ধরিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। ১৯০০-০১ সাল নাগাদ বিদেশী আমদানী আন্দাজ চল্লিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে সিগারেটের অংশ ছিল ১৭ লক্ষ টাকা। ঐ সালে সিগারেটের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা আরম্ভ হয়, তৎপূর্ব্বে সাধারণ তামাক আমদানীর সহিত উহা দেখান হইত। পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে, অর্থাৎ ১৯০৬-০৭ সালে সিগারেটের আমদানী ৪৬ লক্ষ টাকায় আসে। লোকের হঠাৎ এই মতিগতির পরিবর্ত্তন অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোধ হয়। এই দরিদ্র দেশের লোকের মধ্যে এত বড় বিরাট বাণিজ্য যে হওয়া সম্ভব, তাহা প্রকৃত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত না হইলে কেহ বিশ্বাস করিত না। হুঁকা বা গড়গড়ায় তামাকু সেবন অসম্ভব রকম পিছাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল এবং সিগারেট সে স্থান দখল করিতে লাগিল। যাহাতে লোকের ভাল রকম 'নেশা' ধরে তাহার জন্য প্রতি পয়সায় আট বা দশ সিগারেটের প্যাকেট আমদানী হয় এবং লোকে নির্ব্বিচারে

সিগারেট

তাহা সেবন করিতে আরম্ভ করে। বলা হইয়াছে, ১৯০৬-০৭ সালে ৪৬ লক্ষ টাকার সিগারেট আমদানী করা হয়। ইহা ক্রমে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া শীঘ্রই (১৯১৬-১৭) এক কোটী টাকা হয়; ১৯২৬-২৭ সালে একেবারে দুই কোটী (১ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা) এবং পর বৎসর আড়াই কোটী টাকার সিগারেট আমদানী হইল। ঐ সালে মোট তাম্রকূটজাত দ্রব্যাদি আসে দুই কোটী ৯১ লক্ষ টাকার; অর্থাৎ সিগারেটই তখন তামাকের প্রায় একমাত্র আমদানী। এখানেও জাতীয়তার আন্দোলন সিগারেট আমদানীকে বিশেষ ধাক্কা দিতে সমর্থ হয় এবং ইহা দ্রুতগতিতে কমিতে থাকে, এমন কি ১৯৩৩-৩৪ সালে মাত্র ১৯ লক্ষ টাকায় নামে; পরিশিষ্ট (ণ, ২২৮ পৃষ্ঠা)।

ভারতবাসীর এই খেলা শেষ হইয়াছে, আবার আবালবৃদ্ধের মধ্যে সিগারেটের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ১৯ লক্ষ হইতে আমদানী ৪০ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। এ গতির মুখ ফিরাইতে না পারিলে, আবার দুই কোটী টাকার সিগারেট আমদানী হওয়া অসম্ভব নহে। ইতোমধ্যে যে সকল বিদেশী কোম্পানী এদেশে সিগারেট প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদেরও কাটতি সমানভাবেই চলিতে থাকিবে; পরিশিষ্ট (ণ, ২২৮ পৃষ্ঠা)।

রপ্তানী কাঁচা তামাক ক্রেতা ও বিক্রেতা

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার তামাক চালান যায় পৌনে তিন কোটি টাকার; তন্মধ্যে কাঁচা তামাকের পরিমাণ দুই কোটি এক লক্ষ টাকার, অর্থাৎ মোট রপ্তানীর তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ (৭২·৮%)।

যদিও বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাষ হইয়া থাকে, তথাপি মদ্র সর্ব্বপ্রধান বিক্রেতা, অর্থাৎ দুই কোটির মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। পরে অবশ্য বাঙ্গলার স্থান, কিন্তু মদ্রের তুলনায় কিছুই নহে,

অর্থাৎ মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা। বোম্বাই সামান্য রপ্তানী করে; পরিশিষ্ট (ঘ, ২২৪ পৃষ্ঠা)।

ক্রেতার মধ্যে ইংরাজই সর্ব্বপ্রধান অর্থাৎ সে একাই এক কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার অর্থাৎ মোট কাঁচা তামাক রপ্তানীর ৭৭·৫% ক্রয় করে। টাকার পরিমাণ অনুসারে পরে পরে ক্রেতার নাম,—ব্রহ্ম, এডেন, মালয়, জাপান, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ; পরিশিষ্ট (ঙ, ২২৪ পৃষ্ঠা)।

সংস্কৃত তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যাদি মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকা আনে, তাহার মধ্যে সিগারেটই প্রধান;—পরিমাণ ৬১ লক্ষ টাকা। সিগার বা চুরুট রপ্তানী নাই বলিলেও চলে, অর্থাৎ মাত্র ৬৮ হাজার টাকার। এস্থলে প্রধান বিক্রেতা বাঙ্গলা, ৪৪ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় করে; মদ্রের স্থান দ্বিতীয়, ৩০ লক্ষ টাকা। বোম্বাই ও সিন্ধু হইতেও কিছু মাল যায়; উড়িষ্যার অংশ মাত্র ৫০ টাকা; পরিশিষ্ট (চ, ২২৫ পৃষ্ঠা)।

রপ্তানী—সংস্কৃত তামাক

ক্রেতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মই প্রধান, অর্থাৎ সমস্ত একা লয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন ব্রহ্ম বিচ্ছেদ হয় নাই, তখন মাত্র ৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইত। সুতরাং ভারতের যে বাজার ছিল, তাহাই আছে। ৭৫ লক্ষ টাকার মালের মধ্যে ব্রহ্ম লয় ৭০ লক্ষ; সিংহল, ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্, ইংলণ্ড প্রভৃতি সামান্য লইয়া থাকে; পরিশিষ্ট (ছ, ২২৫ পৃঃ)।

মোট তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যাদি আসে ১ কোটী টাকার উপর, তাহার মধ্যে কাঁচা মালের অংশ ৫৮ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে অধিকাংশই বিশেষ গুণসম্পন্ন পাতা, ভারতীয় সিগারের উপরের ছাল ঢাকিবার জন্য আনীত হয়; পরিশিষ্ট (ঝ ২২৬ পৃষ্ঠা)। আমেরিকা ইহার প্রধান বিক্রেতা, শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী তথা হইতে আসে। ব্রহ্ম,

আমাদনী—কাঁচা তামাক

নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে সামান্য পরিমাণ আমদানী করা হয়; পরিশিষ্ট (ঞ ২২৬ পৃষ্ঠা)।

ক্রেতার মধ্যে বাঙ্গলার নামই প্রধান; তিন ভাগের দুই ভাগ তামাক বাঙ্গলায় আসে। পরে মদ্রের স্থান, শতকরা ৩২ ভাগ সেখানে যায়। এ বিষয়ে বোম্বাই খুবই ভাল, কিছুই লয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না; পরিশিষ্ট (ট ২২৭ পৃষ্ঠা)।

সিগার, সিগারেট প্রভৃতি "তৈয়ারী" তামাক ৪৭ লক্ষ টাকার আসে; পরিশিষ্ট (ঠ ২২৭ পৃষ্ঠা)। তন্মধ্যে সিগার বিদেশ হইতে খুব কম বেশ দুই লক্ষ টাকার মতন আসে, এবং ব্রহ্মই তাহার বিক্রেতা; শতকরা ৬৫ টাকা তাহার অংশ। ফিলিপাইন, আমেরিকা ও সিগার সরবরাহ করে। ক্রেতার মধ্যে পুনরায় বাঙ্গলা দেশই প্রধান, অর্দ্ধেকের উপর (৫৩.৭%) তাহার প্রয়োজন; বোম্বাই লয় তিন ভাগের এক ভাগ; বাকী যৎসামান্য সিন্ধু লয়; পরিশিষ্ট (ড ও ঢ ২২৭-৮ পৃষ্ঠা)।

আমদানী—সিগার, সিগারেট

সিগারেট আমদানী হয় ৪০ লক্ষ টাকার; পরিশিষ্ট (ণ ২২৮ পৃষ্ঠা)। এখানে বিক্রেতা একমাত্র ইংরাজ, সুতরাং আমরা যাহাই কিনি সমস্ত ইংরাজ পায়; এস্থলে "বৃটিশ সিংহের" অংশ শতকরা ৯৫। অবশিষ্ট আমেরিকা (৩.১%) এবং ব্রহ্ম লয়। তালিকায় স্থান পাইবার মত ব্রহ্মের রপ্তানী আছে, আর কিছু নয়; পরিশিষ্ট (ত ২২৮ পৃষ্ঠা)।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সিগারেট বেশী 'খায়' কে? বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে বাঙ্গালী নিশ্চয়ই প্রথম স্থান পাইবে। সমস্ত মালের প্রায় অর্দ্ধেক একা বাঙ্গলা আমদানী করে (৪৭%)। পরে পরে বোম্বাই, সিন্ধু এবং মদ্র নামমাত্র সিগারেট আমদানী করে (৪%); পরিশিষ্ট (থ ২২৯ পৃষ্ঠা)।

নানা আকারে আজ তামাক জনসমাজে ব্যবহৃত হইতেছে। উত্তেজক

পদার্থ হিসাবে ইহার প্রয়োজন ; তাহা ভিন্ন ইহার ব্যবহারের অপরাপর তালিকা খুব বেশী নহে। সিগারেটরূপেই তাম্রকূট-জগতে ইহার বেশী টাকার কারবার হইতেছে, সুতরাং তাহার নাম প্রথমেই উল্লেখ করা হইল। সিগার, পাইপের মশলা, বিড়ি, গুড়ুক তামাক অর্থাৎ আলবোলা বা হুঁকার উপর কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে সেবনযোগ্য তামাক, নস্য, খৈনী বা শুখা, 'মিসি', জর্দ্দা, দোক্তা বা পানের মশলা এই কয়টি মাদক বা উত্তেজকরূপে তামাকের প্রধান ব্যবহার।

তামাকের ব্যবহার

শুষ্ক দোক্তা পাতা, কাঁচা চুণ সংযোগে হাতের তালুতে টিপিয়া গুঁড়া করিয়া লোকে দাঁতের মাড়ি ও অধরোষ্ঠের মধ্যে রাখে। বহুক্ষণ এইভাবে থাকিলে যখন ইহার উত্তেজক শক্তি আর বুঝিতে পারা যায় না, তখন ইহা বদল করিয়া আবার নূতন খৈনী দেয়।

"মিসি" ব্যবহার পল্লীর বৃদ্ধা এমন কি তরুণীদের মধ্যেও প্রচলিত। নারিকেল পাতার ভস্মের সহিত তামাকের গুঁড়া মিশাইয়া এই মিসি তৈয়ারী করে এবং মুখের মধ্যে রাখিয়া দেয়। ইহা খৈনীর অপর সংস্করণ বলিলেও চলে।

সাধারণ লোকে অন্যগুলির ব্যবহার দেখিতে পায়, তাহার আর বিবরণ দিবার প্রয়োজন দেখি না। জর্দ্দা, দোক্তা বা পানের মশলায় তামাকের সার বা পাতার গুঁড়া নানারূপ গন্ধ সহযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গুড়ুক তামাক—অর্থাৎ দোক্তা পাতা, চিটে গুড়, মাটী এবং মূল্যবান্ তামাকে আতর, মৃগনাভি বা অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যযোগে প্রস্তুত তামাক,—ধূম্রপথ ছাড়া, দন্তমাড়ি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে মাজনের মত কেহ কেহ ব্যবহার করেন। যাঁহারা এইরূপে ব্যবহার করেন, সাধারণতঃ তাঁহারা

মুখের মধ্যে দন্তমূলে অনেকক্ষণ ইহা রাখিয়া দেন এবং থৈনী বা "শুখা" ব্যবহারের দুঃখ মিটাইয়া লন। অনেকে সিগার বা চুরুটের ভস্ম মাজনরূপে কাজে লাগান।

তামাক পুড়িয়া গেলে যে কঠিন পদার্থ পড়িয়া থাকে, চলিত কথায় তাহাকে "গুল" বলে। লোকে মিহি করিয়া গুঁড়া করে এবং মাজনরূপে ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা "টুথ পাউডার" অপেক্ষা ভাল এবং একটী মহা উপকারী বস্তু।

তামাক মাজনের মত নানারূপে ব্যবহার করিবার বিশেষ হেতু আছে। ইহা বীজাণুনাশক, সুতরাং মুখবিবরে দন্তমাড়িতে বীজাণু ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তামাকের পাতা-ভিজানো জল বা কাথ উদ্ভিদের এবং অন্যান্য স্থানের ক্ষুদ্র কীটাদি নাশ করিবার বা দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হুঁকা বা আলবোলায় ব্যবহৃত জল অনেকে কুলকুচা করিবার জন্য সংগ্রহ করেন। ইহাতে কেবল যে দন্তমাড়ি দৃঢ় হয়, তাহা নহে, মাড়ির বেদনার উপশম করে।

হুঁকার জল, তামাক পাতা ঔষধার্থে আরও অনেক কাজে লাগে। বিশেষতঃ হুঁকার জল—প্রদাহের বা স্ফোটকের প্রলেপের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাত বেদনায় দোক্তা পাতা বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাহা অধিক্ষণ রাখিলে চর্ম্মের উগ্রতা (irritation) সাধন করে।

এই সকল ছাড়া, কষ্ ধরাইবার (tanning) জন্য তামাকের বিশেষ প্রয়োজন। সুবিধার মধ্যে এই যে, ভাল তামাক সমস্তই নেশার জন্য ব্যবহৃত হইবার পর অব্যবহার্য্য তামাক দ্বারা রঞ্জনের কার্য্য চলিতে পারে। এই নিকৃষ্ট তামাক, বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে; আমাদের এখানেও সামান্য পরিমাণ কাজে লাগে। বীজাণুনাশক শক্তি আছে বলিয়া তামাকের খ্যাতি আছে। এদেশে বীজাণুনাশক ঔষধাদি (inseoticide)

প্রায়ই প্রস্তুত হয় না; আমদানী করা হয়। সুতরাং এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তামাক পাতার মধ্যে ডাঁটা, কোনই কাজে লাগে না, সুতরাং সেগুলি কাজে লাগানো যাইতে পারে।

তামাকের ব্যবহার তাহার উত্তেজকশক্তির উপর নির্ভর করে। সাময়িক উত্তেজনার আশায় লোকে এই বিষের শরণাপন্ন হইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছে। নিকোটিন নামক বিষ এই শক্তির কারণ এবং এই বিষ এত উগ্র যে অতি সামান্য পরিমাণ সেবনেও জীবনের হানি ঘটিতে পারে। কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মাদকতা নিবারণের জন্য নানাস্থানে নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এই তাম্রকূটের হাত হইতে অজ্ঞ লোককে রক্ষা করিবার কোনই পন্থা অবলম্বিত হয় না। ধীরে ধীরে ক্ষতি করে বলিয়া লোকে ইহাতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ মনে করা অন্যায় যে ইহাতে দেহের কোনই ক্ষতি হয় না। ইহাতে লোকের মানসিক শক্তি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, মাঝে মাঝে এই "কূট" সেবন না করিলে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন ব্যস্ত হইয়া লোকে আবার ইহার শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। আফিম, মদ প্রভৃতি সেবনে সাধারণের আপত্তি আছে, কিন্তু তামাক সেবনে নাই; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

তামাকের ক্রিয়া

অর্থ নষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে তামাক, সিগারেটের নাম করা যাইতে পারে। যাঁহারা সন্তানের দুগ্ধ যোগাইতে পারেন না, নিজেদের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারাও দিনের মধ্যে কয়েক পয়সা বা আনার সিগারেট বিড়ি দগ্ধ করিয়া থাকেন। এই জঞ্জালের কৃপায় কত পোষাক পুড়িয়াছে, নানাদেশে কত বড় বড় অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

নস্য যাঁহারা লন, মিসি যাঁহারা ব্যবহার করেন, খৈনী যাঁহারা মুখে

রাখেন, তাঁহাদের নিজেদের অস্বস্তি ত আছেই, উপরন্তু অনেকে আছেন যাহারা নিজেদের দেহ সম্বন্ধে যত্ন না লইয়া অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠেন এবং চারিদিকে থুথু, কফ ফেলিয়া অপরিষ্কার করেন।

সিগারেটসেবী মনে করেন সিগারেটের ধোঁয়া, তাঁহাদের ন্যায় সকলেরই নিকট আরামপ্রদ। লোকবহুল স্থানে বা গৃহমধ্যে মহা আরামে যখন সিগারেট বা তামাক দগ্ধ করিতে থাকেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকদের কি অবস্থা হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত শক্তি ইঁহাদের থাকে বলিয়া মনে হয় না। এইভাবে অকাতরে পরের পরিচ্ছদে অগ্নিসংযোগ করিয়া থাকেন; প্রতিবাদ করিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলেই নূতন গোলোযোগের সূত্রপাত হইয়া থকে।

এক পাউণ্ড তামাকে ৩৮০ গ্রেণ নিকোটিন আছে; ইহার এক ফোঁটাতে জীবননাশ ঘটিতে পারে। তাহা ছাড়া পিরিডিন, পিকোলিন, সলফিউরেটেড হাইড্রোজেন, কার্ব্বন ডাযোক্সাইড, কার্ব্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি আছে। সেবনকারীদিগের হাতে, ঠোঁটে যে দাগ হয়, এই সকল বাষ্প তাহার অন্যতম কারণ।

রক্তের চাপ রোগে (blood pressure), হৃদযন্ত্রের রোগে (cardiac diseases), বহুমূত্রে (diabetes), রক্তস্রাবপ্রবণতায় (Hæmophilia) তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তামাকের ব্যবহার যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এই সকল বিষয় প্রচার করিতে যাওয়া "অরণ্যে রোদন" মাত্র।

তাম্রকূট সেবী

পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাবাসী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় সিগারেট দগ্ধ করিয়া থাকে; গড়ে জন-প্রতি বৎসরে ১,০৪৫টি ভাগে পড়ে; ওজনে ৭.১৩ পাউণ্ড। গ্রেট ব্রিটেনে ৯৪৬টি মাত্র, ওজন ৩.৭৮ পাউণ্ড। বেলজিয়মে ৭.০৫, নেদারল্যাণ্ডে ৬.৭৭,

জার্ম্মাণীতে ৪'২৭, কানাডায় ৩'৯৫, ফ্রান্সে ২'৭১ ব্রহ্মদেশে ৬'৪ পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষে ২'৯ পাউণ্ড করিয়া বৎসরে জনপ্রতি তামাক লাগে।

পরিশিষ্ট—তামাক

(ক)

জমি, ফলন ও প্রতি প্রদেশের অংশ

মোট জমি	১২,৮৮,০০০	একর	
বৃটিশ ভারত	১১,৪৭,০০০	,,	৮৯'১%
করদ রাজ্য	১,৪১,০০০	,,	১০'৯%
মোট ফলন	৫,১১,০০০	টন	
বৃটিশ ভারত	৪,৮২,০০০	,,	৯৪'৪%
করদ রাজ্য	২৯,০০০	,,	৫'৪%

ব্রিটিশ ভারত	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	৩১৩	২৪'৩	১৩০	২৫'৪
মদ্র	২৯৪	২২'৮	১২৫	২৪'৪
যুক্তপ্রদেশ	৮৮	৬'৯	৬৩	১২'৩
বিহার	১২৫	৯'৭	৫২	১০'১
বোম্বাই	১৭০	১৩'২	৪৪	৮'৬
পঞ্চনদ	৭১	৫'৫	২৯	৫'৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৬	২'০১	১৬	৩'১
উড়িষ্যা	৩০	২'৩	১১	২'১
আসাম	১২	—	৬	১'১

	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১২	—	৪	—
সিন্ধু	৫	—	২	—
করদ রাজ্য				
হায়দরাবাদ	৬৩	৪·৮	১৭	৩·৫
বরদা	৫৩	৪·১	৯	·৬
মহীশূর	২৪	২·০	৩	·৬
খয়েরপুর	১	—	—	—

(খ)

পৃথিবীর চাষ, প্রতি দেশের ফলন ও প্রত্যেকের অংশ

মোট ফলন—২৭,০০,০০০ টন

	হাজার একর (†)	হাজার টন*	শতকরা অংশ
আমেরিকা	১৭,৩২	৬,৫৪	২৪·৯
চীন	১৩,৪৫	৬,২৭	২৩·১
ভারতবর্ষ*	১২,৮	৫,১১	১৫·১
রুশ গণতন্ত্র	৫,০৩	২,৭৩	১০·০
ব্রেজিল	২,৬৯	৯২	৩·৩
জাপান	৮৫	৬৪	২·৩
গ্রীস	২,২৬	৬৩	২·৩
তুরস্ক	১,৮৫	৬২	২·২
নেদারল্যাণ্ড	(?)	৫৩	১·৯
ব্রহ্ম	৯৯	৪৬	১·৭
ফ্রান্স	—	৩৬	১·৩

† Imperial Economic Committee কর্ত্তৃক রক্ষিত হিসাব।

* League of Nations প্রদত্ত অঙ্ক হইতে সামান্য পার্থক্য আছে।

(অনুসৃত)

	হাজার একর	হাজার টন	শতকরা অংশ
কানাডা	৬৫	৩২	১'১
কিউবা	১,২২	৩২	১'১
ফিলিপাইন	১,৮৩	৩১'৮	১'১
বুলগেরিয়া	১,০১	৩১	১'১
কোরিয়া	—	২৬	'৯

ইটালী, পোল্যাণ্ড, যুগশ্লাভিয়া, জার্ম্মাণী ইত্যাদি।

(গ)

রপ্তানী—তামাক—সংস্কৃত ও অসংস্কৃত

		হাজার পাউণ্ড *		হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০	...	...	...	৫,৫৭
১৮৫৪-৫৫	...	...	...	৩,১৩
১৮৫৯-৬০	...	...	...	৫,৫০
১৮৬৪-৬৫	...	...	...	১২,৩০
১৮৬৯-৭০	...	...	...	৯,১৪
১৮৭৪-৭৫	...	...	...	৩৪,৯৪
১৮৭৯-৮০	...	..	...	১৩,১০
১৮৮৪-৮৫	...	...	...	১৫,১৩
১৮৮৯-৯০	...	...	...	১১,১৫
১৮৯৪-৯৫	...	১,০৫,৮৭	...	১৭,১২
১৮৯৯-০০	...	৯,৩০৯	...	১৮,১৮
১৯০০-০১	...	৬৫,৮২	...	১৫৪,৯
১৯০৪-০৫	...	১,৩৩,৮০	...	২০,৮১
১৯০৯-১০	...	১,২২,২৫	...	২৫,৫৮
১৯১৪-১৫	...	১,৮৬,৮২	...	৩৬,৮০

* ১৮৯১-৯২ সালের পূর্ব্বে তামাকের পরিমাণের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইত না

(অনুসৃত)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯১৯-২০ ...	৩,০৮,৭৭ ...	৯২,৬২
১৯২৪-২৫ ...	৪,৪১,৪০ ...	১,২৫,০৪
১৯২৯-৩০ ...	২,৭০,৬৯ ...	১,০৬,৪২
১৯৩০-৩১ ...	২,৯০,৯৩ ...	১,০৩,৬৫
১৯৩৪-৩৫ ...	২,৭৩,৭৭ ...	৮১,৯০
১৯৩৬-৩৭ ...	২,৯৩,০৪ ...	৯২,৫১
১৯৩৭-৩৮ ...	৫,২০,৮২ ...	১,৯৯,৬১
১৯৩৮-৩৯ ...	৬,৫১,৪৩ ...	২,৭৫,৬৩

(গ-১)

রপ্তানী—কাঁচা তামাক

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭ ...	২,৮৫,২৬ ...	৮৭,৭৬
১৯৩৭-৩৮ ...	৪,২৪,৬০ ...	১,১৭,৬২
১৯৩৮-৩৯ ...	৬,০১,৪৩ ...	২,০০,৮৭

(গ-২)

রপ্তানী—সংস্কৃত তামাক (সিগার, সিগারেট প্রভৃতি)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭ ...	৭,৭৯ ...	৪,৭৬
১৯৩৭-৩৮ ...	৯৬,২২ ...	৮১,৯৯
১৯৩৮-৩৯ ...	৫০,০০ ...	৭৪,৭৬

ব্রহ্ম বিচ্ছেদের জন্য ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সালে হঠাৎ সিগারেট রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঘ)

(১৯৩৮-৩৯)

রপ্তানী—অসংস্কৃত (কাঁচা) তামাকের বিক্রেতা ও তাহার অংশ

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
মদ্র	৪,৩৯,২৭	১,৭২,৩৮	৮৫˙৮
বাঙ্গলা	১,২৪,৭৬	১৮,৭৫	৯˙৩
বোম্বাই	৩৭,৩৩	৯,৭৩	৪˙৭
সিন্ধু	৬	৭	˙১

(ঙ)

(১৯৩৮-৩৯)

রপ্তানী—অসংস্কৃত (কাঁচা) তামাকের ক্রেতা ও তাহার অংশ

মোট—২,০০,৮৭,০৯৪

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
ব্রিটেন	৩,৭৫,৫০	১,৫৫,৭১	৭৭˙৫
ব্রহ্ম	১,০৮,৯১	১৩,৯৭	৬˙৯
এডেন প্রভৃতি	৩৪,৩৮	৯,০১	৪˙৫
মালয় (যুক্ত)	৮,৮৬	২,৫২	১˙২
জাপান	১০,৫৫	১,২৯	˙৬
নেদারলণ্ড	৩,৯২	৬৩	—
অপরাপর	৫৯,৩০	১৭,৭৫	৮˙৮

(চ)

রপ্তানী—সংস্কৃত তামাকের বিক্রেতা ও তাহার অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	২৩,৩৯	৪৪,২২	৫৯·১
মদ্র	১৯,৬২	৩০,১২	৪০·২
বোম্বাই	৮৯	৩৮	·৫
সিন্ধু	১০	৪	—

(ছ)

রপ্তানী—সংস্কৃত তামাকের ক্রেতা ও তাহার অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	৩৯,৮৩	৬৯,৩৯	৯২·৮
সিংহল	৩,৮৮	৩,২৪	৪,৩
ইংলণ্ড	৪	৬	·০৮
ষ্ট্রেটস্ সেটল্‌মেণ্টস্ প্রভৃতি			

(জ)

আমদানী—তামাক—সংস্কৃত ও অসংস্কৃত

সাল		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৮৭৬-৭৭	··	···	···	৯,৫৭
১৮৮৬-৮৭	···	···	···	৪৯,৫৩
১৮৯৬-৯৭	···	২১,৭৬	···	২৬,৩৭
১৯০৭-০৮	···	৬৩,৬০	···	৮৪,৩৭
১৯১৫-১৬	···	২৪,৩৭	···	৮০,১৫
১৯১৬-১৭	···	৩৩,৭৮	···	১,২৫,১৩
১৯১৮-১৯	···	৫৩,৮৩	···	২,১৪,৬১

(অনুসৃত)

সাল		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৯২০-২১	...	৭৬,০৯	...	২,৯৫,৯১
১৯২৫-২৬	...	৮৬,৭১	..	২,১৩,৩৫
১৯২৬-২৭	...	১,০২,০৫	...	২,৫৬,১১
১৯২৭-২৮	...	৯৯,২৮০	...	২,৯১,৩২
১৯৩০-৩১	...	৪৯,৩০	...	১,৫১,১৬
১৯৩৩-৩৪	...	৪৮,৯৫	...	৭২,১৫
১৯৩৬-৩৭	...	৪৩,০৭	...	৮০,৮৩
১৯৩৭-৩৮	...	৭৮,৮৯	...	৮৫,৪৮
১৯৩৮-৩৯	...	৭৮,৮৮	...	১,০৪,৫৫

(ঝ)

আমদানী—কাঁচা তামাক

(১৯৩৭-৩৮)

সাল		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	...	৩৮,৮৩	...	৪৪,৭৭
১৯৩৭-৩৮	...	৬৫,৯৮	...	৪৪,৭৯
১৯৩৭-৩৯	...	৬৩,৭১	...	৫৮,০১

(ঞ)

আমদানী—কাঁচা তামাক—বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট—৪৪,৭৮,৫৩০ টাকা

		টাকা		শতকরা অংশ
আমেরিকা	...	৪০,৮৫,৭০২	...	৯১·২
ব্রহ্ম	...	৩,৩৮,৯৫৮	...	৭·৪
নেদারল্যাণ্ড	...	৪১,৪০৭	.	০·৯
অপরাপর	...	—	...	০·৫

(ট)

আমদানী—অসংস্কৃত (কাঁচা) তামাক—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

		টাকা		শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	...	২৯,৬৫,৮৯৪	...	৬৬.২
মদ্র	...	১৪,৫৭,৩৯৫	...	৩২.৩
সিন্ধু	...	৪০,১১৯	...	.৯
বোম্বাই	...	১৫,১২২	...	.৫

(ঠ)

আমদানী—সংস্কৃত তামাক (সিগারেট, সিগার) প্রভৃতি

সাল		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৯৩৬-৩৭	...	১০,২৪	...	৩৬,০৬
১৯৩৭-৩৮	...	১২,৯২	...	৪০,৭০
১৯৩৮-৩৯	...	১৫,১৭	...	৪৬,৫৪

(ড)

আমদানী সিগার—বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট—১,৯৭,০৫৮ টাকা

		টাকা		শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	...	১,২৮,১৪৩	...	৬৪.৯
ফিলিপাইন	...	৩২,৬২৪	...	১৬.০
আমেরিকা	...	৬,৬০৪	...	৩.৪
অপরাপর	...	—	...	—

(চ)

আমদানী সিগার—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

		টাকা		শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	...	১,০৬,৪৫১	...	৫৪˙০
বোম্বাই	...	৭২,১৫৭	...	৩৭˙০
সিন্ধু	...	১৪,৯৯০	...	৮˙০

(ণ)

আমদানী—সিগারেট

সাল		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৯০০-০১	...	১১,৬৫	...	১৭,০৪
১৯০৬-০৭	...	২৯,১৩	...	৪৫,৯৭
১৯১৬-১৭	...	২৪,০১	...	১,০৩,১০
১৯২৬-২৭	...	৪১,৭৫	...	১,৯৪,৬১
১৯২৭-২৮	...	৫৫,৯৬	...	২,৩৯,৯৬
১৯৩০-৩১	...	৩০,৬০	...	১,২২,৪৮
১৯৩১-৩২	...	১৪,৩৬	...	৫২,৭৮
১৯৩২-৩২	...	৮,৩২	...	২৮,৯৫
১৯৩৩-৩৪	...	৫,৯৩	...	১৯,০৭

(এখন হইতে আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে)

সাল		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৯৩৪-৩৫	...	৬,১৫	...	২২,২১
১৯৩৫-৩৬	...	৮,৩১	...	২৮,১০
১৯৩৭-৩৭	...	৯,১৯	...	৩১,৬০
১৯৩৭-৩৮	...	৯,৯৩	...	৩৪,৩৭
১৯৩৮-৩৯	...	১২,১৮	...	৪০,২৭

(ত)

আমদানী—সিগারেট—বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট—৩৪,৩৬,৯৪৫ টাকা

		টাকা		শতকরা অংশ
ব্রিটেন	...	৩২,৫৯,৯৭৮	...	৯৫˙৮
আমেরিকা	...	১,০৯,৬৬২	...	৩˙১
ব্রহ্ম	...	১৬,৮৭৯	...	˙৫
অপরাপর	...	—	...	১˙৬

(থ)

আমদানী—সিগারেট—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

		টাকা		শতকরা অংশ
বাঙ্গলা	...	১৬,১৮,২৩৮	...	৪৭˙০
বোম্বাই	...	১৪,৬৯,৩১১	...	৪২˙৭
সিন্ধু	...	২,১২,১৫৩	...	৬˙১
মদ্র	...	১,৩৭,২৪৩	.	৪˙০

রবার (India Rubber)

সভ্য জগতে নানারূপ পণ্যের মধ্যে রবার যে-প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সে হিসাবে ইহার পরিচয় অতি আধুনিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু শিল্পে, বাণিজ্যে এবং ব্যাপক ব্যবহারে অন্যান্য বহু পণ্যের মধ্যে ইহার স্থান এখন অনেক উপরে।

দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট জঙ্গলে প্রচুর রবার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। রবার ইউরোপে আসিয়া পৌছিবার বহু পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মেক্সিকো প্রদেশ পর্য্যটনকারীগণ ইহা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনেন।

ইউরোপ আগমন

তাঁহারা লক্ষ্য করেন, কোনও বৃক্ষের স্থিতিস্থাপক আঠা হইতে প্রস্তুত বল লইয়া স্থানীয় লোকে খেলা করিতেছে। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় দ্বিতীয় অভিযানকালে কলম্বস এই গোলক বা বল দেখিতে পান। ফরাসী পর্য্যটক কন্দামিন (Charles Marie de la Condamine) আমাজন নদ সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কার করিতে গিয়া রবারের বিষয় অনেক কথা জানিতে পারেন এবং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইকোয়েডর প্রদেশের এ্যাণ্ডিস (Andes) অঞ্চলে সংগৃহীত রবারেব নমুনা ফরাসী বৈজ্ঞানিকদিগের (Academie des Sciences) নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি লিখিয়া দেন যে কোনও এক জাতীয় বৃক্ষত্বক চাঁচিয়া দিলে যে সাদা দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয় তাহা দ্বারা লোকে মশাল প্রস্তুত করে। তাহা ছাড়া, বস্ত্রাদিতে ঐ আঠা লাগাইয়া তাহারা উহাতে মোম লাগাইবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়; জুতা প্রভৃতিতে লাগাইলে উহা সহজে ভিজিয়া যায় না এবং ঐ আঠা হইতে নানাবিধ তৈজসাদি প্রস্তুত হয়।

এই আঠাকে স্থানীয় লোকে কেহুচু (cahutchu) বলে। তাহা

হইতে (caoutchouc) নাম হইয়াছে। পেন্সিলের দাগ উঠাইবার

নামকরণ

(rub) পক্ষে caoutchouc বিশেষ উপযোগী মনে হওয়ায় ১৭৭০ সালে প্রিষ্টলি (Priestly) উহাকে রবার (rubber) আখ্যা দেন।

এই সময় পর্য্যন্ত লোকে গাছের আঠার ব্যবহারই জানিত। কিন্তু অতদূর দেশ হইতে আসিবার সময় আঠা জমিয়া কঠিন হইয়া যাওয়ায় রবারের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে বহু সময় লাগিয়া যায়। তখন লোকে

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান করিতে থাকে কি ভাবে রবারকে কাজে লাগান যায়। Macquer এবং Herissant ইহাতে বিশেষ মনঃসংযোগ করেন এবং লক্ষ্য করেন যে এই আঠা অন্য জাতীয় বৃক্ষ নির্য্যাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বোক্তগুলি সাধারণ সুরাসার বা স্পিরিটে (spirit of wine) দ্রব হইয়া যায় কিন্তু কেহচু সেইরূপ হয় না। সুতরাং ইহাকে কাজে লাগাইতে হইলে অন্য কোনও পন্থা আবিষ্কার করা প্রয়োজন। টার্পিন তৈল এবং ইথার (ether) এই কার্য্যে বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু দ্রব হইলেও ইহা রবারের মূল আঠার ন্যায় তরল হয় না বা পূর্ব্বের আকার প্রাপ্ত হয় না। দ্রাবক দ্বারা গলিত শুষ্ক আঠা স্বচ্ছ এবং অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া থাকে। এত দূর অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও তখনকার মত এই আবিষ্কার

শিল্পের সূত্রপাত

চাপা পড়িয়া যায়। ১৭৯১ সালে পীল (Samuel Peal) ইহা হইতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য সরকারের নিকট একচেটিয়া অনুমতি (patent) * চান।

* Samuel Peal patented a method of rendering waterproof "all kinds of leather, cotton, linen and woollen cloths, silk stuffs, paper, wood, and other manufactures and substances for the purpose of being worked up into shoes, boots and other wearing apparel and to be used on all occasions where dryness or power of repelling wet or moisture may be required."

তখন কাপড়ের উপর টার্পিন তৈলে দ্রব-রবারের প্রলেপ দিয়া বা আদি তরল আঠা মাথাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা হয়। এইরূপ বস্ত্রাদি বহুদিন পর্য্যন্ত আঠাল বা চট্‌চটে থাকিত এবং ব্যবহারে বিরক্তি আসিত।

নূতন আলো

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্গার বাষ্প (coal gas) সহজ প্রাপ্য হয়। সাধারণ গৃহস্থের রন্ধন এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য বহু গ্যাস প্রস্তুত হইতে থাকে। ইহাতে প্রচুর আলকাতরা ও দ্রব আমোনিয়া বা তরল আমোনিয়া (ammonia liquer) নির্গত হয় এবং অব্যবহার্য্য বস্তুরূপে কর্ত্তৃপক্ষের বড়ই চিন্তার কারণ হইয়া পড়ে। ম্যাকিনটস (Charles Mackintosh) পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারেন যে অঙ্গার-উদ্ভূত তৈল (coal oil or naphtha) দ্বারা রবার দ্রব করা সম্ভব। তখন তিনি এই জাতীয় বস্তু প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন পেটেণ্ট লন।

তিনি একখানি বস্ত্রের উপর গলিত রবার লাগাইয়া উপরে আর একখানি বস্ত্র যুক্ত করিয়া দিতেন। ইহাতে জল হইতে অনার্দ্রতাশক্তি লাভ করিয়া এই বস্ত্র (water proofed) নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই সকলের মধ্যে বর্ষাতি (water proofs) প্রধান এবং এই জাতীয় পোষাক ম্যাকিনটস্ নামে আজও পরিচিত।

হ্যানকক্ (Thomas Hancock) এই সময় ম্যাকিনটসের সহিত যোগ দেন। তিনিও রবার হইতে নানারূপ দ্রব্যাদি বিশেষতঃ স্থিতি-স্থাপক (elastic) বন্ধনী জাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। ম্যাকিনটসের অনার্দ্রতাশক্তি সম্পন্ন রবার-লিপ্ত কাপড়ের সাহায্য পাইয়া তাঁহারা বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। ১৮৩০ সালেই বালিশ, বায়ুপূর্ণ আসন, ভাসমান কোমরবন্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং বাজারে বিক্রীত হইতে থাকে।

হ্যানকক্ আরও এক বিষয় বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। নিজের ইচ্ছা এবং প্রয়োজনমত মাপের রবার আমদানী করিতে না পারায় তাঁহার বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। রবার পেষণ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব কিনা পরীক্ষার মানসে নূতন তিনি এক যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া তাহাতে পেষণ আরম্ভ করেন। দেখা গেল, রবার ভিন্ন ভিন্ন টুকরা না হইয়া গিয়া একটী পরস্পরসংযুক্ত আকৃতিধারণক্ষম কর্দ্দমকোমল পদার্থে পরিণত হইল। তিনি লক্ষ্য করেন ঐ যন্ত্রের (masticator) মধ্যে রবার পিষ্ট হইবার সময় যে তাপ স্বতঃই উদ্ভূত হয় তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব। এরূপ পিষ্ট রবার পাওয়ায় নানাবিধ আকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল।

পিষ্ট রবার

আরও একটী আকস্মিক আবিষ্কার এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। পিণ্ড রবার দ্রব করিতে যে পরিমাণ দ্রাবক লাগে, পিষ্ট রবারে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ও লাগে না।* এইরূপ গলিত রবার দ্বারা রবারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং অন্য দ্রব্যাদির সহিত রবারের সংযোগ সম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু এই সকল দ্রব্যাদি বিশেষ আঠাল বা চট্‌চটে থাকিয়া যায় এবং তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে। আমেরিকায় গুডইয়ার (Charles Goodyear) এবং ইংলণ্ডে হ্যানকক্ কঠোর পরীক্ষা চালাইতে থাকেন এবং ১৮৩৮ সালে গুড্‌ইয়ার এবং তাঁহার বন্ধু হেওয়ার্ড (Nathaniel Hayward) রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া সূর্য্য তাপের সাহায্যে (solarising) রবারের আঠাল ভাব দূর করিতে সমর্থ হন। ইহাতে রবারের গুণেরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পরে রবার এবং গন্ধকের সহিত white

রূপ পরিবর্ত্তন

* In scientific phraseology, this is, "the effect of mastication is to reduce the solution viscosity of rubber."

lead (সফেদা) মিলাইয়া তাপ দিতে তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে উহা গলিত না হইয়া ক্রমশঃ কঠিনতর হয় এবং চামড়ার মত কোনও বস্তুতে পরিণত হয়। এই সকল প্রক্রিয়া প্রথমে 'পরিবর্ত্তন' ("the change") নামে চলিতে থাকে। পরে ব্রোকডন (Mr. Brockedon) উহাকে ভলকান (গ্রীসীয় পুরাবৃত্তে অগ্নিদেবতা এবং দেবতাদিগের অস্ত্র বর্ম্মাদি নির্ম্মাতা Vulcan বলিয়া পরিচিত) নাম হইতে 'ভলক্যানিজেসন' (vulcanisation) নামকরণ করেন। ১৮৪৫ সালে ইংলণ্ডে এই প্রক্রিয়াকে পেটেণ্ট করা হয়।

পরিচয়

মূলতঃ রবার একজাতীয় গাছের আঠা। যে সকল গাছ হইতে আঠা বাহির হইয়া জমিয়া যায় এবং পরে যাহাকে রবারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা একই জাতীয় বৃক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিলেও ইহাদের বহু বিভিন্নতা আছে। কোনও কোনওটি বিরাট মহীরুহ; বিশেষতঃ আসাম প্রদেশের রবার গাছকে বটগাছ বলিয়া ভ্রম হয়। বটগাছেরই মত ইহার শাখা হইতে শিকড় বা ঝুরি নামিয়া মাটীতে পড়ে এবং কাণ্ডে পরিণত হয়। কতগুলি বৃহদাকার এবং বহু দীর্ঘ হইলেও তাহা হইতে এরূপ শিকড় নামে না। কতগুলি খর্ব্বাকৃতি, চার হইতে ছয় হাত দীর্ঘ হয় এবং কোনটিকে স্থূল ও দৃঢ় লতার আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের সাহায্য না পাইলে উপরদিকে উঠিতে পারে না।

মূল রবার

তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র দ্বারা গাছের ছাল বা ত্বক চাঁচিয়া দিলে ঘন দুধের মত আঠা নির্গত হইয়া থাকে। বটগাছের পাতা বা ডাল ভাঙ্গিলে যেরূপ দুধ বাহির হয়, রবারের আঠার সহিত আকৃতিগত ইহার কোনও প্রভেদ নাই। আঠা সংগ্রহ করিবার জন্য উপর হইতে অল্প পরিমাণে গাছের ছাল চাঁচিয়া (tapping) দেওয়া

হয়। উপরের ত্বকের নীচেই যে অংশ অবস্থিত, তাহাতে এই আঠা থাকে। গভীরভাবে ক্ষত করিলে গাছ মরিয়া যায়; সুতরাং যাহাতে ত্বক একেবারে উঠিয়া গিয়া কাণ্ডের কাষ্ঠাংশ বাহির না হয়, এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ছালের উপর ইংরাজি অক্ষর V-এর মত করিয়া চাঁচে। যাঁহারা আমাদের দেশে খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে ইহার ধারণা করা কষ্টকর নহে। তবে খেজুর গাছের কাণ্ড চাঁচিয়া দেয়, আর রবার গাছের ত্বকের উপরিভাগ মাত্র ব্যবহার করে।

রবার গাছ চাঁচিয়া দিবার বিভিন্ন রূপ আছে। তাহার মধ্যে এই পন্থাই প্রধানতঃ পালন করা হয়। কখন কখনও দুই বা তিন হাত ব্যবধানে উপরে উপরে তিনটি বা ততোধিক V-দাগ করা হয় (Herring bone) এবং সকল দাগ হইতে এক ধারায় রস পড়িবার জন্য ইহাদের কোণ (angle)গুলি একটি নালীতে আনিয়া যুক্ত করা হয় এবং রস ধারণের জন্য এই নালীর নীচে একটি পাত্র বসাইয়া দেয়।

রস সংগ্রহ

মৃত্তিকা হইতে মাত্র দুই তিন হাত উপরে এইরূপ ভাবে চাঁচিয়া দেয়। গাছগুলি চার হইতে ছয় বৎসরের হইলে কাজের উপযুক্ত হয়। খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করিতে যেরূপ কঞ্চির নল দেওয়া হয়, এখানে অনুরূপ ধাতব বা অন্য নল বৃক্ষের কর্ত্তিত অংশের নীচের দিকে কোণে (angle) বসাইয়া দিলে তাহা বাহিয়া রস উহার নিম্নে স্থাপিত পাত্রে পড়ে।

প্রতিবারে বৃক্ষ ত্বক ·০৪ ইঞ্চির অনধিক গভীর করিয়া কাটা হয়। সাধারণতঃ এক দিন বাদ দিয়া পরের দিন কাটা হয় এবং এই ভাবে ২০ হইতে ২৫ দিন চাঁচিয়া দেওয়া হয় এবং বৃক্ষত্বক স্থূলত্বে এক ইঞ্চি পরিমাণ গভীর হইয়া গেলে সেই স্থান ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ কোণ

(V) করিয়া কাটিবার সময় বৃক্ষের মাত্র কতকাংশ বাছিয়া লয়, অর্থাৎ বৃক্ষের পরিধির সিকি বা অর্দ্ধেক অংশ V ভাবে চাঁচিয়া অপর অংশ অকর্ত্তিত অবস্থায় থাকিতে দেয়। পর বৎসর বিপরীত দিকের সেই অকর্ত্তিত অংশে কাজ সুরু করে।

ত্বক চাঁচিয়া দিবার পর দুই তিন ঘণ্টা রস ঝরিতে থাকে। স্থান ও বৃক্ষভেদে এই রসের পরিমাণের বহু তারতম্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ এক বৎসরে এক হইতে তিন পাউণ্ড রবার পাওয়া যায়; সিংহলে পঁচিশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

বিশ্লেষণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই রস দেখিতে দুধের মত সাদা; ইহা ক্ষীরের মত ঘন অর্থাৎ বটের আঠাকে রবারের আঠা (latex) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই মূল হইলেও, ইহার বহু অংশ বাদ দিলে তবে রবার পাওয়া যায়।

এই "দুধে" আঠাল পদার্থ, আমিষ জাতীয় বস্তু (protein ২%), খনিজ দ্রব্যাদি, কেউটস্থক বা রবার (২৮ হইতে ৩৬%) এবং ৬০ হইতে ৭০ ভাগ জলীয় অংশ থাকে। প্রধান এই কয়টী অংশের যে আবার ইতর বিশেষ আছে, তাহা বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই caoutchoucই প্রধান বস্তু এবং যে জাতীয় বৃক্ষ হইতে ইহা অধিক পাওয়া যায়, তাহাই অপেক্ষাকৃত বেশী আদরণীয়।

রবার কি ?

রবার বলিতে আমরা প্রধানতঃ যাহা বুঝি, তাহা রসের বহুতর রূপান্তর; উহার ঠিক পরবর্ত্তী অবস্থা শুষ্ক latex নহে। রবার এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগে এক নূতন বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাই আমরা রবার বলিয়া জানি। রস বা আঠা অবস্থায় রবার বেশীক্ষণ থাকে না; বায়ুর সংযোগে শুষ্ক হইয়া উঠে। কয়েক জাতীয় রস এইভাবে শুষ্ক হইতে অনেক সময় লয়। সুতরাং

ইহাকে প্রয়োজনমত জমাইবার (coagulation) জন্য ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদি যোগ করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া তাপ প্রয়োগদ্বারা রস গাঢ় করিয়া রবার পাওয়া যায়। রূপান্তরিত বা রবারে পরিণত রসকে coagulum এবং জলীয় অংশকে serum বলে। আবাদ হইতে প্রাপ্ত (plantation rubber) প্রায় সমস্ত রসই রাসায়নিক দ্রব্যাদি (reagents) সংযোগে ঘনীভূত করে। কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখা দরকার যে একই reagent সকল রসের উপর সমান ক্রিয়া প্রকাশ করে না।

আমাজনে রবার প্রস্তুত

জঙ্গলী বা প্যারা (Para) রবার (wild rubber) বহু পথ পার হইলে খামারে আসিয়া পৌঁছে। সেখানে তাহারা যতদূর সম্ভব জলীয় ভাগ দূর করিয়া একটী দণ্ড বা লাঠির অগ্রভাগে ঘনীভূত আঠা লাগাইয়া ধোঁয়ার উপর ধরিয়া (smoking) ঘুরাইতে থাকে। শিখা অপেক্ষা ধূম যাহাতে বেশী হয় সেইরূপ ভাবে তাহারা আগুন জ্বালাইয়া রাখে এবং ধোঁয়া যাহাতে একস্থান দিয়া বাহির হয়, তাহার জন্য ফাঁদল (funnel)-এর মত একটী পাত্র আগুনের কিছু উপরে স্থাপন করিয়া নল ভাগটী উপর দিকে দিলে ধোঁয়া একটী ধারায় বাহির হইতে থাকে। খানিকটা আঠা ঘন হইয়া লাঠির আগায় লাগিয়া গেলে তখন তাহার উপর আবার আঠা লাগায় এবং ধোঁয়ার উপর ধরে। এইভাবে প্রস্তুত এক একটী পিণ্ড এক মণ পর্য্যন্ত ওজনের দেখিতে পাওয়া যায়।

আবাদে (plantation) রস সংগৃহীত হইলে খামার বা কারখানায় আনিবার পূর্ব্বে ইহার গাঢ়ত্ব রোধ করিবার জন্য কতগুলি দ্রব্যাদি (anti-coagulants)* মিশ্রিত হয়। তাহা না হইলে জঙ্গলের ভিতর

* প্রধানতঃ ammonia, sodium sulphite, formaldehyde, sodium carbonate, etc.

হইতে কারখানায় বা খামারে আনিতে উহা ঘন হইয়া যায়। যথাস্থানে আসিয়া পৌঁছিলে তখন ঘন করিবার জন্য ইহাতে যে সকল দ্রব্যাদি মিশ্রিত হয়, তাহার মধ্যে এ্যাসেটিক এ্যাসিড (acetic acid) প্রধান। প্রতি ১০০ ভাগ রসে ০.৩% এ্যাসিড দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; তখন ঘনীভূত আঠা পাত্রের তলদেশে পড়িয়া যায় এবং জল উপরে উঠে। এই ঘনীভূত রবার লইয়া জগতের বাজারে নানা খেলা চলিতেছে।

গাঢ়ত্বরোধ

প্রধানতঃ রবারকে এই সময় ক্রেপ (crepe) এবং ধূম্রদ্বারা শুষ্ক চাদর (smoked sheet), এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বহু পরিমাণ আঠা (latex) পাত্রে রাখিয়া রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ দ্বারা (acetic acid) জমাইয়া, বাই-সলফাইট অফ্ সোডা (bisulphite of soda) যুক্ত জল দ্বারা ধুইয়া ফেলে। তাহার পর ক্রেপ কাপড়ের (অসমতল) আকৃতি বিশিষ্ট করিবার জন্য এক যন্ত্রের মধ্যে চাপ দিয়া সছিদ্র চামড়ার আকারে পরিবর্ত্তিত করে। ইহা জুতার তলা (sole) হিসাবে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

'ক্রেপ'

অপর জাতীয় রবার (smoked sheet) প্রভৃতি করিবার জন্য মোটামুটী একই পন্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু ইহা পরিষ্কার বা বর্ণহীন করিবার জন্য কোনও রাসায়নিক দ্রব্যাদি (bisulphite of soda) দেওয়া হয় না। রবার জমাট বাঁধিয়া তখন তাহাকে যন্ত্রের মধ্যে চাপ দিয়া চাদর (sheet) প্রস্তুত করা হয়। যন্ত্রের মধ্য দিয়া চালিত করিবার সময় ইহার গাত্রে এমনভাবে নানারূপ ছাপ করিয়া দেয় যাহাতে একখানির উপরে আর একখানি চাদর রাখিলে উহা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে লাগিয়া না যায়। এই

চাদর

চাদরগুলি ৮ হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত ধোঁয়া পূর্ণ ঘরে (smoke house) রাখিবার পর ব্যবহারের উপযোগী হয়।

জগতে কাঁচা বা শুষ্ক বরার মাত্র কয়েকটী দেশ হইতে পাওয়া যায়।

উৎপত্তিস্থান

এক কালে দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলের মধ্যে আমাজন নদের তীরভূমি কাঁচা রবার পাইবার পক্ষে প্রধান স্থান ছিল। ১৮০৬ সালে ব্রেজিল হইতে ১ লক্ষ ৩১ হাজার জোড়া জুতা এবং অন্যান্য রকমে ব্যবহৃত ১ লক্ষ ৪২ হাজার পাউণ্ড রবার রপ্তানী হয়। ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৫৩ সালে ২ হাজার ২ শত ৫০ টনে পৌঁছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রবারের আবাদ হওয়ায় ব্রেজিলের সে আদর নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উইকহ্যাম (Sir Henry Wickham)এর নাম করা প্রয়োজন। ব্রেজিল হইতে বীজ বা চারা বাহিরে পাঠান সম্ভব ছিল না। 'ব্রেজিলের দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদাদি' (some rare botanical specimens) বিদেশে চালান যাইতেছে বলিয়া উইকহ্যাম গোপনভাবে রবারের বীজ ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন। ১৮৭৬ সালে কিউ বাগিচায় (Kew Gardens) বীজ আসিয়া পৌঁছে এবং তাহা হইতে উৎপাদিত চারা সিংহল, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সুমাত্রাতে প্রেরণ করা হয়। সিংহল হইতে ১৯০১ সালে সাড়ে তিন টন রবার প্রথম রপ্তানী হয়। ১৯০৭ সালে উহা ৩৫৫ টন হয়। তখন মালয় দেশে রবারের আবাদ লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে; এবং ১৯০৫ সালে ইহা সিংহলকে বহু পিছনে ফেলিয়া যায়। ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জগুলিতে ও রবার চাষ হয়; এবং ১৯২৭ সালে রবারের পরিমাণ মালয়ের সমান হইয়া যায়। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় (এ্যাণ্ডিস Andes), মেক্সিকো, উত্তর আমাজন, ব্রেজিল, টাঙ্গানাইকা, আফ্রিকা ও পূর্ব্ব দক্ষিণ এসিয়ায় মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিয়ো, ফরাসী ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ, শ্যাম, সিংহল ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষে রবারের আবাদ হইয়াছে।

এই সকল দেশে নানা নামে রবার পাওয়া যায় এবং গুণানুসারে ইহাদের নানা প্রভেদ আছে। সকল প্রকার আবাদের মধ্যে (Hevea brasiliensis) বিশেষতঃ প্যারা (Para) প্রদেশের রবার গুণে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।* বর্ত্তমানে মালয় প্রভৃতি দেশে প্যারা রবার জন্মানো সম্ভব হইয়াছে; তবে দেশ ও জলবায়ু ভেদে কয়েক প্রকার রবার জন্মে তাহার মধ্যে হেভিয়া (Hevea) প্রধান; অপরগুলির অংশ নামমাত্র।

পৃথিবীতে উৎপন্ন রবারের পরিমাণ

পৃথিবীতে কত পরিমাণ রবার উৎপন্ন হয়, তাহার মোটামুটী একটী হিসাব রাখা হয়; কিন্তু রবার উৎপাদনকারী প্রতি দেশ হইতে কতপরিমাণ রবার প্রতিবৎসর রপ্তানী হয়, সেই হিসাব হইতেই মোট উৎপন্ন রবারের হিসাব ধরা হয়। রবার রপ্তানীতে ইংরাজ অধিকৃত মালয় প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৩৮ সালে সকল দেশ হইতে ৯ লক্ষ ২০ হাজার টন রবার রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে একা মালয়ের অংশ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন, পরেই ওলন্দাজ অধিকৃত ভারত দ্বীপপুঞ্জের স্থান। ঐ সকল দ্বীপ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩ লক্ষ টন রবার রপ্তানী হইয়াছিল; পৃথিবীতে যত একার জমি ব্যাপিয়া রবারের আবাদ আছে এবং সেই সকল আবাদে যত রবার জন্মে, তাহার যে আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায়, তাহা পরিশিষ্টে (খ) রহিল।

ভারতের আবাদ

১৮৭৬ সালে সিংহলে যে চারা আসিয়া পৌছে তাহা হইতে ক্রমে ভারতবর্ষে রবার চাষ ছড়াইয়া পড়ে। ব্রহ্মে টেনেসরিম তীরভাগে এবং মদ্রে পশ্চিমঘাটের নিম্নদেশে মাঙ্গালোর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত মালবার প্রদেশে, মালয় দেশের ন্যায়

---

* কয়েকটী বিশেষ জাতীয় রবার ও তাহাদের উৎপাদনকারী দেশের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

S. America (Amazon territory)—*Hevea brasiliensis*, *Castilloa.* Mexico—*Gualeye*, *Castilloa.* Africa—*Landolphia*, *Kicksia*, *Funtumina.* Eastern Asia—*Fiscus elastica*, *Urceola.*

বারিপাত, আর্দ্রতা ও তাপ পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল দেশে যে প্রচুর রবার জন্মে, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতের আরও দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে সিংহলের অনুরূপ জলবায়ু বর্ত্তমান। মদ্রের সালেম জেলায় সেভারয় পর্ব্বতমালার ঢালু প্রদেশ ও রবার আবাদের একটী প্রধান স্থান। মদ্র বাদে ব্রিটিশ প্রদেশগুলির মধ্যে কুর্গ এবং করদরাজ্য হিসাবে ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর ও কোচিন প্রদেশে রবারের আবাদ আছে। ভারতের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের স্থান প্রধান। মেনকোট্টা ও মুন্দাকায়ম জেলার রাণী নামক উপত্যকা প্রদেশ ত্রিবাঙ্কুরকে ঐ সম্মান দান করে। পেরিয়ার নদীর তীরে আট্টাকাড় আবাদ ১৯০২ সালে পত্তন হয় এবং উহাই ত্রিবাঙ্কুরের প্রথম আবাদ।

ভারতবর্ষে ১৯৩৭ সালে সকল স্থান মিলিয়া মোট উৎপন্ন ৩ কোটী ২২ লক্ষ ৬৬ হাজার পাউণ্ড (শুষ্ক) রবারের মধ্যে একা ত্রিবাঙ্কুরে আড়াই কোটী পাউণ্ড, মদ্রে সাড়ে ৩৪ লক্ষ এবং কোচিনে ২৯ লক্ষ পাউণ্ড রবার জন্মে। সুতরাং অন্য স্থানে যে রবার উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম, পরিশিষ্ট (গ)। যে রবারের পরিচয় এস্থানে দেওয়া হইল, তাহা সমস্তই আবাদী রবার এবং প্রথম অবস্থায় কিউ গার্ডেন হইতে চারা সরবরাহ করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও ভারতবর্ষে আসাম প্রদেশে কোন্ আদিকাল হইতে রবার গাছ জন্মিয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নহে। আন্দাজ ১৭৯৮ সালে রক্সবর্গ (Roxburg) আসাম দেশে **fiscus elastica** গাছ দেখিতে পান, এবং সে জাতীয় বৃক্ষ এখনও আসামে প্রচুর জন্মে।

ভারতের রবার ব্যবসায় বিশেষ পুরাতন নহে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের রবারের পরিচয় বাহিরে পৌঁছে এবং ১৯০৩-০৪ সালে রপ্তানী সুরু হয়। তখন ইহার পরিমাণ মাত্র ২ লক্ষ ১ হাজার

পাউণ্ড এবং মূল্য ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এই রবার সম্ভবতঃ ভারতের বাহির হইতে স্থলপথে আসামের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। দশ বৎসর বাদে ১৯১৩-১৪ সালে ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার পাউণ্ড, ৫৯ লক্ষ টাকা মূল্যে দাঁড়ায়। রপ্তানীর পরিমাণ হিসাবে ১৯৩৫-৩৬ সাল, ৩ কোটী ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার পাউণ্ড রবার (৮৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা) এবং মূল্য হিসাবে ১৯২৫-২৬ সাল ২ কোটী ৯৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা (২ কোটী ২৪ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড রবার) প্রধান। ১৯৩১-৩২ সালে জগতের বাজারে মন্দা পড়ায় এবং অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার জন্য রপ্তানী হঠাৎ দারুণ পড়িয়া যায়। ১৯৩০-৩১ সালেও ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ২৭ হাজার পাউণ্ড রবার, ১ কোটী ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সালে যথাক্রমে উহা মাত্র ৬৯ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ড ও ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকাতে নামিয়া যায়। বর্ত্তমানে (১৯৩৮-৩৯) ১ কোটী ৭২ লক্ষ ৮ হাজার পাউণ্ড রবার, ৭১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে (ঘ) বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য দেওয়া হইল।

বাণিজ্য—রপ্তানী

কাঁচা রবার রপ্তানীর সুরু হইতেই ইংরাজ আমাদের প্রধান ক্রেতা। বর্ত্তমানে তাহার অংশ অর্দ্ধেকেরও উপর। পরেই আমেরিকা ১৫.৫%, জার্ম্মাণী, সিংহল, ইটালী প্রভৃতি দেশও কিছু কিছু রবার লয়; পরিশিষ্ট (ঙ)। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্থান জার্ম্মাণীর পরেই ছিল; বর্ত্তমানে তাহার কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব নাই।

ক্রেতা

সম্প্রতি কিছু কিছু রবারজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং কিছু বৃদ্ধিও পাইতেছে। তবে প্রধানতঃ ইহারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত

বিদেশীয়দের কারখানায় প্রস্তুত মাল। বর্ত্তমানে ইহার মূল্য কমবেশ ৪ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে ; পরিশিষ্ট (চ)।

যাহাই ভারতবর্ষে আসে তাহার সমস্তই প্রস্তুত দ্রব্যাদি। বোধ হয় ১৮৭৬-৭৭ সালে প্রথম আমদানী সুরু হয়। তখন বিদেশী রবার ও রবারজাত দ্রব্যাদি মিলিয়া সওয়া এক লক্ষ টাকা (১,২৭,৭৫৯ টাকা) ছিল। পঁচিশ বৎসর বাদে (১৯২৪-২৫) ১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা হয় এবং ১৯২৯-৩০ সালে ৩ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা হইয়া চূড়ান্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমানে কিছু হ্রাস পাইয়াছে। তাহা হইলেও (১৯৩৮-৩৯) এখনও ১ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা আছে ; পরিশিষ্ট (ছ)।

বাণিজ্য—আমদানী

ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে কাঁচা রবার আমদানীর স্বতন্ত্র হিসাব রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। এ বৎসরও সাড়ে ১০ লক্ষ টাকায় ৫২ লক্ষ পাউণ্ড রবার আসিয়াছে। যাহাতে এই আমদানী বন্ধ হয় তাহার জন্ম আন্দোলন চলিতেছে এবং আশা করা যায়, ভারতের বাজারে ব্রহ্ম দেশীয় রবারের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিতে হইবে না।

ভারতের বাজারে ইংরাজই প্রধান বিক্রেতা। তাহার বিক্রীত মালের পরিমাণের সহিত আর কোনও দেশের তুলনা হয় না। জার্ম্মাণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশও মাল বিক্রয় করে, কিন্তু ইংরাজের অংশ যেখানে ১ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা (১৯৩৭-৩৮), সেখানে জার্ম্মাণীর ২৫ ও আমেরিকার ২১ লক্ষ ; পরিশিষ্ট (জ)।

বিক্রেতা

যে সকল মাল আসে, তাহার মধ্যে মোটর টায়ার (*tyre*) এর অংশই প্রধান। ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে (১৯৩৮-৩৯) উহার অংশ প্রায় ১ কোটী টাকা। তাহার পরই মোটর টিউব এবং সাইক্লের টায়ার পড়ে।

আমদানীর পরিচয়

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমরা যে রবার ব্যবহার করি তাহা মূল রস বা আঠা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কি ভাবে এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারও কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীর আরও বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শুষ্ক রবার পিষ্ট করিতে বহু অসুবিধা ছিল এবং অনেক সময় নষ্ট হইত; সে কারণে তাহা কোমল করিবার জন্য কতগুলি বস্তু (softeners, plasticisers বা কোমলক) মিলাইয়া লইলে প্রয়োজনমত দ্রুত কর্দ্দমকোমল পদার্থে পরিণত করিতে সুবিধা হয়। তাহার পর এই পদার্থকে পুনরায় যন্ত্রে চাপ দিয়া (calendering) চাদর (sheet) প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার সময় হয়ত সমস্ত পদার্থটা অতিশয় আঠাল বা কঠিন (rubbery or tough) হইতে পারে। তখন ইহার সহিত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগে পুনরায় রবারে রূপান্তরিত পুরাতন পরিত্যক্ত রবার (reclaimed rubber) মিলাইয়া লইলে বহু পরিমাণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। উভয়ের সম্মিলিত বস্তুতে যদি কোনও গুণের অভাব থাকে, বা নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে বিভিন্ন প্রকারে ব্যবহারোপযোগী তৈয়ারী রবার (finished rubber) প্রয়োজন হয়, তখন তাহাতে কতকগুলি "ভরণ" (fillers) এবং মনোহারী বর্ণ করিবার জন্য রঙ বা pigment মিশাইতে হয়। এই সকল প্রক্রিয়া পালন করিবার পর তাপ ও গন্ধক যোগে রবার রূপান্তরিত (vulcanisation) করিবার সময় আসে।

উন্নত প্রণালী

সাধারণতঃ ইহাতে যে সময় লাগা উচিত বৈজ্ঞানিক বা ব্যবসায়ীর তাহাতে মন উঠে না। কার্য্য সহজ করিবার জন্য তখন কতগুলি "দ্রুতক" (accelerators) মিলাইয়া লইয়া মিলনের কাজে উৎসাহ (activate) দেওয়া হয়।

এত যত্ন করিয়া তৈয়ারী করা রবার ও সাধারণতঃ হাওয়া লাগিয়া শীঘ্র "বার্দ্ধক্য" (ageing) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ রবার কঠিন এবং ভঙ্গুর হয়, স্থিতিস্থাপকতা শক্তি নষ্ট হইয়া আকারে ক্ষুদ্র হইয়া যায়, ইহার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন শক্তি হ্রাস পায়। ইহা রোধ করিবার জন্য আবার কতগুলি দ্রব্যাদি (anti-oxidants) মিশাইয়া লওয়া হয়। এই সকল অবস্থা পার হইলে তখন রবার নানারকম কাজের উপযোগী হয়।

সকল কারখানায় একই পদ্ধতিতে রবারের সংস্কার সাধন করা হয় না এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদি মিশ্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ স্থানে যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা সকল রবারের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। তবে মোটামুটি এই পদ্ধতি পালিত হইয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত বলা যায়।

ব্যবহার

রবারের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিবার কিছুই নাই। লোকের চক্ষে যত রকম রবারজাত দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার সকলগুলি বিবৃত করিতে গেলে স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়।

সংক্ষেপে রবারের পরিচয় দিলেও, তাহার পরিমাণ কম হইবে না; তাহার উপর আজকাল রূপান্তরিত রবারের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে রবারের আঠা (latex) হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত চলিতেছে, তাহারও বিবরণ দেওয়া দরকার।

রথচক্র

বর্ত্তমানে যত রবার পৃথিবীর সকল কারখানায় ব্যবহৃত হয়, (আন্দাজ ১২ হইতে ১৫ লক্ষ টন) তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ কেবল মাত্র গাড়ীর চাকা, বিশেষতঃ চক্রের উপরের আবরণী (tyre) তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায়। আবাদ করিয়া রবার উৎপাদন করা সম্ভব না হইলে আজ পৃথিবীতে এত টায়ার তৈয়ারী হইত না এবং মোটরযান এত প্রসারলাভ করিতে পারিত না। ১৮৪৫ সালে

টমসন নামে এক ইংরাজ বায়ুপূর্ণ চক্র (pneumatic tyre) নির্ম্মাণের জন্য একচেটিয়া অনুমতি লাভ করেন। ১৮৮৮ সালে ডাক্তার ডন্‌লপ্‌ উন্নত ধরণের চক্রাদি নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত টমসনের "চক্র"কে লোকে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ পৃথিবীতে কমবেশ ৪ কোটী মোটরযান চলিতেছে এবং প্রায় সকলগুলিতেই রবারজাত চাকা প্রধানতঃ টায়ার এবং টিউবযুক্ত করা হইয়াছে। আমেরিকা এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী এবং রবার ব্যবহার কার্য্যেও আমেরিকার স্থান সর্ব্ব প্রথম। গোযান প্রভৃতিতে বায়ুপূর্ণ টায়ার চলিতেছে, সুতরাং রবারের প্রয়োজন আরও বেশী হইবে।

ইহার পরই রবারের ব্যবহার সম্বন্ধে বলিতে গেলে বিষম বিপদে পড়িতে হয়। লোকে সচরাচর রবারের এত প্রকার ব্যবহার দেখিতে পায়, যে তাহাদের পূর্ণ তালিকা দিতে চেষ্টা করিলেও অনেকগুলি বাদ পড়িবার সম্ভাবনা।

সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে রবারের খেলনা, পুতুল, বেলুন, চুষি, নল, জুতা, রবারের কাপড়, মেজে ও সিড়িতে পাতিবার "সতরঞ্চ" প্রভৃতি, আসন, মেঝ তৈয়ারীর টাইল বা টালি, প্যাড (pad) বা নরম আস্তরণ, বায়ুপূর্ণ নরম বিছানা ও বালিশ, সন্তরণের সহায়তার জন্য কোমর বন্ধনী (life belts) প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাজের জন্য গরম সেক বা স্বেদ দিবার জন্য বোতল (hot bottle), তাপ প্রশমনের জন্য বরফ দিবার থলে (ice bag), বন্ধনী (bands, bandages, straps and belts) হাতের দস্তানা প্রভৃতি সূক্ষ্ম পাতলা দ্রব্যাদি (gloves and hygienic goods); বাদ্যযন্ত্র (horn bulbs), গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রেক (brake), সঙ্ঘর্ষ রোধক (buffers) প্রভৃতিও তৈয়ারী হইতেছে।

বোতলের ছিপি, valve, washer, গাছের বন্ধনী (tree ties), রবারের সূতা (threads for garters, etc.) প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কার্য্যে রবার লাগিতেছে।

উন্নত ধরণের রাস্তা নির্ম্মাণে (cement concrete roads) বৃহদাকার চতুষ্কোণ পাথর-সিমেণ্টের চাঁই (slabs) পরে পরে ঢালাই করিয়া দেওয়া হইতেছে। যেখানে উহারা পরস্পরে আসিয়া মিলিত হয়, গ্রীষ্মকালে রৌদ্র তাপে চাঁইগুলি বৃদ্ধি পাইলে ঐ সকল স্থান ফুলিয়া উঠিয়া রাস্তা নষ্ট করিয়া ফেলে। সেই কারণে বর্ত্তমানে ঐ সকল চাঁই একখানি হইতে অপরখানি ছয় হইতে আট ইঞ্চি ফাঁক রাখিয়া পাতা হইতেছে, এবং এই সকল ফাঁকের মধ্যে আজকাল মাপ-সই কঠিন রবারের টুকরা দেওয়া হইতেছে। পৃথিবীর নানা অংশে রবারের কতপ্রকার ব্যবহার নিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

রবার কঠিন করিয়া তাহা হইতে ভলক্যানাইট (vulcanite), ইবনাইট (ebonite) এবং কঠিন রবার (hard rubber) প্রস্তুত হয়; এবং তাহা হইতে নানা প্রকার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যাদি রাসায়নিক কারখানায় * ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে প্রভূত পরিমাণে লাগিতেছে। †

রাসায়নিক কারখানায় কঠোর অম্লের ক্রিয়া হইতে পাত্রাদির ক্ষয় রোধ করিবার উদ্দেশ্যে (anti-corrosive) রবার দ্বারা উহাদের অন্তর্ভাগে আস্তরণ বা 'অস্তর' (lining) দেওয়া হইয়া থাকে। রবারের বিদ্যুৎরোধক

* Solid fittings, pipes, stop-cocks, measuring buckets, rubber lined equipments ; hoes and flexible connections ; rubber covered conveyers ; transmission belting, gaskets, protective clothing.

† Insulating material in electrical industry, electrical instruments and appliances ; handle of tools, packing ring, diaphragms, valves, etc. ; motor car spring shackles, etc.

শক্তি থাকায়, বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় কাজে নৈসর্গিক আঠা, গালা বা রাসায়নিক উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত (bakelite) দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে ভলক্যানাইট প্রচুর ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশি বোতলের মুখ (tops), আলো পাখার সুইচ্, ব্যাটারীর পাত্রাদি, বুস্ (bush) বা চক্রদণ্ড ঘুরিবার জন্য ছিদ্রের অন্তর্ভাগ, বেয়ারিং (bearing) বা ঘূর্ণনের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত ধাতব গোলকের (balls) আধার এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইতেছে এবং আরও কত প্রকার হওয়া সম্ভব, তাহার কোনও ধারণা করা যায় না।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল রবারের আঠা হইতে অর্থাৎ ইহাকে নানারূপে রূপান্তরিত না করিয়াও, বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। এমন দিন আসা অসম্ভব নহে, যখন রবারের নির্য্যাস হইতেই সাক্ষাৎরূপে সমস্ত রবারজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে।

নির্য্যাসের ব্যবহার

বর্ত্তমানে কোনও ছাঁচ (formers) রবারের নির্য্যাসে ডুবাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ নির্য্যাস ছাঁচের উপর জমাইয়া (১) সূক্ষ্ম পাতলা দস্তানা, বেলুন, স্নানের টুপি, জুতা, অঙ্গুলির আবরণী (cots), সিগারেটের মশলা ধারণের থলিয়া (pouches) প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। নির্য্যাস জমিয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই রবারকে স্থায়ী এবং কঠিন (vulcanisation) করিবার জন্য গন্ধক প্রভৃতি সংযোগের ব্যবস্থা করা যায়।

কখনও কখনও বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া রবার রসের (latex) জলভাগ বাষ্পীভবণ (evaporation) দ্বারা দূর করিয়া revertex প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা এই 'নিমজ্জন' প্রথায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

(১) Manufacture of dipped goods from latex.

বিদ্যুৎ শক্তিদ্বারা ধাতব পাত্রাদিতে যেরূপ রূপা, সোনা, নিকেল, প্রভৃতি জমাইবার (plating) উপায় উদ্ভাবিত হইয়া সামান্য ব্যয়েও মূল্যবান্ ধাতব পাত্রাদির রূপ দেওয়া যায়, আজকাল সেই অবস্থায় পাত্রাদির গাত্রে রবার জমাইবার (electro-deposition) ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া রবারের বিশেষ বিশেষ গুণের সুযোগ লইয়া এই উপায়ে পাত্রাদির গাত্রে জমানো রবার উঠাইয়া লইয়া ভিন্ন বা স্বতন্ত্র পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা চলিতেছে।

রবার "প্লেটিং"

জিনিষপত্র রাখিবার তাক্ (racks), ঝুড়ি, চালনী, এবং তার ও হাল্কা ধাতব পাত্রের উপর এই ভাবে রবারের "কলাই" করিয়া ব্যবহার খুব প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

রবার নির্য্যাস লাগাইয়া বস্ত্রাদি ব্যবহার দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আজ তাহা নূতন আকারে আবির্ভূত হইয়া মানবের বহু কাজে লাগিতেছে। বর্ত্তমানে রবার নির্য্যাস এবং তন্তু এমন ভাবে মিশাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে যে, একটী অপরটীর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া যায়, এবং কাহারও আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। ইহাদ্বারা বহুবিধ দ্রব্যাদি তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে।

নির্য্যাসলিপ্ত তন্তু

সাধারণতঃ নির্য্যাসলিপ্ত দ্রব্যাদির মধ্য দিয়া বায়ু চলাচলের কোনও সম্ভাবনা না থাকায়, তাহা ব্যবহারে বহু অসুবিধা হইতে থাকে। সে কারণে রবার নির্য্যাস ঘন বা জমাট বাঁধিবার পূর্ব্বে তাহার মধ্য দিয়া এ্যাসোটিক এ্যাসিডের বাষ্প চালাইয়া দিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া লওয়া হয়। এই চাদর হইতে কর্সেট (corset) প্রভৃতি, ব্যাণ্ডেজ বা বন্ধনী, জুতার ভিতরের আস্তরণ

সছিদ্র চাদর

(linings) এবং প্রয়োজনমত সাঁতার দিবার পোষাক পর্য্যন্ত তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

বয়ন শিল্পে আজকাল রবারের নির্য্যাস প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। মূল তন্তুকে নির্য্যাস লিপ্ত করিতে পারিলে, তাহা কতক পরিমাণে অনার্দ্রতা-শক্তি লাভ করে। সেই কারণে মাছধরা জালে, পাটের থলিতে, সরিষা, সার এবং সিমেণ্টের বস্তায় নির্য্যাস লাগাইতে পারিলে বহু উপকার হয়। ইহাতে যে বস্তা বা থলে কেবল অনার্দ্র থাকে তাহা নহে, আধারের বস্তুগুলি ধূলা এবং স্বাভাবিক তাপ, আর্দ্রবাষ্প প্রভৃতি হইতে রক্ষা পায়।

বয়ন শিল্পে নির্য্যাস

আজকাল টায়ার তৈয়ারী করিতে যে সূতা, সূতালি বা অন্য প্রকার তন্তু ব্যবহার হয়, পূর্ব্ব হইতেই উহা রবার লিপ্ত করিয়া তাহার পর বয়নের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ, যে সকল দড়িদড়া জলে ব্যবহৃত হয়, তাহারও সূক্ষ্ম তন্তুগুলিতে আঠা লাগাইয়া লইলে সেই দড়ি বিশেষ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

আঠা হইতে "স্পঞ্জ" রবার তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে। স্থিতি-স্থাপক বা সঙ্কোচন ও সম্প্রাসারণ ক্ষমতাযুক্ত রবারের মধ্যে স্পঞ্জের ন্যায় বায়ুকোষ থাকাতে ইহা অতিশয় কার্য্যকরী বস্তু হইয়াছে। স্পঞ্জ রবার তৈয়ারী করিতে রবার নির্য্যাস, ঘনীভূত রবার এবং পরিত্যক্ত বা চূর্ণিত রবার মিলাইয়া গন্ধক প্রভৃতি দিয়া তাপযোগে ঘন আঠাল বস্তুতে পরিণত করিবার সময় অ্যামোনিয়া (ammonia) বা অন্যান্য বস্তু দেওয়া হয়। এই অ্যামোনিয়া হইতে বাষ্প নির্গত হইয়া গলিত রবারের মধ্যে বায়ুপূর্ণ কোষসকল (latex foam) সৃষ্টি করে এবং সমস্ত পিণ্ডকে স্পঞ্জের আকার দান করে। এই প্রথাই যে সর্ব্বত্র পালিত হয় তাহা নহে, প্রয়োজনভেদে ইহার নানারূপ তারতম্য হইয়া থাকে।

"স্পঞ্জ"

প্রসাধনের "জালি" (সাবান মাখিবার জন্য), কেদারা, গদি, টালি, মেঝেতে পাতিবার "গালিচা" প্রভৃতি নানাপ্রকার বস্তু প্রস্তুত করিতে স্পঞ্জ ব্যবহৃত হইতেছে। বসিবার আসন (seat), শুশ্রূষাবাসের আরামদায়ক বিছানা, বল প্রভৃতি সবই এখন স্পঞ্জ রবার হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

ঢালাই পাত্রাদি, ঘোড়ার লোম বা বালামচি সহযোগে প্রস্তুত দৃঢ় চাদর (sheet), উন্নত প্রণালীর রঙ ও বার্ণিশ, ধাতুর সহিত জোড়াই করিবার আঠা (adhesives), অনার্দ্রতাশক্তি সম্পন্ন কৃত্রিম চামড়া প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য, উন্নত এবং বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন কাগজ প্রস্তুত করিতে এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়োজনীয় বহু কাজে আজ রবার নির্য্যাসের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে ; সে তালিকা দিতে গেলে উহা সম্পূর্ণ করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।*

রবারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া আজ সকল দেশই রবার জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জলহাওয়ার গুণে সকল দেশে গাছ জন্মানো সম্ভব হয় নাই, সে কারণে নানা প্রকার দ্রব্যাদির সংযোগে যৌগিক রবার তৈয়ারী করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা সফল হইয়াছে। এইরূপ রবার করিতে খরচ কিছু বেশী পড়িয়া যায়, তাহাতে অসুবিধা। কিন্তু যখন রবার পাইবার কোনও উপায় থাকে না, সে সকল দিনের কথা ভাবিয়া যৌগিক রবার তৈয়ারীর চেষ্টা চলিতেছে।

কৃত্রিম রবার

Oil rubber, factis, (brown substitute), white or red

* Brake linings, grinding wheels (শাণ দিবার "পাথর"), fibre insulating panels, can sealing compounds, leather substitute made by the impregnation of paper "given attractively coloured nitrocellulose finishes and used in the manufacture of belts, handbag, cuffs, dress facings", etc.

substitute, "Elastes", "Duprene", প্রভৃতি নানা নামে যৌগিক রবার প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ভূট্টার পরিত্যক্ত অংশ, ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ডাঃ মাউরির (Dr. Mauri) মতে টোমাটোর খোসা হইতে, সুইজারলণ্ডের বৈজ্ঞানিকের মতে নানাবিধ সহজলভ্য সস্তা দ্রব্যাদি হইতে "রবার" তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে ; কিন্তু ইহার সকলগুলিই যে শেষ পর্য্যন্ত সফল হইবে তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। কিন্তু রুশ গণতন্ত্র, জার্ম্মাণী প্রভৃতি অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জার্ম্মাণীতে বুনা (Buna) নামে পরিচিত যৌগিক রবার প্রতি বৎসর ২০ হইতে ২৫ হাজার টন পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইতেছে। ১৯৩১ সালে রুশ রাজ্যে যৌগিক রবার প্রথম তৈয়ারী হইয়াছে। বর্ত্তমানে আন্দাজ ৫০ হাজার টন * ঐ জাতীয় রবার জন্মিতেছে। আমেরিকার পুরাতন পরিত্যক্ত রবার ফেলিয়া দেওয়া হয় না ; উহা হইতে ১৯৩৮ সালে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টন "রবার' পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে, সুতরাং প্রাকৃতিক রবারের সমূহ বিপদ উপস্থিত।

ভারতবর্ষের সুবিধা এই, এখানে প্রচুর রবার রহিয়াছে। এবং "সভ্য" দেশে জন প্রতি যে পরিমাণ রবারের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, এখানে তাহার এখনও কিছুই হয় নাই রবার রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ; কিন্তু নিজ দেশের মধ্যে ব্যবহারের কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সে কারণে দেশের মধ্যে যতই শিল্প বাড়িয়া উঠে ততই মঙ্গল।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত রবার উৎপন্ন হওয়াতে রবারের দাম অতিরিক্ত মাত্রায় হ্রাস পাইতে থাকে ; তজ্জন্য, সকল উৎপাদনকারী দেশ মিলিত হইয়া তাহাদের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিতে সম্মত হয় (International Rubber Regulation Com-

নিয়ন্ত্রণ

* Statistical Year Book of the League of Nations 1938/39

mittee) এবং ১৯৩৪ সালের ১ জুন হইতে ভারতবর্ষ এই সমিতিতে যোগদান করে (Indian Rubber Control Act, 1934)। এই সর্ত্তানুযায়ী অন্যান্য দেশের ন্যায় উক্ত সমিতির অনুমতি ব্যতীত ভারতবর্ষ রবার রপ্তানী করিতে পারে না। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত এই রপ্তানীর পরিমাণ আপোষে স্থির হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ১৭,৫০০ টন রবার রপ্তানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের জন্য ষ্ট্রেটস্ সেটুলমেণ্টস্ ও সম্মিলিত মালয় দেশগুলি (F. M. S., U. M. S. & Brunei) হইতে ৬,৪২,৫০০ টন রবার রপ্তানীর অনুমতি আছে। সিংহল, ব্রহ্ম, উত্তর বোর্ণিও, সার্‌ওয়াক, শ্যাম প্রভৃতি দেশের ও রপ্তানীর অংশ নির্দ্ধারিত হইয়া মোট ১৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৫০ টন রবার রপ্তানী হইতে পারিবে। ফরাসী ইন্দোচীন ৩০,০০০ টন পর্য্যন্ত বিনা বাধায় রপ্তানী করিতে পারে; তাহার উপর ৬০ হাজার টন পর্য্যন্ত রবার রপ্তানী করিতে হইলে আন্তর্জাতিক মহাসমিতির অনুমতি প্রয়োজন। পরিশিষ্টে (ঝ) ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত সমিতিভুক্ত দেশগুলি প্রতি বৎসরে রপ্তানীর অংশ দেওয়া হইল।

ভারতবর্ষে রবারজাত দ্রব্যাদির এখনও বহু প্রয়োজন আছে এবং দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী শিল্প গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন সমূহ বিপদ উপস্থিত; পূর্ব্বে বাহির হইতে আমদানী করা মালের উপর শুল্ক প্রভৃতি বসাইয়া তাহার প্রসার বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব ছিল; কিন্তু সেই সকল বিদেশী-কোম্পানীরা দেশের মধ্যে থাকিয়া কারখানা স্থাপন করিলে তাহাদের রোধ করিবার কোনও উপায় নাই। তাহাতে দেশের মধ্যে বিদেশীয়দের প্রতিযোগিতায় কতকগুলি শিল্প ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা কমিয়া গেল এবং দেশে জুতা প্রভৃতি যাহা তৈয়ারী হইতে ছিল, তাহা লয় হইতে বসিয়াছে।

পরিশিষ্ট

(ক)

প্রতিদেশ হইতে রপ্তানীকৃত রবারের পরিমাণ

(১৯৩৪—১৯৩৮)

হাজার (মেট্রিক) (metric) টন

	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
মালয়	৪৭৫	৪২৪	৩৫৯	৪৭৭	৩৭৮
ওলন্দাজ অধিকৃত					
ভারত দ্বীপপুঞ্জ	৩৮৫	২৮৭	৩১৫	৪৩৯	৩০৩
সিংহল	৮০	৫৫	৫০	৭২	৬০
ফরাসী ইন্দোচীন	২০	২৯	৪১	৪৪	৫৯
শ্যাম	১৮	২৯	৩৫	৩৬	৪২
উত্তর বোর্ণিও	২৯	২৯	৩০	৪০	২৮
ভারতবর্ষ	১৩	১৪	১৫	১০	৯
ব্রহ্ম	৫	৫	৬	৭	৭
অপরাপর—					
মোট	১০,৩৩	৮,৮৮	৮,৭২,	১১,৫৮	৯,১৯

(খ)

পৃথিবীতে রবারের আবাদী জমি ও ফলন

(১৯৩৭)

		হাজার একর		হাজার টন *
মালয় ও ব্রুণেই	...	৩২,৭৩	...	৫,০৩
সিংহল	...	৬,০৫	...	৭২
সারওয়াক	...	২,১৬	...	—
ভারতবর্ষ	...	১,২৮	...	১৫

* শুষ্ক রবার।

(অনুসৃত)	হাজার একর	হাজার টন
ব্রহ্ম	১,০৪	১১
উত্তর বোর্ণিয়ো	১,২৭	৩৮†
ভারত দ্বীপপুঞ্জ (ওলন্দাজ)	১৪,৯৪	৪,৫১
ইন্দোচীন	৩,১৪	৪৮
শ্যাম	৩,১২	৩৬
মোট	—	১২,০২

† সারওয়াকের রপ্তানীর সহিত সম্মিলিত পরিমাণ।

(গ)

ভারতে আবাদী জমি, ফলন ও প্রতি প্রদেশের অংশ

(১৯৩৭)

মোট জমি	১,২৫,১০০ একর		
ব্রিটিশ ভারত	১৭,৩০০	,,	১৩.৬
করদ রাজ্য	১,০৭,৮০০	,,	৮৫.৫%
মোট ফলন	৩,২২,৬৩,৫০০ পাউণ্ড		
ব্রিটিশ ভারত	৪২,২৪,৩০০	,,	১৩.০%
করদ রাজ্য	২,৮০,৪২,২০০	,,	৮৬.৮%

	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার পাউণ্ড	শতকরা অংশ
ব্রিটিশ ভারত				
মদ্র	১৪.১	১১.২	৩৪,৫৩.৮	১০.৭
কুর্গ	৩.২	২.৪	৭,৭০.৫	২.৩
করদ রাজ্য				
ত্রিবাঙ্কুর	৯৭.৬	১১.২	২,৫১,৩৯.৫	৭৭.৯
কোচিন	৯.৫	৭.৬	২৮,৮৯.৭	৯.৯
মহীশূর	.৭	.৬	১৩.০	—

(ঘ)

রপ্তানী—কাঁচা (শুষ্ক) রবার

১৯০৩-০৪ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

		হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা
১৯০৩-০৪	...	২,০১	...	৩,৪৭
১৯০৬-০৭	...	৫,০২	...	১১,১৮
১৯১০-১১	...	৬,৫৫	...	১৫,৯৭
১৯১১-১২	...	১০,০৩	...	৩৪,৫৯
১৯১৩-১৪	...	১৬,৩১	...	৫৯,২০
১৯১৪-১৫	...	২৬,০৬	...	৭৮,৬৭
১৯১৫-১৬	...	৫২,৭৪	...	১,২৬,৬৭
১৯১৬-১৭	...	৭৫,৪১	...	১,৫৮,১৬
১৯১৮-১৯	...	১,৩৯,৬৯	...	২,৫০,৩১
১৯২১-২২	...	১,১০,১৫	...	৭৭,১৬
১৯২২-২৩	...	১,২৪,৯৯	...	৭২,৫০
১৯২৩-২৪	...	১,৫৪,২৩	...	১,১৪,৪৬
১৯২৫-২৬	...	২,২৪,১১	...	২,৯৪,১০
১৯২৬-২৭	...	২,৩০,০৬	...	২,৬০,১৪
১৯২৭-২৮	...	২,৫৪,০৩	...	২,৫৭,০৯
১৯২৮-২৯	...	২,৫৮,২৪	...	১,৯৯,৮৫
১৯৩০-৩১	...	২,৩৩,২৭	...	১,২৯,৭৫
১৯৩১-৩২	...	১,৫১,০৫	...	৪৪,৫৮
১৯৩২-৩৩	...	৬৯,০৪	...	৮,৭৮
১৯৩৩-৩৪	...	১,৬২,০৬	...	৩১,১৮
২৯৩৪-৩৫	.	২,৩৭,৫৭	...	৬৫,৮৯
১৯৩৫-৩৬	..	৩,০৬,৪৮	...	৮৮,৭১
১৯৩৬-৩৭	...	২,৭৯,৪৩	...	১,০৪,০৩
১৯৩৭-৩৮	...	১,৭৭,৫৫	...	৮৩,৮৩
১৯৩৮-৩৯	...	১,৭২,১৮	...	৭১,৫৮

(ঙ)

রপ্তানী—কাঁচা রবার—ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৮-৩৯)

পরিমাণ— ১,৭২,১৮,২১২ পাউণ্ড

মূল্য— ৭১,৫৭,৮০৫ টাকা

	হাজার পাউণ্ড		হাজার টাকা		শতকরা অংশ
ব্রিটেন	৮২,৩২	...	৩৫,৯৫	...	৫০.২
আমেরিকা	২৮,৯২	...	১১,১৩	...	১৫.৫
জার্ম্মাণী	২১,৫৫	...	৮,১১	...	১১.৩
সিংহল	১৭,৭৮	...	৮,১৮	...	১১.৪
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৪,৯৪	...	৫,৫৪	...	৭.৭
ইটালী ও অপরাপর	—	...	—	...	—

(চ)

রপ্তানী—রবারজাত দ্রব্যাদি—তিন বৎসরের হিসাব

১৯৩৬-৩৭	...	৪,০৭৩ টাকা
১৯৩৭-৩৮	...	২,২৯,৪৪২ ,,
১৯৩৮-৩৯	...	৩,৬৯,৬৮৩ ,,

(ছ)

আমদানী—রবারজাত দ্রব্যাদি

১৮৭৬-৭৭ হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

		হাজার টাকা
১৮৭৬-৭৭	...	১,২৭*
১৯০০-০১	...	৬,০৬*
১৯০৬-০৭	...	১০,০৭*

* রবার এবং রবারজাত দ্রব্যাদির মূল্য।

(অনুসৃত)

		হাজার টাকা
১৯০৯-১০	...	১১,৪৮
১৯১৪-১৫	...	৫৭,৩০
১৯১৭-১৮	...	১,১৫,৭৮
১৯১৯-২০	...	১,৬৬,৬০
১৯২৪-২৫	...	১,৫৪,৯৭
১৯২৫-২৬	...	২,১৬,৫০
১৯২৮-২৯	...	২,৮৫,৮৬
১৯২৯-৩০	...	৩,৩০,১৩
১৯৩৩-৩৪	...	১,৮৭,৫৯
১৯৩৪-৩৫	...	২,০৫,৮২
১৯৩৫-৩৬	...	২,০৬,৮৫
১৯৩৬-৩৭	...	২,১১,২৫
১৯৩৭-৩৮	...	১,৮৮,৯৯
১৯৩৮-৩৯	...	১,৪০,৫৬

(জ)

আমদানী রবারজাত দ্রব্যাদি—বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

		টাকা		শতকরা অংশ
ব্রিটেন	...	১,১৭,২২	...	৬২·৫
জার্ম্মাণী	...	১৫,০০	...	১৮·৫
আমেরিকা	...	৩১,৬৩	...	১১·৪
জাপান	...	১৭,৫২	...	৯·২
কানাডা	...	২,৯৬	...	১·৫

চেকোশ্লোভাকিয়া (?), ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি।

(ঝ)

বিভিন্ন দেশ হইতে রবার রপ্তানীর অনুমোদিত পরিমাণ §

	১৯৩৯ হাজার টন*	১৯৪০ হাজার টন*	১৯৪১ হাজার টন*	১৯৪২ হাজার টন*	১৯৪৩ হাজার টন*
ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্, মালয় † ও ব্রণেই	৬৩২'০	৬৪২'৫	৬৪৮'০	৬৫১'০	৬৫১'৫
ভারত দ্বীপপুঞ্জ (নেদারল্যাণ্ড)	৬৩১'৫	৬৫০'০	৬৪৫'৫	৬৫০'০	৬৫১'০
সিংহল	১০৬'০	১০৭'৫	১০৯'০	১০৯'৫	১১০'০
ভারতবর্ষ	১৭'৫	১৭'৮	১৭'৮	১৭'৮	১৭'৮
ব্রহ্ম	১৩'৫	১৩'৮	১৩'৮	১৩'৮	১৩'৮
উত্তর বোর্ণিও ষ্টেট	২১'০	২১'০	২১'০	২১'০	২১'০
সারওয়াক	৪৩'০	৪৩'৮	৪৪'০	৪৪'০	৪৪'০
শ্যাম	৫৪'৫	৫৫'৩	৫৫'৭	৫৬'০	৬০'০
মোট	১৫,১৯'০	১৫,৪১'৬	১৫,৫৪'৭	১৫,৬৩'০	১৫,৬৯'০

ভ্রম সংশোধন—পরিশিষ্ট (ঘ—২৫৬ পৃষ্ঠা) ১৯১৩-১৪ স্থলে ১৯১২-১৩ এবং ১৯১৪-১৫ স্থলে ১৯১৩-১৪ হইবে, ১৯৩৬-৩৭ সালের রবারের পরিমাণ ২,৭৯,৪১ স্থলে ২,৮৯,৪১ হইবে। ২৪৩ পৃষ্ঠা—৮ম লাইন—৩৭ লক্ষ স্থলে ৩০ লক্ষ এবং ২৪২ পৃষ্ঠা—৪র্থ লাইন—১৯১৩-১৪ স্থলে ১৯১২-১৩ হইবে।

§ Basic quotas for each territory or group of territories for the control year specified. No basic quota has been allotted to French Indo-China and no restriction is placed on exports from this country, excep tthat, part of any exports in excess of 30,000 tons a year (increased to 60,000 tons a year during the year 1939 to 1943) is to be delivered to the **International Rubber Regulation Committee.**

* Long tons.

† U. M. S., F. M. S.

ইক্ষু বা আক (Sugarcane)

কেবল ভারতের কেন, কোনও জাতির বহির্ব্বাণিজ্যে ইক্ষুর সামান্য স্থানও নাই। কিন্তু ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত শর্করা বা চিনি জগতের বাজারে এক মূল্যবান্ পণ্য।

ভারতবাসীর দুর্নাম আছে, তাহারা বিদেশীয়দের সহিত বাণিজ্য, বিশেষতঃ কারখানা বা বৃহদাকার শিল্পে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। তাহারা কাঁচা মাল সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত বা ক্ষান্ত আর বিদেশী তাহা হইতে যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিবে, তাহা দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হইবে। একথা আমরা বিদেশী সাহিত্য পড়িয়া এবং বিদেশী বুলি শুনিয়া শিখিয়াছি; তাহা না হইলে ইহার মূলে বিশেষ সত্য নাই। এই চিনির কারখানা এবং বাণিজ্য হইতেই তাহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কার্পাস, লৌহ, সিমেণ্ট প্রভৃতি যে কয়টী শিল্পে ভারতবাসী তাহার কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, শর্করা শিল্প তাহার অন্যতম। যথাস্থানে এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইবে। এক সময় ভারতের বিরাট বহির্ব্বাণিজ্য ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পরে সামান্যমাত্র রক্ষণ শুল্কের সহায়তা পাইয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশীয় মিলগুলি ভারতবর্ষের চিনির মোট চাহিদা অপেক্ষা অধিক চিনি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন সে পুনরায় চিনি বাহিরে বিক্রয় করিতে সমর্থ, কিন্তু অপরের স্বার্থহানি হইবে বলিয়া তাহাতে নানা বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করা হইতেছে।

ভারতবর্ষই যে ইক্ষুর আদি জন্মস্থান তাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। "দানা" চিনি ভারতবর্ষেই প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই বিদ্যা পরে

নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারত হইতে চীন এবং চীন হইতে ভারত—এই ভাবেই ইক্ষু ও চিনি সম্বন্ধীয় জ্ঞান দুই দেশের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। পশ্চিমে, প্রথম পারস্য এবং আরব এবং আরববাসী কর্তৃক মধ্যযুগে সিসিলি, সাইপ্রাস, স্পেন, ইটালী প্রভৃতি দেশে ইক্ষুর জ্ঞান প্রচারিত হয়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ব্রেজিলে এবং সেখান হইতে পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষু প্রবেশলাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর আগমন খুব বেশী দিনের নহে।

উৎপত্তি

পৃথিবীতে নানা প্রকার উদ্ভিদ হইতে চিনি বা মিষ্ট স্বাদযুক্ত বস্তু পাওয়া গিয়া থাকে। ইক্ষুর পরই বীট-এর স্থান। এক সময় বীটের উপদ্রবে আকের চিনি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আজও সে বিপদ সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই। তৃতীয় স্থান খর্জ্জুর বা খেজুর গাছকে দেওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে খেজুরে-গুড় বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, এবং চিনি জাতীয় বস্তু উৎপাদনে জগতের মধ্যে এই কারণেও ভারতের স্থান প্রথম। আমেরিকার মেপ্‌ল্ (maple) বৃক্ষ হইতে ও অনেক চিনি তৈয়ারী হয়। ভারতের তাল, নারিকেল, সিংহল প্রভৃতি স্থানের এক প্রকার সাগু গাছ হইতে গুড় জাতীয় মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইক্ষুর স্থান ইহাদের সকলের উপর।

ইক্ষুর প্রাধান্য

উষ্ণ প্রধান দেশে প্রচুর জলের সুযোগ থাকিলে ঐ সকল স্থান আক চাষের পক্ষে প্রশস্ত। জমিতে খুব ভাল করিয়া সার দেওয়া দরকার। সাধারণতঃ আকের মাথার পত্রযুক্ত অংশ কাটিয়া বা আক ২।৩ পাব বা গাঁইট রাখিয়া ভিজা স্থানে পুতিয়া রাখে। তাহা হইতে পাতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় বাহির হয়। ভাদ্র আশ্বিন হইতে ফাল্গুন চৈত্র পর্য্যন্ত আক চাষ করা চলে। কিন্তু কার্ত্তিক

চাষ

অগ্রহায়ণ মাসই চাষের পক্ষে প্রশস্ত সময়। মাটী ভাল করিয়া কর্ষণ করিবার পর সাধারণতঃ সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। আন্দাজ তিন চার ফুট অন্তর নালী কাটিয়া তাহাতে ছয় ইঞ্চি হইতে নয় ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে আকের খাদি বা পাবগুলি বসাইয়া দিতে হয়। এই সময় আর একবার অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি সার দিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার পর হইতে নালীর মধ্যে সেচ দেয়। প্রত্যেক সেচের পর গাছের মুলে মাটী দিয়া ভরাট করে এবং আগাছা প্রভৃতি দূর করিয়া তলা নিড়াইয়া দেয়। গাছগুলি কতক দূর বৃদ্ধি পাইবার পর উহারই পাতা দিয়া এক একটী ঝাড় জড়াইয়া দিয়া সরল বা সমানভাবে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ করিয়া দেয়। গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া, পুরাতন পাতাগুলি শুকাইয়া উঠিলে আক কাটিবার সময় উপস্থিত হয়। পৌষ ও মাঘ মাসে আক কাটা আরম্ভ হয়। সকল দেশে একই নিয়ম পালিত হয় না বা একই সময় আক রোপণ করা হয় না, তাহা বলা বাহুল্য।

চিরকালই আকের খাদি বা টুকরা হইতে আক উৎপাদন করা হয় এবং তাহাই প্রায় সকল দেশের প্রচলিত রীতি। কিন্তু আকের বীজ

ইক্ষু বীজ

হইতে গাছ উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে পরিপুষ্ট আকের শীর্ষে কাশ ফুলের মত দীর্ঘ বোঁটার (arrow) গায় সাদা রঙের ফুল ফোটে। উহা হইতে অনেক চেষ্টায় বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে। বীজগুলি দেখিতে অতিশয় ক্ষুদ্রাকার। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বীজগুলি সংগ্রহ করা হইতে পুনরায় অঙ্কুরিত হইবার মধ্যে ছয় সপ্তাহের অধিক সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সাধারণতঃ তাহার পরই তাহাদের অঙ্কুরিত হইবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে মনে করেন, গাঁইট হইতে উৎপন্ন ইক্ষু অপেক্ষা, বীজ হইতে প্রাপ্ত ইক্ষুর রোগপ্রবণতা অনেক কম।

নানা দেশে জমির উর্ব্বরাশক্তি, জলহাওয়ার গুণ এবং চাষীর জ্ঞানের উপর ফলনের তারতম্য নির্ভর করে। ভারতবর্ষে যে সরকারী হিসাব রাখা হয়, তাহাতে দেশে উৎপন্ন সমস্ত গুড়ের পরিমাণ দিয়া আকের ফলনের হিসাব ধরা হয়। সাধারণের পক্ষে ইহা অতি অসুবিধার কথা। মোটের উপর প্রতি একরে সাড়ে চার হইতে পাঁচ শত মণ আক জন্মে বলিয়া আন্দাজ করা যাইতে পারে। কখনও কখনও ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী ফলিতে দেখা যায়। তাহার শতকরা ৫৫ হইতে ৬০ ভাগ বা ততোধিক রস পাওয়া যায়। এবং একর-প্রতি ৩৫ হইতে ৪০ মণ গুড় পাওয়া যায় বলিয়া হিসাব করে। গুড়ের শতকরা ৬০ ভাগ চিনি পাওয়া যায় মনে করিয়া জগতের বাজারে সমস্ত গুড়কে চিনিতে পরিণত করিয়া হিসাব রাখা হয়।*

ফলন

মোটামুটী সহজ হিসাবে দেখা যায় যে, এক একরে ৪৫০-৫০০ মণ আক হইলে, তাহা হইতে ২৫০-৩০০ মণ রস, ৪০-৪৫ মণ গুড়, ২৭-২৮ মণ বিশুদ্ধীকৃত (refined) চিনি এবং ১৮-১৯ মণ দানা (crystallised) চিনি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে আকের ওজনের ১১.২% পর্য্যন্ত চিনি উদ্ধার হইয়াছে; (বোম্বাই ১৯৩৮-৩৯)।

দেশ ভেদে ইহার নানা তারতম্য আছে। ১৯২১ সালে ভারতীয় শর্করা সমিতি (Indian Sugar Committee)র হিসাবে ভারতবর্ষে প্রতি একরে ১.০৭ টন, কিউবায় ১.৯৬ টন, যবদ্বীপে ৪.১২ টন এবং হাওয়াইয়েতে ৪.৬১ টন চিনি পাওয়া যায় বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছিল। আকের হিসাবে যবদ্বীপে প্রতি একরে ৩৬ টন, হাওয়াই বা স্যাণ্ডউইচ

* According to Leather "a good cane is one which yields 70 per cent. of juice in the mill, afford 15 per cent, or more of cane sugar, and possesses not more than 17 per cent. of glucose."

দ্বীপপুঞ্জে ৩৩'৪, মিসরে ২২, কুইন্সল্যাণ্ডে ১৬ এবং জাপানে ১২ টন করিয়া ধরে।

আকারে ও গুণে আকের বিভিন্নতা বহু প্রকারের। কেহ দেখিতে অতি ক্ষীণ, কেহ বা ক্ষুদ্রাকৃতি বাঁশের মত; কোনওগুলি ১০-১১ মাসে পুষ্ট হয়, যথা হাওয়াই ও ভারতবর্ষ। কোথাও বা (যবদ্বীপ, কুইন্সল্যাণ্ড) ১৫-১৬ মাস লাগে। যতই অনুসন্ধান করা যায়, ততই ইহার পার্থক্য লক্ষিত হয়। কতকগুলি নরম এবং তাহাতে রস বেশী, সুতরাং চর্ব্বণের পক্ষে সুবিধা (১), কতকগুলির আবরণ কঠিন এবং শৃগাল প্রভৃতি পশুর উপদ্রব হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত (২); আবার কতগুলি গভীর জলে চাষ হয় (৩)। এইপ্রকার বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন নানারকমের আক দেখিতে পাওয়া যায়।

জাতির বিভিন্নতা

সাধারণ চাষের পক্ষে সামসাড়া ও ধলসুন্দর প্রভৃতি আকই সুবিধাজনক। বোম্বাই আকের রস বেশী, গুড়ের রঙ কালো হইলেও উহা হইতে বড় দানা পাওয়া যায়। উক্ ও গন্না (মাদ্রাজী), পাউণ্ডা বা পউণ্ডা আক যুক্তপ্রদেশে, ভুলি মঙ্গো প্রভৃতি বিহারের কতকাংশে এবং উরি ও সামসাড়া পশ্চিমবঙ্গে বেশী জন্মিয়া থাকে। সাহারাণপুর, মঙ্গো, মালোহি, বাগদিয়া, বাঘী প্রভৃতি নানা রকমের আক ভারতে জন্মিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে ভারতে অন্ততঃ ৮০ প্রকার আক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সকলের নামও উল্লেখযোগ্য নহে।

(১) সামসাড়া, চাটগাঁ, পাটনাই ও বগুড়া, খুলনা ও ঢাকার প্রকাণ্ড আক, পাটনা ভাগলপুরের চিনিয়া বা চিনি প্রভৃতি।

(২) বোম্বাই, খাড়ি, কাজলী, পুরী, কাটারী প্রভৃতি।

(৩) কুলেরা বা জলী (জালি) প্রভৃতি।

ভারতের পক্ষে যবদ্বীপের "বীজ" ভাল বলিয়া মনে হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে কইম্বাটুরের আক বিশেষ উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং ভারতের নানা অংশে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। কইম্বাটুরের ২২১ ও ২১৩নং আক চাষে অনেক কম পরিমাণ সেচ প্রয়োজন হয় এবং ইহা হইতে চিনির পরিমাণও খুব বেশী পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই জাতীয় আক অধিক মাত্রায় প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভারতের চাষীর বহু লাভ হইয়াছে।

পৃথিবীতে আক চাষ

পৃথিবীতে আক ও বীট চাষের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব গিয়াছে, এবং আকের নিকট বীটের পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এমন সময় ছিল যখন লোকে মনে করিত বীটের চিনিই জগতের সমস্ত অভাব দূর করিবে। প্রকৃতপক্ষে ফল সেরূপ হয় নাই। বর্ত্তমানে বীটের চিনির বিশেষ রপ্তানী নাই। যে দেশে যত পরিমাণ এই চিনি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায় সেই দেশের লোকেই ব্যবহার করিয়া ফেলে। সুতরাং জগতের বাজারে যে চিনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা প্রধানতঃ ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত। আক চাষে ভারতের স্থান প্রথম এবং মোট মিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনেও তাহার স্থান সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু জমির অনুপাতে অন্যান্য অনেক দেশে বেশী চিনি জন্মে। ভারতবর্ষের পরেই কিউবার স্থান। জমির পরিমাণ ভারতবর্ষ হইতে অনেক কম হইলেও অনুপাতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ খুব বেশী (২৬ লক্ষ টন refined চিনি)। যবদ্বীপ ও ব্রেজিলের মধ্যে তৃতীয় স্থান লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। ফরমোসা, অষ্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, হাওয়াই, পুয়ারটো রিকো, মরিসস্, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য, পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জ (ব্রিটিশ), মেক্সিকো, আর্জ্জেণ্টাইন, পেরু, জাপান, ফিজি প্রভৃতি বহু দেশে চিনি জন্মে। এইভাবে উৎপন্ন চিনির (refined)

পরিমাণ* আনুমানিক ১ কোটী ৯০ লক্ষ টন; পরিশিষ্ট (ক)। ইহা ছাড়া জগতে কমবেশী ১ কোটি টন বীটের চিনি উৎপন্ন হয়। বীট চিনি উৎপাদনে রুশ গণতন্ত্র, জার্ম্মাণী (অষ্ট্রিয়া সমেত), আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্থান যথাক্রমে প্রথম হইতে চতুর্থ। ইটালী, পোলণ্ড, ইংলণ্ড, সুইডেন, পূর্ব্বতন চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশও বহু পরিমাণ বীটের চিনি উৎপন্ন করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চিনি উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রধান, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে উৎপন্ন আকের পরিমাণের হিসাব না রাখিয়া মোট গুড়ের পরিমাণ দিয়া ভারতের আক ও চিনির হিসাব রাখা হয়। জগতের হিসাবে ভারতের গুড়ের শতকরা ৬০ ভাগ সুপরিষ্কৃত চিনি ধরিয়া লওয়া হয়।

ভারতবর্ষে কমবেশ ৪০ লক্ষ একর জমিতে চাষ হইয়া ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ টন কাঁচা গুড় উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাবে ভারতের

ভারতের চাষ ও ফলন

সমস্ত জমির শতকরা ৯৫.২ এবং ফলনের (গুড়ের পরিমাণের) ৯৪.৩ ব্রিটিশ-ভারতে পড়ে। এই বৎসর জমির অনুপাতে ফলন কিছু কম হইয়াছে। তাহার কারণ পঞ্চনদে সমস্ত জমির পরিমাণের ১৩.৪% পড়ে কিন্তু গুড়ের হিসাবে মাত্র ৬.৮%। তাহা না হইলে ব্রিটিশ ভারতে জমির অনুপাতে ফলনের পরিমাণ করদরাজ্য অপেক্ষা অনেক বেশী; পরিশিষ্ট (খ)।

প্রদেশ হিসাবে যুক্তপ্রদেশের স্থান সর্ব্বপ্রধান। ভারতের সমস্ত জমির এবং ফলনের অর্দ্ধেকেরও উপর উক্ত প্রদেশে পড়ে, অর্থাৎ

* Willet & Gray কোম্পানীর হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সালে আকের চিনির পরিমাণ ১ কোটী ৮৭ লক্ষ টন এবং বীটের চিনি ১ কোটী ৩ লক্ষ টন এবং সর্ব্বপ্রকারে কমবেশ ৩ কোটী টন চিনি জন্মে। ঐ বৎসর আমেরিকায় ১৫ লক্ষ টন বীটের চিনি হইয়াছিল।

(১৯৩৭-৩৮) সওয়া ৪৮ লক্ষ একরের মধ্যে সওয়া ২১ লক্ষ (৫৫'৭%); আর গুড় হিসাবে ৫৩ লক্ষ টনের মধ্যে ৩১ লক্ষ টন (৫৮'৪%)। জমি হিসাবে পঞ্চনদের স্থান দ্বিতীয়, কিন্তু ফলনের হিসাবে বাঙ্গলা ও বিহারের মধ্যে ঐ স্থান লইয়া দ্বন্দ্ব আছে। জমি হিসাবে বিহারের স্থান তৃতীয় (৯'০%); কিন্তু গুড়ের সরকারী হিসাবে বাঙ্গলার অংশ ৯'১% (৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টন) তখন বিহারের ৬'৭% (৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টন)। যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ, বাঙ্গলা ও বিহার বাদ দিলে অন্ত প্রদেশগুলির চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে; পরিশিষ্ট (খ)।

প্রতি প্রদেশের চাষ

করদরাজ্যগুলির মধ্যে বোম্বাই অন্তর্গত রাজ্যগুলির কিছু পরিচয় আছে। অপরগুলির মধ্যে এক হায়দরাবাদের কথা উল্লেখ করা চলে; পরিশিষ্ট (খ)।

যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চাষ হয়। উহার মধ্যে, জেলা হিসাবে গোরক্ষপুর প্রধান (২,৭৭,০০০ একর)। তাহার পরে পরে, মীরাট (১,৭৪,০০০ একর), মজঃফরপুর (১,৩০,০০০ একর), বেরিলী (১,২৩,০০০ একর), খেরী, মোরাদাবাদ, সাহারাণপুর, সীতাপুর, বিজনৌর, বস্তি প্রভৃতি সকল জেলায় এক লক্ষ একরের উপর আবাদী জমি পড়ে। তাহা ছাড়া আজমগড়, গণ্ডা, বুলন্দসর, সাহজাহানপুর, পিলিভিট্, হরদই, বড়বাঁকি, বুদাওন প্রভৃতি সকল জেলাতেই ৫০ হাজার একরের উপর আবাদী জমি আছে।

জেলা পরিচয়

বিহারের মধ্যে চম্পারণ (৯২,০০০ একর) প্রধান। সারণ, দ্বারবঙ্গ, গয়া, মজঃফরপুর প্রতি জেলায় ৫০ হাজার একরের উপর জমি পড়ে। ইহার পর সাহাবাদ জেলার স্থান নিতান্ত মন্দ নহে।

বাঙ্গলার মধ্যে অনেক পণ্যের স্থায় ইক্ষু চাষেও ময়মনসিংহের স্থান

(৫০,০০০ একর) প্রধান। দিনাজপুরেও কোন কোনও বৎসরে ময়মনসিংহ অপেক্ষা অধিক চাষ হইয়া থাকে। বাখরগঞ্জ, ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলায় চাষের জমি ৩০ হাজার একরের অধিক।

পঞ্চনদের মধ্যে ঝঙ্গ প্রধান (১,১০,৬০০ একর) এবং তাহার পরই গুরুদাসপুর (৬৪,০০০ একর)। পরে শিয়ালকোট, লায়ালপুর, রোহতক, কর্ণাল, জলন্দর, অমৃতসহর প্রভৃতি জেলার স্থান।

মদ্রের ভিজগাপট্টম, আসামের শিবসাগর, বোম্বায়ে আহম্মদনগর ও উড়িষ্যায় কোরাপুট জেলায় চাষের পরিমাণ নিতান্ত মন্দ নয়।

চিনি প্রস্তুত

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চিনি দ্বারাই জগতের বাজারে আকের পরিচয়। আকের রস অগ্নিতে জ্বাল দিয়া জলীয়ভাগ দূর হইয়া গেলে গুড় পাওয়া যায়। এই গুড় খুব চট্‌চটে বা আঠাল হয়। তাহাতে সামান্য পরিমাণ ক্ষার পড়িলে ঐ আঠাল ভাব নষ্ট হয়। বর্ত্তমানে চিনির কলেই অধিক পরিমাণ চিনি তৈয়ারী হইতেছে। কারখানায় আক আসিয়া পৌছিবার পর চিনি তৈয়ারী পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত কাজই যন্ত্রসাহায্যে হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় আকগুলিকে আনিয়া এক চলন্ত বন্ধনীতে (endless moving belt) ফেলে; ঐ পাত্র বা বেল্ট ঘুরিবার কালে আকগুলিকে কলের ছুরির বা কর্ত্তন যন্ত্রের নিকট (automatic feeder—knives, shredders) আনিয়া উপস্থিত করে। ঐ যন্ত্রে আক টুকরা টুকরা হইয়া গেলে চর্ব্বণযন্ত্রের (crusher) মধ্যে পড়ে এবং সমস্ত রস নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়।

চর্ব্বিত আকে বা ছিবড়ায় যদি কিছু রসও অবশিষ্ট থাকে, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য ঐ ছিবড়াতে গরম্ জল দিয়া আর একবার পিষ্ট করে এবং সমস্ত মিষ্ট রস বাহির করিয়া লয়। এই রস দেখিতে গভীর হরিৎ ও পীতের সংমিশ্রণে একপ্রকার রঙ এবং ইহাতে চিনি ব্যতীত

আরও অন্যান্য* নানা প্রকার বস্তু মিশ্রিত থাকে। ইহার অনেকগুলিকেই দূর করা প্রয়োজন; সেই কারণে আকের কুচি প্রভৃতি জিনিষগুলিকে ছাঁকিয়া লইবার পরই তাহার মধ্যে albuminoidsগুলি জমাইয়া (coagulating) স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করা এবং আকের রসের মধ্যে অম্লভাগের অম্লত্ব প্রশমিত (neutralise) করিবার জন্য ক্ষার § যোগ করিয়া বদ্ধপাত্রে ভরিয়া তাপ দেয়। সমস্ত প্রকার ময়লা দূর করিবার জন্য এবং রসের মধ্যে অবস্থিত চিনি যাহাতে তাপযোগে ক্ষুদ্রভাগে † বিভক্ত হইয়া না যায় তাহার জন্য পাথুরে চূণ মিশাইয়া উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে (defecation) অম্ল জমিয়া যায় এবং রসের উপর ভাসিয়া উঠিলে তাহাকে উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়। তখন সমস্ত রসকে ছাঁকিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে (through filter bags or filter press); ছাঁকা হইবার পর ঘন এবং শুষ্ক (concentration) করিলেই চিনি প্রস্তুত হয়। ধবধবে সাদা চিনি প্রয়োজন হইলে গন্ধকের ধোঁয়া দ্বারা (sulphitation) তাহা বর্ণহীন (bleached) করিয়া লইতে হয়।

কখনও কখনও চূণ মিশ্রিত রস উত্তপ্ত করিবার সময় নলযোগে অঙ্গার বাষ্প ফুটন্ত রসের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় (carbonisation process)। ইহাতে সমস্ত চূণ জমিয়া পাত্রের তলদেশে (insoluble carbonate) পড়ে। ঐ গাঢ় রস বায়ুশূন্য (vacaum pans) পাত্রে আসিয়া পুনরায়

* The juice is now dark greenish yellow and contains 12 to 16% dissolved surcose, small percentage of glucose, fructose, organic acid, colouring matters, nitrogen compounds, pectin, gum, mineral matter, etc.

§ Milk of lime or quick lime (in the form of cream).

† "Surcose decomposes on heating acid juices and breaking up into two simpler sugars, surcose and fructose. This is termed "inversion" of surcose and the resulting mixture of glucose and fructose is termed 'invert sugar'.

তাপযোগে তাহা গাঢ়তর (pasty mass) হইয়া গেলে, তাহার মধ্যে দানা বাঁধিবার উপযুক্ত এবং যাহার কখনও দানা বাঁধা সম্ভব নয় এইরূপ মিশ্রিত গুড় (massecuite) অবস্থায় দাঁড়ায়। সাধারণতঃ বাহির হইতে তাপ দিয়া এই বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্যস্থিত রস বা গুড়কে জ্বাল দেওয়া সম্ভব নয়। সে কারণে এই পাত্রের মধ্যে যে-সকল ফাঁপা নল অবস্থিত আছে, বাহির হইতে জলীয় বাষ্প দ্বারা ঐ নলগুলি উত্তপ্ত করিলে বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্যে যে তাপ সৃষ্টি হয়, তাহা দ্বারা পাত্রমধ্যস্থ রস বা গুড় তাপ পাইতে থাকে।

তখন সমস্ত গাঢ় রস বা গুড় (massecuite) কেন্দ্রবিমুখগতি সম্পন্ন (centrifugal separator) প্রচণ্ড ঘূর্ণ্যমান পাত্রে দিলে সমস্ত রস বাহির হইয়া যায় এবং চিনি ঐ পাত্রের গাত্রে লাগিয়া যায়।

তখন উহা গরম জলে দ্রব করিয়া বর্ণশূন্য করিবার জন্য পশু হইতে প্রাপ্ত বা জৈব অঙ্গার (animal charcoal)-এর উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। তখন ঐ জল আবার বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্যে গরম করে এবং ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া গেলে চিনি পাইবার জন্য কেন্দ্রবিমুখগতি ঘূর্ণ্যমান পাত্রে দিয়া সমস্ত ঝোলাগুড় দূর করে। এখন যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাই প্রধানতঃ কারখানার চিনি এবং ইহা ক্ষুদ্র ও তদপেক্ষা বড় আকারের দানার মত পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ড অঞ্চলে খোলা বা অনাবৃত পাত্রে জ্বাল দেওয়া হরিদ্রাভ রঙের বহু চিনি প্রস্তুত হয়। ইহাই চলিত ভাষায় খন্দসরী বা খণ্ডেশ্বরী চিনি।

ভারতের আক ও মোট ব্যবহার

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ধরিয়া আকের যে হিসাব ধরা হয়, তাহাতে এদেশে বৎসরে সাড়ে পাঁচ হইতে সাড়ে ছয় কোটী টন আক হয় বলিয়া অনুমান করা হয়; পরিশিষ্ট (গ)। ইহার তিন ভাগের দুই ভাগেরও

অধিক (৬৮%) গুড় তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায় (আন্দাজ ৫ কোটী টন); প্রায় ১৭% (১.১ কোটী টন) চিনির কারখানায় যায়; লোকে খায় ও বীজ রাখে কমবেশী ৮০ লক্ষ টন (১২%) এবং খন্দসরী চিনিতে যায় ৩% (২০ লক্ষ টন)। বৎসরে মোট ফলনের উপর এই অনুপাত নির্ভর করে। যে বৎসর আক বেশী হয়, সেই বৎসর সকল রকম ব্যবহারেই আকের খরচ বেশী হইয়া থাকে।

চিনি

ভারতবর্ষে গুড়ের হিসাব ধরিয়া যে সুপরিষ্কৃত (refined) চিনির পরিমাণ ধরা হয়, তাহার মধ্যে আক হইতে প্রস্তুত (কারখানা এবং খন্দসরী) এবং গুড় হইতে প্রাপ্ত দুই রকম চিনিই পড়ে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতের কলে ১১ লক্ষ ১১ হাজার টন চিনি জন্মে। ঐ সালে গুড় পরিষ্কার করা কলে ১৯ হাজার ৫০০ টন চিনি উদ্ধার করা হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ঐ দুই প্রকার মিল সংখ্যা, যথাক্রমে ১৩৬ ও ১০ ছিল; পরিশিষ্ট (ঘ)। ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৩৯টী চিনির কলে ৭০ লক্ষ ৫ হাজার টন আক পিষ্ট হইয়া ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত টন চিনি জন্মে। তাহা ছাড়া গুড় হইতে ১৫ হাজার ৬০০ টন এবং খন্দসরী বা খণ্ডেশ্বরী ১ লক্ষ টন এই মোট ৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪০০ টন চিনি হইয়াছিল।*

সর্ব্বপ্রকার চিনি বাদে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণ গুড় হয় এবং মিষ্ট স্বাদের জন্য লোকে ব্যবহার করে। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ৩৪ লক্ষ টন গুড় ব্যবহৃত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে আকের চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে

* ১৯৩৯-৪০ সালে আন্দাজ ১৪৩টী কলে, ১ কোটী ৮ লক্ষ টন আক পিষ্ট হইয়া ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭০০ টন চিনি জন্মিবে আশা করা যায়। ইহা ছাড়া গুড় হইতে ১২ হাজার টন এবং খণ্ডেশ্বরী চিনি ১ লক্ষ টন চিনি হইবে।

২৩ লক্ষ টন ছিল, পরের দুই বৎসর কিছু কম হইবার পর, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; পরিশিষ্ট (ঙ)।

পরিশিষ্ট (খ) হইতে বুঝিতে পারা যায় যে যুক্ত প্রদেশে জমির পরিমাণ এবং উৎপন্ন গুড়ের (চিনি সমেত) ওজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ

আকের জমি খুব বেশী থাকায় ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কারখানা স্থাপিত লইয়াছে ; অর্থাৎ (১৯৩৮-৩৯) ১৩৯টীর মধ্যে ৬৯টী। বিহার প্রদেশে ৩২টী। অন্যান্য প্রদেশেও আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গলায় মাত্র ৮টী। বাঙ্গলায় মিল হইলেও ইহার অধিকাংশ অবাঙ্গালীর সম্পত্তি। উৎপন্ন চিনির পরিমাণেও যুক্তপ্রদেশের অংশ ৪৯.২% আর বাঙ্গলার মাত্র ১.৫%। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিভিন্ন অংশ পরিশিষ্ট (চ) হইতে পাওয়া যাইবে।

সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ভারতবাসী শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রেও অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে এবং দেশের শর্করা শিল্প তাহার

রক্ষণ শুল্ক ও শর্করা শিল্প

একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৯৩০-৩১ সালে চিনির উপর আমদানী শুল্ক প্রতি হন্দরে ৪ টাকা ৮ আনা স্থলে ৬ টাকা করা হয়। পর বৎসর (১৯৩১-৩২) ভারতে শর্করা শিল্পের প্রসার লাভের সহায়তা করিবার জন্য প্রতি হন্দরে ১৯৩১ মার্চ্চ মাসে প্রথমে ৭।০ ও সেপ্টেম্বরে আরও ১৸৵০ মোট ৯ টাকা ১ আনা শুল্ক স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালের (communique) ৩০শে জানুয়ারী হইতে ঐ শুল্ককে ৭ টাকা ৪ আনা রক্ষণ শুল্ক এবং রাজস্ববৃদ্ধি করিবার জন্য অতিরিক্ত শুল্ক (revenue surcharge) হিসাবে ১ টাকা ১৩ আনা, মোট ৯ টাকা ১ আনা ধরা হয় ; পরিশিষ্ট (জ)। উহার ফলে দেশের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায় এবং নানাস্থানে চিনির কল স্থাপিত হয়।

বিদেশে কলকজার জন্য অর্ডার চলিয়া যায় এবং ১৯৩২-৩৩ সালে প্রায় সাড়ে ৩ কোটী টাকার কলকজা আসিয়া পড়ে। এই আমদানীর মূল্য ও কলে ব্যবহৃত মালের পরিমাণ হইতে তৎকালীন অবস্থার বিষয় কতকটা ধারণা করা যাইবে; পরিশিষ্ট (ছ)।

আর্থিক উন্নতি

দেশে শিল্প গড়িয়া উঠিলে সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল। যাহারা কাজ পাইত না, তাহাদের কাজ জুটিতেছে এবং যে সকল জমি পড়িয়া থাকিত তাহাতে ফসল পাওয়া যাইতেছে। দেশে অধিক পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হওয়ায় পরস্পরের প্রতিযোগিতায় চিনির দাম কমিয়া যায়; সুতরাং চিনির দাম বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণের পক্ষে অসুবিধা হইবে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। চিনির দাম যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে ধনিক কল মালিকরা যাহাতে কৃষকদের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া যথেচ্ছা অল্পমূল্যে ইক্ষু ক্রয় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।* বিশেষজ্ঞরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন ইহাতে চাষীর আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে চাষী অনুমান সাড়ে ৮ কোটী টাকা পাইয়াছে।§ তাহা ছাড়া, নৌকার মালিক, রেল কোম্পানী আর গোযান-চালক প্রভৃতি সবাই কিছু কিছু পাইয়াছে।

---

* চিনির মণ ৭৸০ বা তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রীত হইলে চাষীকে ।/১ দিতে হয়। চিনির দামের উপর ইক্ষুর মূল্যের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৃদ্ধি পাইয়া চিনির মণ ১১৸৶০ হইতে ১২/০ হইলে চাষীকে ।/১৫ দিতে হইবে। এই দাম যে কোনও সময় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

§ আক বিক্রয় করিয়া চাষীরা পাইয়াছে—

সাল	হাজার টাকা	সাল	হাজার টাকা
১৯৩১-৩২	১,৭৭,৫১	১৯৩৫-৩৬	৮,৭৮,০২
১৯৩২-৩৩	৩,১৪,৩৯	১৯৩৬-৩৭	৭,৮০,০০
১৯৩৩-৩৪	৪,৮৩,৯৮	১৯৩৭-৩৮	৮,৮০,০
১৯৩৪-৩৫	৫,৯৬,৬৬	১৯৩৮-৩৯	৮,৫০,০০

রক্ষণশুল্কের সাহায্যে ভারতের শর্করা শিল্প কতকপরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ইহার নানা পরিবর্ত্তন হইয়া ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত উহা ৬ টাকা ১২ আনা এবং ঘরোয়া শুল্কের পরিমাণ অনুযায়ী আরও ২ টাকা অর্থাৎ ৮ টাকা ১২ আনা ছিল। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ হইতে ঘরোয়া শুল্ক প্রতি হন্দরে ৩ টাকা হওয়ায় আমদানী শুল্ক ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ ৯ টাকা ১২ আনা হইয়াছে; পরিশিষ্ট (জ)।

আমদানী শুল্ক ও ঘরোয়া শুল্ক

চিনি আমদানীর উপর যে শুল্ক আদায় হইত, তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। ১৯৩০-৩১ সালে উহা প্রায় ১১ কোটী টাকায় পৌঁছে। রক্ষণশুল্কের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হ্রাস পাইতে থাকে এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা মাত্র ২৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। তখন সাধারণের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও ভারতসরকার ১৯৩৪ সালের এপ্রিল হইতে ভারতে প্রস্তুত প্রতি হন্দর চিনির উপর ১ টাকা ৫ আনা এবং খণ্ডেশ্বরী চিনির উপর দশ আনা ঘরোয়া শুল্ক (excise) বসাইয়া দেন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে প্রতি হন্দর চিনির উপরে ২ টাকা হইয়া ১৯৪০ সালের মার্চ্চে ৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী হইতে খণ্ডেশ্বরী চিনির উপর প্রতি হন্দরে ১ টাকা করিয়া শুল্ক ধার্য্য হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ সালে উহা আট আনা করা হইয়াছে। ফলে ১৯৩৮-৩৯ সালে কলের চিনি হইতে সওয়া ৪ কোটী টাকা এবং খণ্ডেশ্বরী হইতে ৫৯ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে; পরিশিষ্ট (জ)।

চিনি ও গুড় ছাড়া ভারতবর্ষে বহু পরিমাণ মাৎ গুড় বা ঝোলা গুড় প্রস্তুত হয়। খণ্ডেশ্বরী বা কলে চিনি তৈয়ারী করিয়া লইবার পর এই

গুড় পড়িয়া থাকে।* বৎসরে ৩ হইতে ৪ লক্ষ মণ গুড়ের বিশেষ ব্যবহার না থাকায় ইহাকে ফেলিয়া দিতে হয়। কল মালিকদের ইহা মহা চিন্তার কারণ। এই পরিত্যক্ত বস্তু হইতে বহু প্রকার দ্রব্যাদি করা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে নানাকারণে ইহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

"ঝোলা" গুড়

কার্পাস বস্ত্রাদির ন্যায় চিনির প্রচুর রপ্তানী ছিল। দেশ বিদেশের বাজারে ভারতীয় শর্করা বিক্রীত হইত। কিন্তু স্বার্থান্ধ ইউরোপীয় দিগের স্বজাতি প্রীতির ফলে তাহা নষ্ট হইয়াছে। যেখানে ভারতীয় চিনির সমাদর ছিল, সেখানে উপনিবেশবাসী স্বজাতিদের প্রস্তুত চিনি প্রচার করিয়া আমাদের বাণিজ্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতীয় চিনির আমদানী রোধ করিবার জন্য নিজেদের দেশে উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়া ঔপনিবেশিকদের চিনির আমদানীর সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ইংরাজের সহিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় অনন্যোপায় হইয়া তাহারা ভারতীয় চিনি প্রচুর ব্যবহার করিত। কিন্তু যে মূহুর্ত্তে তাহারা ঔপনিবেশিকদের চিনি পাইয়াছে তখন হইতে ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় চিনির উপর, অন্য চিনি অপেক্ষা, প্রতি হন্দরে ৮ শিলিঙ করিয়া অধিক শুল্ক চাপাইয়া দিয়াছে।

বাণিজ্য—রপ্তানী

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুসংবদ্ধ ইতিহাস লিখিত হইবার পূর্ব্বে হইতেই ভারতীয় চিনির রপ্তানীর আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এই চিনি গুড়ের নামান্তর মাত্র ছিল। যখন উপনিবেশ সমূহে বিশুদ্ধ চিনি প্রস্তুত

* অব্যবহার্য্য মাৎ বা ঝোলা গুড়ের পরিমাণ—

	খণ্ডেশ্বরী চিনি প্রস্তুত করিতে		কারখানায় চিনি প্রস্তুত করিতে
১৯৩৭-৩৮ ...	১,২৫,০০০	...	৪,০৬,৪০০
১৯৩৮-৩৯ ...	১,০০,০০০	...	৩,৪৯,৬০০

হইল, তখন ভারতীয় চিনির অসুবিধা ঘটিল। ক্রমে সেই চিনি ভারতে আমদানী হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে চীন (চিনি), মিসর (মিশ্‌রী বা মিছরি) প্রভৃতি দেশ হইতে চিনি আসিত। পরে ভারতদ্বীপপুঞ্জ হইতে চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বীট হইতে প্রস্তুত সস্তার চিনি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং ভারতের বাজার তাহা হইতে রক্ষা পায় নাই।

কিছু পরিশ্রম করিলে ভারতীয় চিনির রপ্তানীর উত্থান পতনের হিসাব সংগ্রহ করা কঠিন নহে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। গত শত বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে দেখিতে পাই ১৮৪৮ সালে কেবল মাত্র ইংলণ্ডে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার টন চিনি গিয়াছে। ১৮৫১ সালে ৮০ হাজার ৩৭৫ টন চিনি ও চিনিজাতীয় দ্রব্যাদি (sugar and other saccharine matter) ২ কোটী ৭৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকায় রপ্তানী হয়। বিশ বৎসর বাদে (১৮৭০-৭১) সালে হ্রাস পাইয়া ১৭ হাজার টন চিনি ৪৪ লক্ষ টাকায় নামে। ১৮৮২-৮৩ সাল হইতে রপ্তানী পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৮৩-৮৪ সালই পরিমাণ হিসাবে চূড়ান্ত; অর্থাৎ ৮৮ হাজার ৮৫৮ টন (১ কোটী ১৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা) হয়। ১৮৯৭-৯৮ সাল হইতে রপ্তানী দারুণ হ্রাস পায়। ১৮৯৬-৯৭ সালের রপ্তানী ৫৮ হাজার টন (১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা) পর বৎসর মোট ২৯ হাজার ৩৫০ টনে (৪৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা) পড়িয়া যায়। তাহার পর আর পূর্ব্বের অবস্থা হয় নাই। ১৯৩৫-৩৬ সালে রপ্তানী ১ হাজার ৪ শত টনে নামে; তাহার পর ব্রহ্ম বিচ্ছেদ হওয়ায় ৯৩ হাজার টনে উঠিয়াছে; পরিশিষ্ট (ঝ)। রপ্তানীর মূল্য হিসাবে ১৮৬৪-৬৫ সালের (১ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, ২৩ হাজার ৮৫৫ টন চিনি) পর ১৮৯৩-৯৪ সালই প্রধান। ঐ বৎসর

চিনির মূল্য ১ কোটী ২৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় প্রায় ৬৫ হাজার টন চিনি রপ্তানী হয় ; পরিশিষ্ট (ঝ)।

জলপথে রপ্তানী ব্যতীত, ভারতের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান গুলিতে কিছু পরিমাণ চিনি স্থলপথে চালান যায়। তাহার আনুমানিক পরিমাণ ২০ হাজার টন।

যত চিনি জলপথে রপ্তানী হইত তাহার অধিকাংশই ইউরোপে গিয়া দানাদার চিনিতে পরিণত হইয়া নানাদেশে চালান যাইত।

রপ্তানী হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভাবে আমদানী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিদেশী চিনি আসিয়া ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার চিনির বিশেষ ক্ষতি

বাণিজ্য—আমদানী

করে। লোকে সস্তায় দানাদার চিনির পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহার করিতে থাকে। ১৮৪৯-৫০ সালে ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার বিদেশী চিনি আসিয়াছে। ১৮৬৪-৬৫ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতি হয় নাই ; ঐ সালে চিনির পরিমাণ ১০ হাজার ৭ শত টন এবং ৪৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা মূল্য ছিল। কিন্তু পর বৎসরই বৃদ্ধি পাইয়া ১৯ হাজার ৮৫০ টন চিনি সাড়ে ৮৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৮৬৯-৭০ সালে (২৮,৬০০ টন) আমদানী ১ কোটী টাকা ছাড়াইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বীটের চিনি আসিতে আরম্ভ করিল, আমদানীর পরিমাণ খুবই বৃদ্ধি পাইল। তাহার পূর্ব্বেও ১৮৮৪-৮৫ সালে ২ কোটী টাকা (৮০, ৮৫০ টন) ছাড়াইয়া যায়। ১৮৯৭-৯৮ সালে বীটের চিনির আমদানীর ফল বেশ বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৫০ টন চিনি ৪ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। এই সময় বীট ও আক চিনির পরিমাণ প্রায় সমান সমান হইয়া যায়। আরও কয়েক বৎসর এইরূপ চলিবার পর জগতে যেমন আকের চিনির প্রভাব বাড়িতে থাকে, সেইরূপ ভারতবর্ষে বীটের চিনির আমদানী হ্রাস পাইতে থাকে।

১৯০৪-০৫ সালে আমদানীর পরিমাণ (৩,৪৬,৮৫০) প্রায় ৭ কোটী টাকা, ১৯১৪-১৫ সালে (৫,৫০, ১২০ টন) সাড়ে ১০ কোটী টাকা এবং ১৯২১-২২ সালে (৭,৮২,৬৬৮ টন) সাড়ে ২৭ কোটী টাকা হইয়া চূড়ান্ত হইয়া যায়।* ১৯৩০-৩১ সালে রক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হইবার পর আমদানী দ্রুত হ্রাস পায় এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে মাত্র ১৪ হাজার টন ১৯ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। আমদানীর পরিমাণ হিসাবে ১৯২৯-৩০ সালের ১০ লক্ষ ১১ হাজার ৩৪৫ টন (১৫ কোটী ৭৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা) সর্ব্বপ্রধান। চিনির আমদানী আরম্ভ হইয়া পর্য্যন্ত এরূপ আর কখনও হয় নাই; পরিশিষ্ট (এ৩)।

বিদেশ হইতে আনীত কতক পরিমাণ চিনি আবার বাহিরে চলিয়া যায় (re-exports)।

বাণিজ্য—বীটের চিনি

বীটের চিনির সে প্রাধান্য না থাকিলেও এখনও বাজারে কিঞ্চিদধিক ১ কোটী টন চিনি উৎপন্ন হইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আকের চিনির যে প্রসার আছে, বীটের চিনির তাহা নাই। যে সকল দেশ বীটের চিনি উৎপন্ন করে, তাহারাই উহার অধিক পরিমাণ ব্যবহার করে। বর্ত্তমানে (১৯৩৮-৩৯) ভারতে সাড়ে ৪ হাজার টন বীট চিনি সাড়ে ৫ লক্ষ টাকায় আসিয়াছে।

চিনির আমদানী রপ্তানী ছাড়া "ঝোলা গুড়" (molasses) বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা যে কেবল আকের গুড় তাহা নহে; সঙ্গে তালের গুড়ও আছে। রপ্তানীর পরিমাণ ৫৩ হাজার টন এবং দাম প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। আমদানীর পরিমাণ ২ হাজার টন সাড়ে ৩ লক্ষ টাকায় কেনা হইয়াছে।

* ১৯২১-২২ সালের মোট আমদানীর মূল্য ২৭ কোটী ৫৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। তন্মধ্যে যবদ্বীপের অংশ ২৩ কোটী ৪৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা (৮৫·৩%), মরিসসের ২ কোটী ২২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা (৮·১%), হংকঙ ও ষ্ট্রেট্স্ সেট্‌ল্‌মেণ্টস্ প্রত্যেকের ২৪ লক্ষ, ব্রিটেনের ২১ লক্ষ, জাপানের ৫ লক্ষ এবং জার্ম্মানীর ২ লক্ষ টাকা ছিল।

আকের মিছরীর রপ্তানী নাই, কিন্তু আমদানী আছে; পরিমাণ ৮০০ টন এবং সওয়া ১ লক্ষ টাকা তাহার দাম। পূর্ব্বে চিনির হিসাবের মধ্যেই ইহার আমদানী ধরা হইত, ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইতেছে।

চিনির দামের বিশেষ তারতম্য হইয়াছে। রপ্তানী দাম ১৯২৯ সালে মণ পিছু ২৫ টাকা ৮ আনা হয়; রপ্তানী হিসাবে উহাই প্রধান; পরিশিষ্ট (ঢ)। গুড়ের দামও পরিশিষ্ট (ঢ) হইতে পাওয়া যাইবে। আমদানীর মধ্যে ১৯২০ সালে প্রতি মণ চিনি ৪৪ টাকা ৪ আনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; পরিশিষ্ট (ণ)। দাম অত বেশী থাকায় ১৯২০-২১ সালের মোট আমদানী ২৭ কোটী টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

চিনির দাম

চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া এক বৎসরে ১৯২১-২২ সালে প্রায় ২৮ কোটী টাকায় পৌঁছিলে তখন ধীরে ধীরে ভারতবাসীর জ্ঞানোন্মেষ হয়। অনেক তর্ক বিতর্ক আন্দোলনের ফলে ১৯৩০-৩১ সালে রক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হইলে দেশে চিনি উৎপন্ন হইয়া বিদেশের আমদানী হ্রাস পায়। দেশীয় লোকের যত পরিমাণ চিনির প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় এবং বিদেশে রপ্তানী করা চলিতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডে বসিয়া প্রবর্ত্তিত আন্তর্জাতিক চুক্তির (International Agreement)* বলে ভারতবর্ষ ১৯৪২ সাল

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

* ৬ই মে ১৯৩৭, চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলি :—

(1) Union of South Africa, (2) United States of America, (3) Commonwealth of Australia, (4) Brazil, (5) Belgium, (6) Great Britain and Northern Ireland, (7) China, (8) The Republic of Cuba, (9) Czechoslovakia, (10) The Dominican Republic, (11) France, (12) Germany, (13) Haiti, (14) Hungary, (15) Netherlands, (16) Peru, (17) Poland, (18) Portugal, (19) U. S. S. R., (20) Yugoslavia, (21) **India.**

পর্য্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোথাও চিনি রপ্তানী করিতে পারিবে না। এই চুক্তি ভারতবাসী সমর্থন করে নাই। বিদেশের স্বার্থান্বেষী ভারতের নামধেয় প্রতিনিধি (?) এই চুক্তিতে সম্মত হন। ভারতীয় ব্যবসায়ী মহল অনেক প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অন্য কোনও স্বাধীন দেশ এই চুক্তিতে সম্মত হইতে পারে না। উপরন্তু বাণিজ্যের উপর ভারতের নিজ কর্ত্তৃত্ব থাকিলে আবার ভারতবর্ষ বিদেশে চিনি রপ্তানী করিয়া লাভবান্ হইতে পারিত।

ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভারতীয় চিনি প্রবেশ করিতে না দিলেও ভারতের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী দেশে* ভারতীয় চিনি বিক্রয় করা চলিতে পারে; কিন্তু তাহা করিবারও উপায় নাই। সুতরাং ভারতের, এবং ব্রহ্ম যদি লয়, তাহার প্রয়োজনের মত চিনি প্রস্তুত করা ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। ইহা যে ভারতের প্রতি গুরুতর অবিচার তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

'অনুমোদিত' পরিমাণ

যে সকল দেশ বেশী মাত্রায় চিনি প্রস্তুত করে তাহারা সকলে মিলিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া "অনুমোদিত পরিমাণ" চিনি রপ্তানী করিতে পারে। এই চিনির মধ্যে বীট চিনিও পড়ে। এই হিসাব মতে ৩৬ লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত টন চিনি রপ্তানীর পরিমাণ ধরা আছে। তাহার মধ্যে নেদারল্যাণ্ডের ভাগে ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪ শত টন আছে। উহার পরই কিউবার স্থান, ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টন। এই ভাবে সকলে রপ্তানীর পরিমাণ ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে, ভারতের জন্য কিছুই রাখে নাই; পরিশিষ্ট (ট)।

পৃথিবীতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ৩ কোটী ১০ লক্ষ টন (১৯৩৭-৩৮)।

* ঐ দেশগুলির মধ্যে সিংহল, ইরাণ, আরব, এদেন, সোমালিল্যাণ্ড, মেসোপোটেমিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য।

তন্মধ্যে ভারতবর্ষে আন্দাজ ১২ লক্ষ টন চিনি ব্যবহৃত হয়; ইহার উপর গুড় ও প্রচুর ব্যবহৃত হয়: পরিশিষ্ট (ঠ ও ঙ)।

ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ

প্রতি লোক বৎসরে ৭'৩ পাউণ্ড চিনি খায়, তাহার সহিত গুড় ২৭'২ পাউণ্ড মিলিয়া মোট আন্দাজ ৩৪'৫ পাউণ্ড করিয়া মিষ্টদ্রব্য (চিনির হিসাবে ২৫ পাউণ্ড) ভাগে পড়ে। অন্যান্য দেশে ইহা অপেক্ষা বহু পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে। ব্রিটেন জন প্রতি ১১২ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ১১১, আমেরিকা যুক্তরাজ্য ১১০ পাউণ্ড চিনি ব্যবহার করে; পরিশিষ্ট (ড)। অপরাপর সভ্য দেশে ভারতবর্ষ অপেক্ষা সকলেই বেশী চিনি ব্যবহার করে। দারুণ অর্থাভাবপ্রযুক্ত ভারতের অধিকাংশ লোকই চিনি ব্যবহার করিতে পারে না। লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে এবং চিনি দুর্ম্মূল্য না হইলে সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে।

আকের ব্যবহার নানা প্রকারের। চর্ব্বণে ইহা কয়েক লক্ষ টন খরচ হইয়া যায়। ইহার রস পুষ্টিকারক, তৃষ্ণা নিবারক।

ব্যবহার

আকের রস বিক্রয় করিয়া এদেশে অনেকে জীবিকা উপার্জ্জন করে।

মিষ্ট দ্রব্য হিসাবে গুড়ের প্রচুর ব্যবহার; ইহা হইতে নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাটনী, কাসুন্দি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে গুড় লাগে। পল্লীর দিকে নারিকেল লাড়ু, মুড়কী, বাতাসা, পাটালী প্রভৃতি বহু পরিমাণ গুড়জাত ও গুড়-মিশ্রিত দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়।

চিনির ব্যবহার আজকাল বিশেষ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। মিষ্ট স্বাদ পাইবার জন্য চিনির ব্যবহারই প্রশস্ত। মোরব্বা, চাটনী প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে চিনির প্রয়োজন; চিনিতে পরিপাক করা দ্রব্যাদি বহুকাল নষ্ট হয় না। সকল প্রকার মিষ্ট ও মিষ্টান্নে চিনি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে শর্করা "মধুর রস, শীতল, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, মূর্চ্ছা ও বাতপিত্তের শান্তিকারক।" চিনির জল লঘু পাক, রুচিকর, বলকারক ও স্নিগ্ধ। আঘাত লাগিলে ক্ষত স্থানে চিনি ছড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে কার্ব্বোহাইড্রেট বা শালী জাতীয় পদার্থ অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান থাকায়, ইহা দেহের তাপ সৃষ্টি করে। বহু মূত্র রোগে ইহা অপকারী।

চিনি পরিষ্কার করিবার সময় যে "গাদ" বাহির হয়, তাহা সারের কাজে লাগে।

ঝোলা গুড় বহু রকমে ব্যবহৃত হয় এবং চেষ্টা করিলে ইহা আরও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। নানা প্রকার সুরাসার, রম (rum) নামক মাদক, জমির সার, পশুখাদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গাঁথুনির জন্য, বিশেষতঃ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও অট্টালিকার ছাদ নির্ম্মাণ কার্য্যে, "চিটে গুড়" ব্যবহৃত হইত। এখন পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে গঠন কার্য্যের জন্য "চিটা" গুড় অন্যান্য মশলাসহযোগে উন্নত ধরণের রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে লাগিতে পারে। খালের তলদেশ "পাকা" করিয়া বাঁধাইয়া দিবার জন্য গুড়ের ব্যবহার চলিতে পারে।

গুড় হইতে যে সুরাসার প্রস্তুত হইয়া থাকে, পেট্রলের সহিত মিলাইয়া মোটর চালাইবার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে ইহার চলন আছে। প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিলে, পেট্রলের খরচ কমিয়া যায়। ভারতবর্ষে বহু চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু বিদেশী কোম্পানীর পেট্রল বিক্রয় হ্রাস পাইবে বলিয়া তাহাতে সরকারপক্ষ আপত্তি করিয়াছে। ভারতের মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র মহীশূরে পেট্রল ও গুড়ের সুরাসার মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়া আছে। যুক্তপ্রদেশে চেষ্টা হইয়াছে, কতকদূর কৃতকার্য্য হইবার পর, আবার বন্ধ হইয়া

গিয়াছে। এই ভাবে অপ্রয়োজনীয় গুড়ের ব্যবহার করিতে না দিলে সকলেরই পক্ষে অসুবিধার কথা।

আকের ছিবড়া (bagasse or megass) কেবলমাত্র জ্বালানী রূপেই কাজে লাগিতেছে। কিন্তু উহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। চিনির কলের অতি সন্নিকটে কাগজের কল থাকিলে সুবিধা হইতে পারে; তাহা না হইলে "ছিবড়া" স্থানান্তর করিতে যে খরচ পড়িয়া যাইবে তাহা অপেক্ষা জ্বালানী হিসাবে তাপ পাইলে লাভ অধিক।

আমেরিকার (Ames, Iowa) কোনও পরীক্ষাগারে গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে এই পরিত্যক্ত "ছিবড়া" এক প্রকার কর্দ্দম-কোমল আকৃতি-ধারণক্ষম পদার্থে পরিণত করা যায়। খরচের হিসাবেও দেখা গিয়াছে, ঐ জাতীয় যৌগিক সকল পদার্থ হইতে ইহা দামে সস্তা। প্রায় সকল দেশই নানা প্রকার পরীক্ষাদ্বারা অপ্রয়োজনীয় পদার্থের নূতনতর ব্যবহার আবিষ্কার করিতেছে। আমাদের দেশে কত লক্ষ টন আকের ছিবড়া বাহির হয়, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে আক ও চিনির দাম কমিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষীরও কিছু আয় বাড়িতে পারে।

পরিশিষ্ট—ইক্ষু

(ক)

পৃথিবীতে মোট আবাদী জমি ও চিনির পরিমাণ

	(১৯৩৬-৩৭) হাজার একর*	(১৯৩৮-৩৯) হাজার টন†	(১৯৩৮-৩৯) হাজার টন (২)
ভারতবর্ষ	৪৫,৭৩	২৭,২২	
কিউবা	১৪,১৮	২৬,১৪	২৭,৫৯
যবদ্বীপ	২,৩৭	১৫,৩৫	১৫,১৫
ফরমোসা	২,৯৯	১৪,৪৬	১৬,৪১ (৩)
ব্রেজিল	১১,৩৭	১১,৮৮	১১,০৮
ফিলিপাইন	৭,৩৫	১০,৩২ (১)	৯,৭৫
হাওয়াই	১,৩১	৮,২৭	৮,৫৫
পুয়োরটোরিকো	৩,০০	৮,১৮	৮,৬০
অষ্ট্রেলিয়া	২,৫৬	৭,৭৫	৮,২০
আমেরিকা	২,৬৫	৪,৮৭	
দক্ষিণ আমেরিকা যুক্তরাজ্য	১,৯৩	৪,৬৮	
আর্জ্জেণ্টাইনা	৪,৪৫	৪,৫৫	
ডোমিনিকান গণতন্ত্র	—	৩,৯৮	
পেরু	৭৯	৩,৯৩	
মেক্সিকো	১,৮৮	৩,৪৯	

ফিজি দ্বীপ, জাপান, ট্রিনিডাড (বৃটিশ), পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ, মিসর প্রভৃতি।

---

* ১৯৩৬-৩৭ সালের পর জমির পরিমাণ পাওয়া যায় নাই।

† আন্তর্জাতিক মহাসভার হিসাব—refined sugar.

(১) ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাব।

(২) Willet and Gray কোম্পানীর মতে।

(৩) জাপান ও ফরমোসা সম্মিলিত।

(খ)

ভারতে জমি, উৎপন্ন গুড় ও প্রদেশের অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

মোট জমি	...	৩৮,১৮,০০০ একর (১)		
ব্রিটিশ ভারত	...	৩৬,৩৩,০০০	,,	৯৫·২%
করদ রাজ্য	...	১,৮৫,০০০	,,	৪·৮%
মোট গুড়	..	৫৩,০৭,০০০ টন (১)		
ব্রিটিশ ভারত	.	৫০,০৮,০০০	,,	৯৪·৩%
করদ রাজ্য	...	২,৯৯,০০০	,,	৫·৭%

প্রদেশ	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
যুক্তপ্রদেশ	২১,২৭	৫৫·৭	৩১,০১	৫৮·৪
পঞ্চনদ	৫,১২	১৩·৪	৩,৬৩	৬·৮
বিহার	৩,৪২	৯·০	৩,৫৬	৬·৭
বাঙ্গলা	২,৯০	৭·৬	৪,৮৩	৯·১
মদ্র	৯৮	২·৫	২,৭৯	৫·০
বোম্বাই	৭৫	১·৯	১,৭৯	৩·৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৭০	১·৭	৭৫	১·৪
উড়িষ্যা	৩৪	—	৬৩	১·১

(১) "Review of the Sugar Industry of India for the Crop Year 1937-38" পুস্তকে ৩৯,৪৩,০০০ একর জমি ও ৫৪,৫২,০০০ টন গুড় দেওয়া আছে।

(অনুসৃত)

	হাজার একর	শতকরা অংশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
করদ রাজ্য				
রামপুর (U.P.)	৫৪	১˙৪	৫০	˙৯
মহীশূর	৫০	১˙৩	৭৪	১˙৩
বোম্বাই	৪১	১˙০৭	১,০৫	১˙৯
হায়দরাবাদ	৩০	—	৬০	১˙১

(গ)

ভারতবর্ষে উৎপন্ন ইক্ষুর এবং সাধারণ ও উন্নত ধরণের ইক্ষুর আবাদী জমির পরিমাণ

	আক হাজার টন		সাধারণ আকের জমি হাজার একর		উন্নত আকের জমি হাজার একর
১৯২৭-২৮	৩,৬৮,৪২	...	৩১,০৩	...	—
১৯২৮-২৯	৩,০৬,৬৯	...	২৭,১৯	...	—
১৯২৯-৩০	৩,০৯,৬১	...	২৬,২৪	...	—
১৯৩০-৩১	৩,৫৭,৮০	...	২৯,০৫	...	—
১৯৩১-৩২	৪,৩৩,১৬	...	৩০,৭৭	..	—
১৯৩২-৩৩	৫,১১,২৯	...	৩৪,২৫	...	—
১৯৩৩-৩৪	৫,২৪,৫৫	...	৩৪,২২	...	—
১৯৩৪-৩৫	৫,৪৩,৪৬	...	৩৬,০২	...	২৪,৩৩
১৯৩৫-৩৬	৬,১২,০২	...	৪১,৫৪	...	৩০,৫৬
১৯৩৬-৩৭	৬,৭৩,২২	...	৪৫,৮২	...	৩৪,৫১
১৯৩৭-৩৮	৫,৫৬,৩৭	...	৩৯,৪৩	...	২৯,৬৮
১৯৩৮-৩৯	—	...	৩১,০৮	...	২৪,২৪

(ঘ)

ভারতে বিভিন্ন কারখানায় ইক্ষু এবং গুড় হইতে প্রাপ্ত চিনির পরিমাণ

	মিল (১) সংখ্যা	আক-চিনি হাজার টন	মিল (২) সংখ্যা	গুড়-চিনি হাজার টন
১৯২৮-২৯	২৪	৬৮·১	১৪	৩১
১৯২৯-৩০	২৭	৮৯·৮	১১	২১·২
১৯৩০-৩১	২৯	১,১৯·৯	১০	৩১·৮
১৯৩১-৩২	৩২	১,৫৮·৬	১৭	৬৯·৬
১৯৩২-৩৩	৫৭	২,৯০·২	২৭	৮০·১
১৯৩৩-৩৪	১১২	৪,৫৪·০	১৬	৬১·১
১৯৩৪-৩৫	১৩০	৫,৭৮·১	১৩	৩৯·১
১৯৩৫-৩৬	১৩৭	৯,৩২·১	১৩	৫০·১
১৯৩৬-৩৭	১৩৭	১১,১১·৪	৯	১৯·৫
১৯৩৭-৩৮	১৩৬	৯,৩০·৭	১০	১৬·৬
১৯৩৮-৩৯	১৩৯	৬,৫০·৮	—	১৫·৬

(ঙ)

ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য গুড়ের পরিমাণ

সাল		হাজার টন	সাল		হাজার টন
১৯২৭-২৮	...	২২,৭৯	১৯৩৩-৩৪	...	৩৪,৭৬
১৯২৮-২৯	...	১৭,৮৭	১৯৩৪-৩৫	...	৩৭,০১
১৯২৯-৩০	...	১৮,৪২	১৯৩৫-৩৬	...	৪১,০১
১৯৩০-৩১	..	২২,৪১	১৯৩৬-৩৭	...	৪২,৬৮
১৯৩১-৩২	...	২৭,৫৮	১৯৩৭-৩৮	...	৩৩,৬৪
১৯৩২-৩৩	...	৩২,৪০	১৯৩৮-৩৯	...	৩২,০০§

(১) আক হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানা।

(২) গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানা।

§ ১৯৩৮-৩৯ সালের আনুমানিক পরিমাণ।

(চ)

প্রদেশ হিসাবে মিল সংখ্যা, ব্যবহৃত ইক্ষু এবং উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ও তাহাদের পরস্পর অনুপাত

(১৯৩৮-৩৯)*

প্রদেশ	মিল সংখ্যা	ব্যবহৃত ইক্ষু হাজার টন	উৎপন্ন চিনি হাজার টন	ইক্ষু ও চিনির পরস্পর অনুপাত
যুক্তপ্রদেশ	৬৯	৩৫,০৫'৪	৩,২০'৩	৯'১৪
বিহার	৩২	১৭,৯৫'৩	১,৬১'৬	৯'০০
পঞ্চনদ ও সিন্ধু	৩	৮৭'১	৭'৫	৮'৬২
মদ্র	৭	২,৪৫'৫	২৩'০	৯'৩৭
বোম্বাই	৭	৪,৬৩'২	৫২'৩	১১'২৯
বাঙ্গলা	৮	১,৩১'১	৯'৯	৭'৫৫
উড়িষ্যা	২	৮'৯	'৭	৭'৮৭
করদরাজ্য	১১	৭,৬৮'৩	৭৫'৫	৯'৮৩
মোট	১৩৯	৭০,০৪'৮	৬৫০'৮	৯'২৯

(ছ)

ভারতীয় কলে ব্যবহৃত ইক্ষু ও আমদানীকৃত কলকব্জার মূল্য

সাল	কলে ব্যবহৃত আক হাজার টন	আমদানীকৃত কলকব্জা হাজার টাকা
১৯২৮-২৯ ...	— ...	১৭,৫২
১৯২৯-৩০ ...	— ...	৯,২১

* Official Estimates of the Institute of Sugar Technology (C. T. J.—7. 9. 39)

(অনুসৃত)

সাল		কলে ব্যবহৃত আক হাজার টন		আমদানীকৃত কলকজা হাজার টাকা
১৯৩০-৩১	...	—	...	১৩,৬৯
১৯৩১-৩২	...	১৭,৮৩	...	৩০,১৪
১৯৩২-৩৩	...	৩৩,৫০	...	১,৫৩,১১
১৯৩৩-৩৪	...	৫১,৫৭	...	৩,৩৬,৩৯
১৯৩৪-৩৫	...	৬৬,৭২	...	১,০৫,৪৫
১৯৩৫-৩৬	...	৯৮,০১	..	৬৫,৭২
১৯৩৬-৩৭	...	১,১৬,৮৭	...	৯৫,১৬
১৯৩৭-৩৮	...	৯৯,১৬	...	৬৯,৮৬
১৯৩৮-৩৯	...	৭০,০৫	...	৬১,৩৬

(জ)

আমদানী (Import Duty) ও ঘরোয়া শুল্ক (Excise Duty)-এর হার ও মোট আদায়ী টাকা

সাল	আমদানী শুল্ক		ঘরোয়া শুল্ক	
	মোট টাকা হাজার	শুল্কের হার	মোট টাকা হাজার	শুল্কের হার†
১৯২০-২১	—	১০%(১)		
১৯২১-২২	৬,৫০,৬৯	১৫%(১)		
১৯২২-৩৩	৪,৪০,৯৫	২৫%(১)		
১৯২৩-২৪	৩,৩২,২৩	,,		
১৯২৪-২৫	৫,৭৬,৯০	,,		
১৯২৫-২৬	৬,৪৭,৮১	৪॥০(২)		

(১) মোট দামের উপর (শতকরা)।

(২) প্রতি হন্দর চিনির উপর।

† প্রতি হন্দরের উপর শুল্ক।

(অনুসৃত)

সাল	আমদানী শুল্ক		ঘরোয়া শুল্ক	
	মোট টাকা হাজার	শুল্কের হার	মোট টাকা হাজার	শুল্কের হার
১৯২৬-২৭	৭,০০,৭২	৪॥০ (২)		
১৯২৭-২৮	৬,৫১,১৯	,,		
১৯২৮-২৯	৭,৭৭,২০	,,		
১৯২৯-৩০	৮,৬৯,৭০	,,		
১৯৩০-৩১	১০,৭৮,৯৭	৬৲(২)		
১৯৩১ (মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর)(৩)				
১৯৩১-৩২	৮,১০,০৭	৯/০(৩)		
১৯৩২-৩৩	৬,৮৪,৭৯	,,		
১৯৩৩-৩৪	৪,৭২,০৪	,, §		
১৯৩৪-৩৫	৩,৮১,৩৫	৯/০(৪)	৯৬,১৬*	১।/০
১৯৩৫-৩৬	৩,২৪,৩১	,,	১,৫৮,১৩*	,,
১৯৩৬-৩৭	৫০,৫২	,,	২,৫২,০২*	২৲

(২) প্রতি হন্দর চিনির উপর।

(৩) ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে রাজস্ব (Revenue Duty) ৭।০ করা হয়। ঐ সালের সেপ্টেম্বরে আরও ১৷৵০ বিশেষ রাজস্ব (Revenue Surcharge) ধরিয়া ৯/০ হয়। ১৯৩২ সালের ৩০ জানুয়ারী হইতে (Revenue Duty) রাজস্বকে (Protective Duty) রক্ষণ শুল্কতে পরিণত করা হয়। তাহার উপর Surcharge (25% of Rs 7/4/-) অর্থাৎ ১৷৵০ যোগ দিয়া ৯/০ দাঁড়ায়।

(৪) ৭৷৹০ (পূর্ব্বের ৭।০ স্থলে) রক্ষণশুল্ক এবং ঘরোয়া শুল্কের (Excise Duty) পরিমাণ ১।/০ যোগ দিয়া ৯/০।

* ইহা ছাড়া খণ্ডেশ্বরী চিনির উপর ঘরোয়া শুল্ক বাবদ ১৯৩৪-৩৫ সালে ১,২১,০০০, ১৯৩৫-৩৬ সালে ৭৪,০০০, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪৭,০০০ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৫০,০০০ টাকা আদায় হইয়াছিল।

§ ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে মিছরির উপর শুল্ক বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ হইতে ব্রহ্মের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হয়।

(অনুসৃত)

সাল	আমদানী শুল্ক		ঘরোয়া শুল্ক	
	মোট টাকা হাজার	শুল্কের হার	মোট টাকা হাজার	শুল্কের হার
১৯৩৭-৩৮	২৫,৩৩	৯৷০(৫)	৩,৩০,০৭	২৲
১৯৩৮-৩৯(৬)	৪৫,২২	৮৸০(৭)	৪,২২,০০	,,
১৯৩৯-৪০ (১লা মার্চ)		৯৸০	—	৩৲

(ঝ)

রপ্তানী—চিনি §

১৮৫০-৫১ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য

সাল		টন		হাজার টাকা
১৮৫০-৫১	...	৮০,৩৭৫	...	২,৭৩,৫৭
১৮৫৪-৫৫	...	—	...	১,৭০,৩৫
১৮৫৯-৬০	...	—	...	১,৫৪,৭৯
১৮৬৪-৬৫	...	২৩,৮৫৫	...	১,১৪,৭৭
১৮৭০-৭১	...	১৭,২৬০	...	৪৪,২৬
১৮৭৪-৭৫	...	২৭,৯৬৪	...	৫৯,৩১
১৮৭৯-৮০	...	১৮,৬৬২	...	২৮,৯১
১৮৮২-৮৩	...	৭১,৪১৮	...	৯৮,৯১
১৮৮৩-৮৪	...	৮৮,৮৫৮	...	১,১৭,৯৭

(৫) রক্ষণশুল্ক ৭৷০ এবং ঘরোয়া শুল্ক ২৲।

(৬) চিনির আমদানী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সালে খুব বেশী টাকা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা।

(৭) রক্ষণ শুল্ক ৭৷০ স্থলে কমাইয়া ৬৸০ করা হয়। তাহার উপর ঘরোয়া শুল্কের হার ২৲, মোট ৮৸০।

§ শর্করা জাতীয় মিষ্ট বস্তু (Sugar and other Sachharine matters). পরে পরিষ্কৃত চিনির রপ্তানী হইয়াছে; কিন্তু কোন সাল হইতে তাহা আরম্ভ হয় তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

(অনুসৃত)

সাল		টন		হাজার টন
১৮৮৪-৮৫	...	৬২,৫৫৩	...	৭৯,১৪
১৮৮৯-৯০	..	৮০,৮০০	...	১,১৮,৪৮
১৮৯৩-৯৪	...	৬৪,৮৭৪	...	১,২৩,১০
১৮৯৪-৯৫	...	৫০,৯০০	...	৫৫,০৬
১৮৯৬-৯৭	...	৫৮,০০০	...	১,০৩,০০
১৮৯৭-৯৮	...	২৯,৩৫০	...	৪৩,৮৭
১৮৯৯-০০	...	২৯,৭০০	...	৩৩,৭৪
১৯০৪-০৫	...	১০,৯৫০	...	১৪,৬৩
১৯০৯-১০	...	৭,২০০	...	১০,৫৫
১৯১৪-১৫	...	৫,৪৬৮	...	৮,৮১
১৯১৯-২০	...	১৬,৪৪৯	...	৫৩,৯২
১৯২৩ ২৪	...	৩৯,৭৮৬	...	৯৬,৯৭
১৯২৪-২৫	...	২১,১৩৪	..	৫২,৪৯
১৯২৯-৩০	...	১,৩৪৩	...	৩,৬৮
১৯৩৪-৩৫	...	১,৫১৬	...	২,৪৩
১৯৩৫-৩৬	...	১,৪১৫	...	২,৩৯
১৯৩৬-৩৭	...	২৪,৭১৬	...	৫,৬৮
১৯৩৭-৩৮	...	৯৩,৪৬৩	...	৩৯,৭৩
১৯৩৮-৩৯	...	৫৯,৩০৪	...	২৪,১৮

(ঞ)

আমদানী—চিনি

১৮৪৯-৫০ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য

সাল		টন		হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০	...	—	...	৩৮,৮৮
১৮৫৪-৫৫	...	—	...	৩৯,৫৬
১৮৫৯-৬০	...	—	...	২৩,৩৪

(অনুসৃত)

সাল		টন		হাজার টাকা
১৮৬৪-৬৫	...	১০,৭০০	...	৪৭,৭৯
১৮৬৫-৬৬	...	১৯,৮৫০	.	৮৪,৫০
১৮৬৯-৭০	...	২৮,৬০০	...	১,০৭,৩৩
১৮৭৪-৭৫	...	১৯,৮০০	.	৭৭,৪৮
১৮৭৯-৮০	...	৩২,৬০০	...	১,০৬,৮৮
১৮৮৪-৮৫	. .	৮০,৮৫০	..	২,১৪,০৮
১৮৮৯-৯০	...	৮৬,১৫০	...	২,২০,০০
১৮৯৪-৯৫	...	১,২৪,৫৫০	...	২,৮৭,৫৩
১৮৯৭-৯৮	...	২,৩০,৪৫০	...	৪,৭৮,৪৫
১৮৯৯-০০	...	১,৫৮,০৫০	...	৩,৩৭,৬৬
১৯০৪-০৫	...	৩,৪৬,৮৫০	...	৬,৯০,২৭
১৯০৯-১০	...	৬,৩০,৪৫০	..	১১,৫২,৮২
১৯১৪-১৫	...	৫,৫০,১২০	...	১০,৫২,২৫
১৯১৯-২০	...	৪,৮১,৯৭১	...	২২,৯৯,২৭
১৯২১-২২	...	৭,৮২,৬৬৮	...	২৭,৫০,২৮
১৯২৪-২৫	...	৭,২৭,৯৯৪	...	২০,৬৬,৯৭
১৯২৯-৩০	...	১০,১১,৩৪৫	...	১৫,৭৭,৬৫
১৯৩০-৩১	...	১০,০৩,১৭৭	...	১০,৯৬,৪৭
১৯৩১-৩২	...	৫,৫৬,২৭৪	...	৬,১৬,৫৩
১৯৩৫-৩৬	..	২,০১,০০০	...	১,৯০,৭৩
১৯৩৬-৩৭	...	২৩,০৭৫	...	২৩,২৯
১৯৩৭-৩৮	...	১৪,৩৮৯	...	১৮,৬০
১৯৩৮-৩৯	...	৩৫,৬৭৯	...	৪৫,৫৮

(ট)

জগতের বাজারে চিনি বিক্রয়ে প্রতি দেশের অংশ *

মোট—৩৬,২২,৫০০ টন।

	হাজার টন		হাজার টন
নেদারল্যাণ্ড (উপনিবেশ সমেত)	১০,৩৩·৪	জার্ম্মাণী	১১৮·১
কিউবা	৯,২৫·১	ব্রেজিল	৫৮·০
স্যান্‌ডোমিঙ্গো	৩,৯৩·৭	হাঙ্গেরী	৩৯·৪
পেরু	৩,২৪·৮	হাইটী	৩২·০
চেকোস্লোভাকিয়া	২,৪৬·০	পোর্টুগ্যাল (উপনিবেশ সমেত)	২৯·৫
রুশ গণতন্ত্র	২,২৬·৪	বেলজিয়ম—কঙ্গোসমেত	১৯·৭
পোল্যাণ্ড	১,১৮·১	রিজার্ভ	৪৬·৭

(ঠ)

ভারতে ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ

১৯৩১-৩২	৯,৮২,০০০	১৯৩৪-৩৫	১০,৫৯,০০০
১৯৩২-৩৩	১০,০৬,০০০	১৯৩৫-৩৬	১০,৭৪,০০০
১৯৩৩-৩৪	৯,৯৬,০০০	১৯৩৬-৩৭	১১,৬৭,০০০†

(ড)

প্রতি বৎসর প্রতি দেশে মোট এবং জনপ্রতি ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ

	মোট পরিমাণ হাজার টন	জন-প্রতি পাউণ্ড
ব্রিটেন	২৩,৪০	১১২
অষ্ট্রেলিয়া	৩,৪৪	১১১

* Basic quotas for exports to the free market for year ending August 31. International Sugar Agreement of 6th May 1937.

† ব্রহ্ম বাদে হিসাব।

(অনুসৃত)

	মোট পরিমাণ হাজার টন		জন প্রতি পাউণ্ড
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৬১,০০	...	১১০
কানাডা ...	৪,৯৯	...	১০১
ফ্রান্স ...	১০,৯৩	...	৫৯
জার্ম্মাণী ...	১৮,২৫	...	৫৮
ব্রেজিল ...	৯,৫০	...	৪৮
পোল্যাণ্ড ...	৪,১৯	...	২৭
রুশ গণতন্ত্র ...	২১,৭৬	...	—
ভারতবর্ষ ...	৫২,৭৫	..	২৫ §

(ঢ)

রপ্তানী—চিনি ও গুড়ের দাম

১৮৬১ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

সাল		চিনি প্রতি মণ			গুড় (মাদ্রাজ) প্রতি ৫০০ পাঃ*	
		টা	আ		টা	আ পা
১৮৬১	...	৭	১০		—	
১৮৬৫	...	৮	৫		—	
১৮৬৭	...	৭	৬	...	৩১	৮
১৮৭০	...	৬	৮	...	২৬	৬
১৮৭৫	...	৭	৪	...	১৯	০
১৮৮০	...	৯	১২	...	২৭	১২
১৮৮৫	...	৮	২	...	১৯	০

§ ব্যবহৃত গুড়কে চিনির হিসাবে পরিণত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতেও নানা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

* প্রতি ক্যাণ্ডি (candy) ৫০০পাউণ্ড ওজন।

(অনুস্থত)

সাল		চিনি প্রতি মণ			গুড় (মাদ্রাজ) প্রতি ৫০০ পাঃ		
		টা	আ		টা	আ	পা
১৮৯০	...	৯	৬	...	২১	১০	
১৮৯৫	...	৮	৮	...	১৯	২	৬
১৮৯০	...	৮	৪	...	২২	৪	
১৯০৫	...	৮	৭	...	২৮	২	
১৯১০	...	৯	৭	...	২৬	২	
১৯১৫	...	১০	৮	...	২৫	০	
১৯১৯	...	১৫	৮	...	৪০	০	
১৯২০	...	২৫	৮	...	৭৬	০	
১৯২৫	...	—		...	৫৪	৮	
১৯৩০	...	—		...	৬০	০	
১৯৩৫	...	—		...	৩১	১৪	
১৯৩৮	...	—		...	২৯	৪	

(৭)

আমদানী—চিনির* দাম

১৮৭০ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব

সাল	প্রতি হন্দর			সাল	প্রতি হন্দর		
	টা	আ	পা		টা	আ	পা
১৮৭০	১৬	১০	০	১৯১০	১১	৬	০
১৮৭৫	১৯	৮	০	১৯১৫	১৫	১২	০

* Mauritius (Bombay) per cwt.—"Sugar all-cane equal in colour to No. 23D. S or higher" per bazar maund at Calcutta from 1925 to 1928, and from June 1929, Sugar Java White 25 D. S. and 1 or above per Bazar Maund at Calcutta.

(অনুসৃত)

সাল	প্রতি হন্দর টা	আ	পা	সাল	প্রতি হন্দর টা	আ	পা
১৮৮০	১৯	১	০	১৯১৯	২৭	৪	০
১৮৮৫	১২	২	০	১৯২০	৪৪	৪	০
১৮৯০	১২	১২	৬	১৯২৪	২৫	১	০
১৮৯৩	১৫	১	০	১৯২৫	১১	১১	০
১৮৯৫	১২	১১	০	১৯৩০	৮	১১	১০½
১৯০০	১২	২	৬	১৯৩৫	৯	৯	৬
১৯০৫	১১	১৩	০	১৯৩৮	১৫	৬	৬৪

সিন্‌কোনা (Cinchona)

ম্যালেরিযা প্রপীড়িত ভারতবর্ষে সিনকোনার বিশেষ প্রয়োজন। অতি কষ্টে কিছু কিছু সিনকোনার আবাদ হইয়াছে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং যাহাতে সিনকোনার আবাদ প্রসার লাভ করে তাহার একান্ত চেষ্টা করা দরকার।

সিনকোনা গাছ দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। তথা হইতে ক্রমে নানা দেশে নীত হইয়াছে। জরবৃদ্ধ বলিয়া যদিও ইউরোপীয় দেশ গুলিতে সিনকোনা গাছের ত্বক বা ছাল রপ্তানী হইত এবং বহু টাকা রপ্তানী-শুল্ক আদায় হইত, তথাপি এই বৃক্ষের উন্নতি সাধন করা হয় নাই। গাছ কাটিয়া ফেলিয়া বা গাছের সমস্ত ছাল উঠাইয়া লওয়া হইত বলিয়া ক্রমশঃ সিনকোনা গাছ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

§ Sugar Java White, T. M. O. Quality, per cwt. at Bombay.

পেরুর কোনও লাট পত্নী (Countess of Cinchon) ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে এই গাছের ছাল ব্যবহার করিয়া জ্বরের হাত হইতে নিস্কৃতি পান বলিয়া প্রায় এক শত বৎসর পরে Linneaus ইহার "সিনকোনা" নাম দেন। ১৭৩৮ সালে La Condamine পেরু গমন করেন এবং সিনকোনা বৃক্ষ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। কন্দামিনের প্রত্যাগমনের পর সিনকোনা সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিতে পারা যায়। ১৮২০ সালে ফরাসী রসায়নবিদেরা সিনকোনার ছাল হইতে তাহার উপক্ষার (alkaloid) পৃথক করিতে সমর্থ হন।

প্রায় ত্রিশ হইতে চল্লিশ রকম বৃক্ষত্বকে কুইনীন পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সকলগুলির গুণ ও পরিমাণ সমান নহে। প্রধানতঃ চার প্রকার গাছ* হইতে কুইনীন উদ্ধার করা হইয়া থাকে। উহাদের ত্বকে চার প্রকার উপক্ষার † পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেকটাই জ্বরঘ্ন। ১৮৩৫ সালে ডাঃ ফরবেস রয়েল (Dr. Forbes Royle) ভারতবর্ষে সিনকোনার আবাদ প্রবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দেন এবং নীলগিরি ও খাসিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৮৬০ সালে মারখাম্ (Mr. Clements Markham) দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সিনকোনার বীজ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উতকামণ্ডের নিকট ডোডাবেট্টা এবং পরে নীলগিরির নিকট নাডুবাতামে চারা উৎপাদন করিবার চেষ্টা করা হয়। ১৮৬৩ সালে মঙ্গপু (দার্জ্জিলিঙ) তে আবাদ প্রতিষ্ঠা হয়। এখনও সেই পুরাতন আবাদ বাঁচিয়া আছে এবং ঐ স্থানে কুইনীন রাখিবার জন্ম সরকারী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

সিনকোনা গাছগুলি চিরহরিৎ এবং তাহাতে খুব সুন্দর ফুল ফুটিয়া

---

* Calisaya, Ledgeriana, Officinalis and Succirubra.

† Quinine, Quinidine, Cinchonine, Cinchonidine.

থাকে। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলের শোভা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে যবদ্বীপ, সিংহল, জ্যামেকা ও ভারতবর্ষে আবাদ স্থাপিত হইয়াছে; উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া ও নিউগ্রাণাডা, পেরু ও বলিভিয়া এবং ইকোয়েডর প্রদেশে, মেক্সিকো এবং উপরিলিখিত কয়টী দেশ বা প্রদেশে আবাদ ছিল। এখন যবদ্বীপের স্থানই সর্ব্বপ্রধান; জগতের সমস্ত কুইনীনের প্রায় ৯০% একা যবদ্বীপ হইতে পাওয়া যায়। ১৮৬৫ সালে পেরু হইতে যবদ্বীপে প্রথম সিনকোনার বীজ আসিয়া পৌঁছে; তাহার পর জলহাওয়া এবং মাটীর গুণে আজ যবদ্বীপের এই সম্মান লাভ ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে সিনকোনা গাছ থাকিলেও বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিঙের মনসঙ ও মঙ্গপু এবং মদ্রের আনামালাই (ভালপারাই) প্রদেশেই প্রধান। তাহা ছাড়া নীলগিরি প্রদেশের নাডুবাতাম ও ডোডাবেট্টাতেও ভাল সিনকোনা পাওয়া যায়। করদরাজ্যের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের পার্ব্বত্য জমিতেও সিনকোনার আবাদ রহিয়াছে এবং এই সকল বাগান হইতে সরকারী ভাণ্ডারে বহু পরিমাণ সিনকোনা জমা হইয়াছে। নীলগিরির বহু পরিত্যক্ত বাগান হইতে এবং কুর্গ, মহীশূর প্রভৃতি স্থানের পুরাতন গাছ হইতে কিছু কিছু সিনকোনা ছাল পাওয়া যাইতেছে।

সিনকোনা গাছের ছাল হইতে যে উপক্ষার (alkaloid) পাওয়া যায়, তাহাই মনুষ্যের ব্যবহার্য্য। এই ছালের নানা নাম আছে।* গাছের মূলের এবং কাণ্ডের গোড়ার দিকের ছালই বিশেষ কার্য্যকরী। গাছটি চার বৎসরের হইলে তখন ছালের সার হয় এবং কুইনীন পাইবার পক্ষে উপযুক্ত হয়। গাছ সাত বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলে উপক্ষারের অংশ হ্রাস পায়।

* Crown, Red, Grey, Yellow, Columbian barks and Pitayo.

পূর্ব্বে গাছগুলি উৎপাটন করিয়া তাহা হইতে ত্বক সংগ্রহ করা হইত; আজকাল এই প্রথা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও কতক স্থান বাদ দিয়া কতক স্থানের ছাল লম্বালম্বিভাবে উঠাইয়া লয় এবং ঐ সকল স্থান শেওলা প্রভৃতি দিয়া আবৃত করিয়া দেয়। ইহাতে ঐ স্থানে পুনরায় ত্বক সৃষ্টি হইবার সুযোগ হয়। দ্বিতীয় দফায় যে ত্বক পাওয়া যায়, তাহা প্রথম দফায় প্রাপ্ত ত্বক হইতে অধিকতর গুণসম্পন্ন। আবার কোথাও বা কেবলমাত্র উপরের পাতলা একছাল লইয়া উহার কতকাংশ বৃক্ষে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে গাছের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। ছাল চাঁচিয়া লইয়া উহাকে ছায়ায় রাখিয়া শুকাইয়া লয়। কখনও কখনও অগ্নিতাপে শুষ্ক করিতে হয়।

ভারতবর্ষে যত লোকের জ্বর হয়, তাহাদের প্রয়োজনের জন্য আন্দাজ ৬ লক্ষ পাউণ্ড কুইনীন দরকার; কিন্তু ভারতবর্ষে আন্দাজ ১০ হাজার পাউণ্ড মাত্র কুইনীন হয়; সুতরাং আমদানী না করিলে উপায় নাই। গত তিন বৎসরের কুইনীন-ঘটিত (salts) লবণ আমদানীর পরিমাণ :—

		পাউণ্ড		টাকা
১৯৩৬-৩৭	...	৯০,০৪৯	...	২৩,১৯,৬১০
১৯৩৭-৩৮	...	১,০৫,৩২৯	...	২৬,২৮,৫৭৮
১৯৩৮-৩৯	...	৯৮,১৩৫	...	২৫,৩৭,১৮২

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে এই দ্রব্যের বিক্রেতার অংশ এইরূপ :—

	পাউণ্ড	টাকা	শতকরা অংশ
জার্ম্মাণী	৫৩,১৩১	১৩,৯২,৩৯১	৫৮.৮
ব্রিটেন	২৩,০৯৮	৭,১১,৫৯৪	২৮.০
যবদ্বীপ	৪,৬৭০	৯৬,১৫৩	৩.৭
অপরাপর	১৫,২৩৬	৩,৩৭,০৪৩	১৩.২

ভারতবর্ষে এখনও ৩০ লক্ষ টাকার মত ব্যবসা পড়িয়া রহিয়াছে। ত্বক হইতে ৫% বা তন্ন্যন পরিমাণ উপক্ষার উদ্ধার হইতে পারে। সেই হিসাবে প্রায় ১ লক্ষ পাউণ্ড বা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রয়োজনের হিসাবে প্রায় ৬ লক্ষ পাউণ্ড কুইনীন সল্টস্ বা লবণ পাইতে হইলে বহু পরিমাণ ছালের দরকার। এই ব্যবসায়ে প্রচুর লোক খাটিতে পারে। এদিকে কতক পরিমাণে চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

সামান্য পরিমাণ ছাল বিদেশে রপ্তানী হয়:—

		পাউণ্ড		টাকা
১৯৩৬-৩৭	...	৫২,২৩১	..	১৬,০২৬
১৯৩৭-৩৮	...	২৮,২২২	...	৯,৮২০
১৯৩৮-৩৯	...	৩২,৪৫২	...	১১,১১৭

জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স আমাদের প্রধান ক্রেতা ; ইংরাজ ও সামান্য লয়।

লবঙ্গ (Cloves)

লোকের উপকারে যতখানি লাগে, লবঙ্গ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। লবঙ্গ লইয়া ব্যবসা উপলক্ষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ, অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে অভিযান হইয়া গিয়াছে। জাঞ্জিবারে ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে ভাবতবাসী জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন করিয়া তাহার ক্ষতিসাধন করিয়া অবিচারেরর প্রতিকার আশা করিয়াছে।

আদি চাষ ও বিস্তার

বিদেশীয়রা কোথাও লইয়া যাইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই মলক্কাস "মশলা-দ্বীপে" (Spice Islands) লবঙ্গ গাছ জন্মিয়াছিল। চীনেরা লবঙ্গের প্রকৃত ব্যবহার আবিষ্কার করে এবং ২৬৬ হইতে ২২২ খৃষ্ট পূর্ব্বে লিখিত চৈনিক

পুস্তকাদিতে লবঙ্গের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণেও নাম পাওয়া যায় এবং চরক সংহিতায় লবঙ্গের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মলক্কাস হইতে ইউরোপে লবঙ্গ নিয়মিত রপ্তানী হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগালবাসীরা এই সকল দ্বীপের সহিত এ্যামবয়না (Amboyna) অধিকার করে এবং বহুদিন তাহারা লবঙ্গের একচেটিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা কর্ত্তৃত্বলাভ করিয়া লবঙ্গের একচেটিয়া বাণিজ্য নিজেদের করায়ত্ত রাখিবার জন্য বহুপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে এবং এক এ্যামবয়না ব্যতীত সকল দ্বীপের গাছ নষ্ট করিয়া দেয়। ১৭৬১ হইতে ১৭৭১ সালের মধ্যে ফরাসীরা ঐ স্থান হইতে লবঙ্গেব চারা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় এবং মরিসস্ বা ফরাসী দ্বীপ (Isle of France)-এ আবাদ করে। ১৮১৮ সালে জাঞ্জিবারে লবঙ্গের বীজ ও চারা আসিয়া পৌঁছে এবং উহা বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রয়োজনের প্রায় ৮০% লবঙ্গ সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৮০০ সালে মালয়ের সন্নিকটে পেনাঙ (Penang) দ্বীপে লবঙ্গের চারা আনীত হয় এবং ঐ সময় ভারতবর্ষেও বীজ এবং চারা আসিয়া পৌঁছে। অন্য দেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (East India Company) ভারতবর্ষে লবঙ্গের আবাদ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকে। ১৭৮৭ সালে মালাবার উপকূলে রান্দাতাম্বুরা নামক স্থানে পরীক্ষার জন্য এক বাগিচা স্থাপিত হয়। ১৭৯৭ সালে মদ্রে আন্দেয়ারের নিকট মারমেলন নামক স্থানে এবং শতাব্দীর শেষ কয়বৎসরের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও অন্যান্য প্রদেশে চারা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, এক ত্রিবাঙ্কুর ছাড়া আর কোথাও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। প্রায় একই

সময় তিনেভেলী জেলায় কোরতাল্লামে চারা রোপণ করা হয় এবং গাছের অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। শেষ পর্য্যন্ত সেই আশা বিফল হয় নাই। ইহা ছাড়া নীলগিরি প্রদেশের বুরলিয়ার অঞ্চলেও ভাল আবাদ করা সম্ভব হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে উপরোক্ত কয়টী আবাদ ছাড়াও স্থানে স্থানে লবঙ্গ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান দ্বারা উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইতে পারিলে, ভারতবর্ষের অভাব এই স্থান হইতেই মিটানো কঠিন নহে।

জাঞ্জিবার ও পেম্বা, মাদাগাস্কর, মরিসস্, পশ্চিম আফ্রিকার কেমীরুন প্রদেশ, মালয়, পেনাঙ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ, সিংহল এবং ভারতবর্ষে লবঙ্গের আবাদ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের আবাদের পরিমাণ অতি সামান্য বলা যাইতে পারে।

লবঙ্গ গাছগুলি ৩০ হইতে ৪০ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। সকল দেশের গাছের দৈর্ঘ্য সমান হয় না। প্রধানতঃ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বীজ রোপণ করিলে অঙ্কুর নির্গত হয়। গাছ হইতে বীজ আনিবার পর কয়েকদিনের মধ্যে রোপণ করিতে হয়, তাহা না হইলে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বীজ তলায় একমাস থাকিবার পর অঙ্কুর নির্গত হইবার সময় উপরে আবরণ দিয়া ছায়া করিয়া দেওয়া দরকার।

পরিচয়

আমরা যে লবঙ্গ ব্যবহার করি তাহা শুষ্ক মুকুল। ফুল প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে যখন কুণ্ডনল (Calyx tube বা বোঁটাগুলি) পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ ধারণ করে, তখন উহা নানা উপায়ে পাড়িয়া লওয়া হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তী কালে এক এক স্তবকে বহু মুকুল দেখা দেয়। লবঙ্গের উপর যে গোলাকৃতি পদার্থ থাকে তাহা লবঙ্গ ফুলের অপ্রস্ফুটিত

চারটি দল মাত্র। গাছ হইতে আনিবার পর, রৌদ্রে দুই তিন দিন শুকাইয়া লইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত লবঙ্গ পাওয়া যায়। লবঙ্গ গাছ সাত আট বৎসরে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ৭০।৮০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

বাণিজ্য

বহুদিন যাবৎ ভারতবর্ষ হইতে লবঙ্গ রপ্তানী হইতেছে। তাহার মধ্যে বিদেশী লবঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া পুনরায় রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। ভারতের পুরাতন বাণিজ্যের অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনীত পণ্য।

ভারতীয় লবঙ্গ সামান্য পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে, ব্রহ্মই তাহার একমাত্র ক্রেতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং ব্রহ্ম যখন ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত ছিল, তখন রপ্তানীর পরিমাণ কিছুই ছিল না বলিলেই হয়।

রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য—

সাল		পরিমাণ হন্দর		মূল্য টাকা
১৯৩৩-৩৪	...	১	...	১০০
১৯৩৪-৩৫	.	—	..	৪
১৯৩৫-৩৬	...	৭	...	৩১০
১৯৩৬-৩৭	...	১১	...	৫৮০
১৯৩৭-৩৮	...	১১৫	...	৮,৪৫৫

১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মের অংশ ৬,৯৩০ টাকা।

রপ্তানীর পরিমাণ সামান্য হইলেও আমদানীর পরিমাণ খুবই বেশী এবং তাহার অধিকাংশই জাঞ্জিবার ও পেম্বা হইতে আসিয়া থাকে। তাহার পর জার্ম্মাণী, সিংহল প্রভৃতি দেশের স্থান। বাঙ্গালা এবং বোম্বাই প্রায় সমস্ত লবঙ্গ ক্রয় করে।

আমদানী—পরিমাণ ও মূল্য

সাল		পরিমাণ হন্দর		মূল্য টাকা
১৯৩৩-৩৪	...	৭৬,৭৬৩	...	৩৪,৪১,৮৪৪
১৯৩৪-৩৫	...	৮৪,১৯১	...	৩০,৯৬,৭৪২
১৯৩৫-৩৬	...	৭৩,৬৫৫	...	২৩,১৬,৯৮৪
১৯৩৬-৩৭	...	৯৮,৩০৬	...	৩৮,২৮,৫৬৯
১৯৩৭-৩৮	...	৩৫,০০৭	...	১৫,৭০,৪৬৮
১৯৩৮-৩৯	...	৬৯,৫৭৪	...	৩৬,৫৯,৮২৫

জাঞ্জিবার ও পেম্বায় ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দেহের রক্তে লবঙ্গ এবং অন্যান্য আবাদ পুষ্ট করে। আজ লবঙ্গ রপ্তানীর উপর যে শুল্ক আদায় হয়, তাহাই জাঞ্জিবারের প্রধান আয়। এই সুযোগ লইয়া, তথাকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী ভারতবর্ষীয় লোকদের বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং নানা প্রকারে তথায় বাসের অসুবিধা করিতেছে। জাঞ্জিবার ইংরাজরক্ষিত (Protectorate) দেশ। সুতরাং তাহার আইন বিধি সবই ইংরাজ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার প্রতিবাদে ভারতবাসী জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন করে এবং প্রভূত পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু যথানিয়মে তাহারা পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া জাঞ্জিবারের লবঙ্গ ব্যবহার করিতেছে এবং আমদানীও বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের মোট আমদানীর মধ্যে জাঞ্জিবার ও পেম্বা হইতে আনীত লবঙ্গের পরিমাণ ও মূল্য—

সাল		পরিমাণ হন্দর		মূল্য টাকা
১৯৩৩-৩৪	...	৭০,২৩৩	...	৩৩,৬০,৩৯৫
১৯৩৪-৩৫	...	৭৩,৯১৭	...	২৯,২৬,৮৪৭

সাল		পরিমাণ হন্দর		মূল্য টাকা
১৯৩৫-৩৬	...	৬১,৫৩৯	...	২০,৮৫,৫৫৮
১৯৩৬-৩৭	...	৬২,০৪২	...	২৫,৪১,৩৯২
১৯৩৭-৩৮	...	১৩,৮৬৫	...	৭,৮৯,৬৪৬
১৯৩৮-৩৯	...	৩৬,৮৯৮	...	২০,৭৭,১৭৬

ভারতবর্ষে যত লবঙ্গ আসে তাহার কতকাংশ পুনরায় রপ্তানী (re-export) হইয়া যায়। এখানেও ব্রহ্ম আমাদের প্রধান ক্রেতা—

পুনঃ রপ্তানী (re-exports)—পরিমাণ ও মূল্য

সাল		পরিমাণ হন্দর		মূল্য টাকা
১৯৩৩-৩৪	..	৬১৫	...	২৪,৯৯৬
১৯৩৪-৩৫	...	৪৬৭	...	১৫,৪৮৬
১৯৩৫-৩৬	...	৭৬৯	...	২৪,৭৯৭
১৯৩৬-৩৭	...	২,৪৬৩	...	৯০,৮৪৫
১৯৩৭-৩৮	...	৬,৫৭৬	...	৩,০১,৪০৫

১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মের অংশ ৬৭,৫৩৩ টাকা ছিল।

প্রধানতঃ মশলা হিসাবেই লবঙ্গ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রন্ধনকার্য্য ছাড়া পান সাজিবার উপকরণ হিসাবে অনেক লবঙ্গ খরচ হয়। লবঙ্গ অগ্নি উদ্দীপক, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। কাসির উপশম করিবার ইহার ক্ষমতা আছে। উদরাধ্মান ও নাড়ীশূল ও বমন রোগেও লবঙ্গ চূর্ণ বা

ব্যবহার

উহার তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে যে তৈল থাকে তাহাই ইহার স্বাদ ও উগ্র গন্ধের প্রধান কারণ। সদ্যঃ শুষ্ক লবঙ্গ নখ দিয়া টিপিয়া দিলে নখাগ্রে অল্প পরিমাণ তৈল দেখিতে পাওয়া যায়। চোলাই দ্বারা বাহির করিয়া লইবার সময় তৈল সামান্য হরিদ্রাভ থাকে; পরে ঐ রঙ গাঢ় হইয়া যায়।

মশলা, চাট্নী মোরব্বা, মাদক, মিষ্টান্ন, সাবান প্রভৃতিতে সুগন্ধ করিবার জন্য এই তৈলের প্রয়োজন। ঔষধার্থে ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত গহ্বরে লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। ইহা চর্ম্মোপরি মর্দ্দন করিলে প্রদাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অবসাদ-জনিত দুর্ব্বলতায় অন্যান্য ঔষধের সহিত ইহা ব্যবহৃত হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দ্রব্যাদি পরীক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিকে ইহার সাহায্য লইয়া থাকে।*

লবঙ্গ তৈলের মধ্যে ৪৫ হইতে ৯০ ভাগ eugenol থাকে, ইহাই তৈলের গুণাবলীর প্রধান উপকরণ।

আমাদের দেশে লবঙ্গের তৈল প্রস্তুত হয় না। যাহা সামান্য ব্যবহার করা হয়, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে।

লবঙ্গ আবাদ বিস্তার করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে তৈল নিষ্কাসিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

---

* On account of its high refractive index, the oil is used for preparing objects for the microscope."

বিক্রয় শুল্ক

(Cess)

পুস্তকের এই খণ্ডে আলোচিত সকল প্রকার পণ্যের মধ্যে—পাট, তুলা, চা ও কফি এই কয়টার বিক্রয়ের উপর একটী শুল্ক (cess) নির্দ্ধারিত আছে। প্রত্যেকটী পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে এই শুল্ক আদায় করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বহির্ব্বাণিজ্যের অসংস্কৃত বা কাঁচা পণ্যের মধ্যে চাউল ও পাটের উপর মাত্র রপ্তানী শুল্ক আছে। আলোচ্য শুল্ক বা সেস্ উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রপ্তানী শুল্ক সরকারের তহবিলে, এবং এই শুল্ক হইতে আদায়ী টাকা কোনও আধা-সরকারী বা বেসরকারী সমিতির তহবিলে জমা হয়। ঐ বিশেষ সমিতি এই সকল পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্য্য, বর্ত্তমান বাজারের সঙ্কোচন রোধ, কৃষির উন্নতি বিষয়ক গবেষণা, সরকারকে সুপরামর্শ দান প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ক্রমশঃ এই সকল সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমানে ইহারা পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হইয়াছেন।

পাট শুল্ক

কলিকাতা বা চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যে সকল পাট ভারতের বাহিরে বা ভারতের অন্য অংশে রপ্তানী হইয়া যায়, † তাহার উপর প্রতি ৪০০ পাউণ্ড ওজনের গাঁইটের উপর (এমন কি পরিত্যক্ত এবং ছাঁটাই পাট পর্য্যন্ত) দুই আনা এবং পাট জাত দ্রব্যাদির উপর প্রতি টনে বারো আনা করিয়া শুল্ক আদায় হইয়া থাকে।

†"When exported by sea (whether beyond or within India) from Calcutta or from Chittagong (except raw jute exported to Calcutta)."

এই টাকার সহিত ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতির (Indian Central Jute Committee) সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও, ভারত সরকার সমস্ত টাকা নিজে লইয়া এই সমিতি পরিচালনের সমস্ত খরচ বহন করে।

পাটশুল্ক প্রধানতঃ কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের (Calcutta Improvement Trust) হাতে পড়ে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহা ১৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩ শত টাকা এবং ১৯৩৮ সালে উহা ১১ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। এই টাকা পাইয়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের খুব সুবিধা হইয়া গিয়াছে।

পাট রপ্তানীর উপর শুল্কের কথা ১৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। ভারত সরকার মোট আদায়ী টাকার ৬২½% বাঙ্গলা দেশকে দেয় এবং উহার পরিমাণ ২ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা।

১৯২৩ সালে ভারতীয় কার্পাস শুল্ক আইন (Indian Cotton Cess Act) প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতে প্রতি ৪০০ পাউণ্ড ওজনের গাঁইটের উপর দুই আনা এবং খোলা বা আল্গা তুলার প্রতি ১০০ পাউণ্ডের উপর দুই পয়সা করিয়া শুল্ক ধার্য্য হয়। ভারতের বাহিরে রপ্তানীর তুলা ছাড়াও ভারতের মিলে ব্যবহৃত তুলার উপর এই শুল্ক আদায় হইয়া থাকে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্পাস সমিতির (Indian Central Cotton Committee) নিকট সমস্ত টাকা জমা পড়ে। ভারতে দীর্ঘতন্তু কার্পাসের জন্য ইহাদের চেষ্টা এবং তাহার উন্নতি সম্বন্ধে সাহিত্য প্রচার করায় ইহা জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ উপকারী প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। কার্পাস সেস্ হইতে ১৯৩৫-৩৬ সালে ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৭০০, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৮০০ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

কার্পাস

বর্ত্তমানে রপ্তানীকৃত প্রতি ১০০ পাউণ্ড চা'র উপর এক টাকা ছয় আনা

শুল্ক ধার্য্য আছে। ১৯০৩ সাল হইতে এই সেস্ আদায় আরম্ভ হয়, কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে এই হার বৃদ্ধি করিতে হয়। নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে ইহার একটা ধারণা হইতে পারে। অন্যান্য পণ্য সম্বন্ধে শুল্কের হার এরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পায় নাই :—

চা

১৯২১	এপ্রিল	৩০ পর্য্যন্ত	প্রতি	পাউণ্ডে	সিকি	পাই
১৯২৩	এপ্রিল	২০ ,,	,,	,,	আধ	,,
১৯৩৩	সেপ্টেম্বর	১৫ ,,	,,	,,	পৌণে এক পাই বা প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ছয় আনা	
১৯৩৫	এপ্রিল	১২ ,,	,,	,, ,,	আট	,,
১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী	১৬ ,,	,,	,, ,,	বারো	,,

তৎপরে বৃদ্ধি পাইয়া এক টাকা চার আনা হয়। এবং সম্প্রতি উহা প্রতি ১০০ পাউণ্ডে এক টাকা ছয় আনা করা হইয়াছে।

ঐরূপ সেস্ বা শুল্কের ফলে বহু টাকা প্রতি বৎসরে আদায় হইয়া থাকে এবং ঐ টাকা ব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতি দেশে চা'র প্রচার কার্য্যের জন্য খরচ হইয়া থাকে। ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত রূপ টাকা পাওয়া গিয়াছে—

১৯৩৩	...	১৪,১৪,৪১৮	টাকা	১৯৩৬ ...	২৩,৪২,৭৯৭ টাকা
১৯৩৪	...	১৪,২৪,৪১৮	,,	১৯৩৭ ...	২২,৮৬,৫০। ,,
১৯৩৫	...	১৬,১০,৬৩৩	,,	১৯৩৮ ...	৪১,৭১,৯৩৪ ,,

১৯৩৯-৪০ সালের জন্য

ব্রিটেনে	£ ৪৫,০০০	অষ্ট্রেলিয়ায়	£ ৮,০০০
কানাডায়	,, ১৮,০০০	আফ্রিকায়	,, ৭,০০০
ইউরোপে	,, ১০,০০০	আমেরিকা যুক্তরাজ্যে	,, ৮৬,০০০

খরচ করা স্থির হইয়াছে ; সুতরাং চা বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব। ১৯৩৬ সালের Indian Tea Cess (Amendment) Act অনুযায়ী ইহা স্থিরীকৃত হয়, শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়া ১০০ পাউণ্ডের উপর কখনও দেড় টাকার বেশী হইতে পারিবে না। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, এই শুল্ক আরও দুই আনা বৃদ্ধি পাইবে।

সমস্ত টাকা Tea Market Expansion Board এর হাতে জমা পড়ে। চা বিক্রয় যেরূপ অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে ৪২ লক্ষ টাকা আদায় হইতেছে। এই সমিতির বিশ্বাস যে, তাঁহাদের কার্য্যে সুফল পাওয়া যাইতেছে এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় চা'র কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কফি

১৯৩৫ সালে কফির উপর শুল্ক আদায় করিবার আইন (Indian Coffee Cess Act) প্রবর্ত্তিত হয় এবং Indian Coffee Cess Committee বা ভারতীয় কফি শুল্ক (আদায়) সমিতির আবির্ভাব হয়। ভারতীয় কফি স্থল বা জলপথে বাহিরে যে কোনও স্থানে রপ্তানী হইলে প্রতি হন্দরে এক টাকা করিয়া আদায় করা হয়। ভারতের বাহিরে ভারতীয় কফি অধিক মাত্রায় বিক্রয় করিবার চেষ্টা বিশেষভাবেই করা প্রয়োজন, কারণ আজকাল বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়াছে। এক সময় ভারতের কফি বহু পরিমাণে রপ্তানী হইত, আজ আর তাহা নাই। ভারতের কফির বহু উন্নতি সাধন করা দরকার ; তাহা ছাড়া গুণানুসারে কফির বিভাগ করিয়া (grading) দেওয়া হইলে, উচ্চহারে উহা বিক্রীত হইবে।

বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর কম বেশী ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা আদায় হইয়া Indian Coffee Cess Committeeর নিকট জমা হয়। উক্ত কমিটী

দেশ বিদেশে কফির প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্ত নিজেদের বিবেচনামত খরচ করিয়া থাকেন।

ভারতীয় অপর পণ্যের মধ্যে লাক্ষা ও কয়লা বিক্রয়ের উপর cess আছে। আগামী খণ্ডে খণিজ ও জৈব পণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় সে বিষয় সবিশেষ পরিচয় দিব।